নারায়ণ সান্যাল

এক.. দুই.. তিন...

একটি বহু-বিক্রীত বিদেশী 'রূপককথার' বহু-বিকৃত এদেশী রূপকান্তরের 'হিন্দের বন্দী'।

হাঁস-মুরগি-শুয়োর-গরু ভেড়ার ফার্ম 'অমানুষস্থান'। এর বাসিন্দারা যেদিন তাদের বিপ্লব সার্থক করল সেদিন তাদের মালিক ইনসান আর আদমীকে 'কুইট-অমানুষস্থান' করতে হল। স্বাধীন দেশের নাম হল—'না-মানুষস্থান'।
সদ্যস্বাধীন না-মানুষস্থানের গদীতে একে একে উঠে বসতে থাকে ক্ষমতাশালী এক বিশেষ শ্রেণীর জীব। শ্রেণীস্বার্থে তারা অন্ধ। তাই বাঁচবার পথ খুঁজতে থাকে সাধারণ জীবজন্তু। গদীর অধিকার বদল হয়। এক.দুই..তিন... করে একের পর একজন গদীদখল করে। কিন্তু যে আসে লঙ্কায় সেই হয় রাবণ! —এই বাঁধা ফর্মূলা থেকে কি মুক্তির কোন পথ নেই?

লেখক সেই মুক্তিপথের সন্ধানই করেছেন এখানে। শুধু না-মানুষস্থানের নয়, এই ভারতবর্ষের। এই পশ্চিমবঙ্গের। তাই নাট্যকারকে পিছনে ফেলে কথাসাহিত্যিক তাঁর শততম গ্রন্থে একটা রেকর্ড স্থাপন করলেন—নাটকের শব্দসংখ্যা নগণ্য হয়ে গেল তাঁর 'কৈফিয়ৎ'-এর অনুপাতে।

জন্ম : কলকাতায়। ছাব্বিশে এপ্রিল 1924। আদিনিবাস : নদীয়ার কৃষ্ণনগর। প্রথমে হিন্দুস্কুলে, পরে আসানসোল ই. আই. আর. স্কুল থেকে ম্যাট্রিক, সেন্ট জেভিয়ার্স থেকে আই. এসসি, আর কৃষ্ণনগর কলেজ থেকে বি. এসসি.। তার পর শিবপুর এঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে বি. ই.। ইন্সটিট্যুট অব এঞ্জিনিয়ার্সের (ইন্ডিয়া) ফেলো। পি. ডাব্লু. ডি.-র চাকরি থেকে অবসর নিয়েছেন 1982-তে। মাঝে কিছুদিন দণ্ডকারণ্যে এবং পরে এন. বি. ও-তে ডেপুটেশনে কাজ করেছেন। বর্তমান বছরে বি. ই. কলেজের অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশানের প্রেসিডেন্ট। 1956-এ প্রথম গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল। বর্তমান গ্রন্থটি তাঁর শততম স্বীকৃত প্রকাশিত পুস্তক। শিশু ও কিশোরসাহিত্য, উপন্যাস, রম্যরচনা, ভ্রমণ, নাটক, বিজ্ঞানভিত্তিক গ্রন্থ, স্থাপত্য-ভাস্কর্য প্রতি বিভিন্ন বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করাতেই তাঁর আনন্দ। স্বভাবে একান্তচারী! গোষ্ঠী- নিরপেক্ষ। পড়া-লেখা-আঁকা নিয়েই তাঁর সময় কাটে।

এক. দুই.. তিন...

নারায়ণ সান্যাল

॥ ঘোষণা ॥

1. এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে প্রকাশকের প্রাপ্য যাবতীয় লভ্যাংশ এবং লেখকের প্রাপ্য যাবতীয় রয়্যালটি নিম্নবর্ণিত তিনটি সমাজসেবী প্রতিষ্ঠানে অর্ঘ্য হিসাবে নিবেদনের যৌথসিদ্ধান্ত আমরা নিয়েছি।
   ক। মিশনারিজ অফ চ্যারিটিস্ — মাদার টেরেসা পরিচালিত
   খ। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ — প্রণবানন্দজী প্রতিষ্ঠিত
   গ। মানবাধিকার রক্ষা সমিতি — সুজাত ভদ্র পরিচালিত (APDR)

2. কোন নাট্যসংস্থা এই নাটকটি মঞ্চস্থ করতে ইচ্ছুক হলে উপরোক্ত যে-কোন একটি প্রতিষ্ঠানের নামে দুইশত টাকার ব্যাঙ্ক-ড্রাফ্‌ট সহ প্রকাশকের মাধ্যমে লেখকের অনুমতি চাইতে পারেন।

প্রকাশক : সুধাংশুশেখর দে
লেখক : নারায়ণ সান্যাল

(1) CHANDRALEKA, [Ex IAS]: Who resigned from Jayalalitha's govt in Tamil Nadu, after the acid-bulb throwing case sacrificing her 13 years' service and all retiring benefits to join *Tamilaya Nallatchin Iyakkam* (Tamil Nadu Honest Administrative Movement....P. 138

(2) MEDHA PATKAR : Non-violent fighter against the 'triumvirate' : HCMs Gujarat, M.P. & Rajasthan to save a few million 'have-nots' living in Narmada Valley..P. 122

(3) G.R. KHAIRNAR : Dy. Mun. Commr. of Bombay, suspended for his relentless honesty, by H. C. M. Sarad Power and finally fired by H. C. M., Joshi (B.J.P.)... P. 150

(4) T. N. SESHAN CEC : Considered as an one-man army to combat corruption in election, inexorably, aganist all party colours : Red, Blue, Green, Saffron or Black, without prejudice, not withstanding recent pair of cogs in the wheel !...P. 67

(5) SAFDAR HASMI : Playwright, performning artist and an undefiled communist who preferred martyrdom to compromise with exploiters to his right and left....P. 93

(6) P.K. JHA, IPS : As Jamnagar Police Chief he clashed with the Chief Minister by refusing to stop chasing the anti-socials, sheltered by higher-ups. Like Sanjay Mukherji, IPS, in W.B., he was "punished through a promotion."....P. 147

(7) NAZRUL ISLAM., IPS : A Hercules of honesty in W.B. Police Force, who arrests with equal ease a traffic constable, pocketing bribe or a Panchayet Sabhadhipati black marketing cement. He is now engaged in chasing the fugitive promoter of the 5 storey 'pack of cards' that collapsed in Calcutta in July '95.....P. 119

(8) ANANDI SAHU. IPS, DIG : Dauntlessly divulged— defying the ministerial advice— the truth before the enquiry commission, for the notorious Cuttak hootch, where 200 died in one night. The corrupt ministers were exposed and Sahu was shunted out and unceremoniously made the states' sports director...P. 108

(9) P. K. SINGHA, Bihar A.S. : Like G.R. Khairnar he lost his job as a price for his honesty in trying to demolish unauthorised constructions of Mafias patronised by political Titans in Patna...P. 97

(10) KIRON BEDI, IAS : Honoured by Magsesey Award from abroad for her attempts to reform rules in jails, and honouring human rights, she was denegraded by internal administration for her uncompromising and upright attitude.....P. 159

(11) K.J. ALPHONS, IAS : Who has regained land in favour of D.D.A., valued at 10,000 crores, from illegal owners, protected by tycoons and politicians. He is facing over 24,000 court cases and is a glaring exception amongst his IAS collegues, as he has not yet been punished for his honesty — "curiouser and curiouser !"...P. 142

(12) S. K. CHADDA, IFS : An animal lover who staked his job and then his life to fight aganist the govt. in his attempt to save an endangered rare species of turtles in Orissa coast ! *Pagal admi hai Kya ?*...P. 110

(13) RINA VENKATRAMAN, IAS: Nicknamed 'Bulldozer Lady D.M.', cleansed the legendary Augean Stalls in Bankura, which although, or, because of, thousands of impotent oxen of politicians—right and left—had been stabled there, had not been cleaned out for three decades ! She performed this Herculean task but unfortunately could not kill the Lernean Hydra, the serpent with nine hideous heads, the middle one of which was inmortal, although for each of the others that was severed two more heads grew in its place. As a result she was carried off to her home-town on a funeral pyre of her own making— exactly as Hercules...P. 160

(14) ASHIT BHATTACHARJI, IAS : Changed the atmosphere in his office, issuing passports, in Calcutta. He snubbed the brokers and dishonest assistants. It is rumoured that his father-in-law had to stand in queue to collect his own passport !....P. 137

(15) SWARAN SINGHA, IAS : Refused to recruit clerks through back-door as insinuated, expressly desired, finally ordered by the 'Honourable C.M.' and was ready to aecept martyrdom as a consequence....P. 117

(16) ULHAS JOSHI, IPS : The report covering his daring activities was published in the Sunday Observer under the title : *The Mosquito & the Elephant.* This mosquito's bites are one of the prime causes for the titanic fall of the pachyderm !....P. 154

(১) **চন্দ্রলেখা** [প্রাক্তন আই. এ. এস.]: তামিলনাড়ু রাজ্যে জয়ললিতা সরকারে মুখ্যমন্ত্রীর বিরোধিতার পর ওঁর মুখে অ্যাসিড-বাল্‌ব্‌ ছুঁড়ে মারা হয়। চন্দ্রলেখা তাঁর তের বছরের চাকরির যাবতীয় প্রাপ্তির আশা ছেড়ে পদত্যাগ করেন। তামিলনাড়ে সৎ শাসন প্রবর্তনের জন্য একটি প্রতিষ্ঠানে যোগ দিয়ে কুশাসনের বিরুদ্ধে বর্তমানে যুদ্ধরতা ...পৃ. 138

(২) **মেধা পটকর** ঃ সমাজসেবী। অহিংস অসহযোগী যোদ্ধা একযোগে তিন 'মহাবীরের' বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন — গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ ও রাজস্থানের তিন মুখ্যমন্ত্রী। 'নর্মদা বাঁচাও আন্দোলনের প্রাণ মহিলা!' উপর্যুপরি অনশনে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে গেছে। তবু মৃত্যু মুঠোয় নিয়ে তিনি লড়ে যাচ্ছেন.....পৃঃ. 122

(৩) **জি. আর. খৈরনার** ঃ বোম্বাই মিউনিসিপ্যালিটির ডেপুটি কমিশনার। বোম্বাই শহরে শাসকস্তম্ভ মস্তানপার্টির বেআইনি বাড়ি ভাঙতে গিয়ে বাধা পান। কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রী শারদ পাওয়ারের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়ায় সাস্‌পেন্ডেড। হাকিম বদলে গেল—হুকুম বদলালো না। খেরনার নতুন বিজেপি মুখ্যমন্ত্রী কর্তৃক পদচ্যুত.....পৃঃ. 150

(৪) **টি. এন. শেষন, সি. ই. সি.** : কল্কি-অবতারের রূপে অবতীর্ণ হয়েছেন দুর্নীতি দূরীকরণমানসে। বিশ্বের বৃহত্তম ডেমক্রেসির মর্যাদা রক্ষা করতে প্রাণপাত করছেন। নির্বাচনকে দুর্নীতিমুক্ত করতে বদ্ধপরিকর। তাঁকে 'সাহায্য' করতে সুপ্রীম কোর্ট দুই সহকারী নিযুক্ত করেছেন ; তবুও পাগলা জগাই লড়ে যাচ্ছেন.....পৃ. 67

(৫) **সফদার হাসমি** : নাট্যকার, নাট্যপ্রযোজক, অভিনেতা এবং কলুষমুক্ত সুদুর্লভ সাচ্চা কম্যুনিস্ট। দিল্লির রাজপথে পথনাটক করে ফিরতেন। শাসক-শোষকদলের মুখোস খুলে দেবার এ প্রচেষ্টায় তাঁকে সাবধানবাণী শোনানো হল। কর্ণপাত

করলেন না। তাই হাসমি শহীদ হয়ে গেলেন.....পৃ. 93

(৬) **পি. কে. ঝা, আই. পি. এস.** : জামনগরের পুলিশ প্রধানের প্রতি মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ ছিল : বিশেষ বিশেষ সমাজবিরোধী বাদ দিয়ে দুর্নীতি দমন করতে। ঝা কর্ণপাত করেননি। ঝা-র বিরুদ্ধে শাস্তির আদেশও দেওয়া যাচ্ছে না, কারণ তিনি যাদের ধরে আনছেন আদালত তাঁদের ক্রমাগত কঠিন শাস্তি দিয়ে চলেছেন। ফলে পি. কে. ঝাকে "শাস্তিমূলক পদোন্নতি ঘটিয়ে একটি বাতানুকূল করা কক্ষে বন্দী করা হল।" হুবহু ব্যারাকপুরের প্রাক্তন এস্‌ডিপিও সঞ্জয় মুখার্জির মতো....পৃঃ. 147

(৭) **নজরুল ইস্‌লাম, আই. পি. এস.** : পশ্চিমবঙ্গ পুলিশে ইতিমধ্যেই 'সততার প্রবাদপুরুষ' হয়ে গেছেন। দুর্নীতি দেখলেই ঝাঁপিয়ে পড়েন। তা তিনি ট্রাফিক পুলিশই হোন, অথবা সে সিমেন্ট পাচারকারী পঞ্চায়েত সভাধিপতিই হোক! ক্রমাগত বদলি হচ্ছেন। 'সততা-অপরাধে' তার চেয়ে বড় শাস্তি দেওয়া যাচ্ছে না। কারণ ভদ্রলোক ইতিমধ্যে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে গেছেন। তাঁর 'নাম-মিতা' কবি নজরুলের মতো।....পৃ. 119

(৮) **অনাদি সাহু, আই. পি. এস., ডি. আই. জি.** : মন্ত্রীমণ্ডলীর নির্দেশ অগ্রাহ্য করে এনকোয়্যারি কমিশনের কাছে আদ্যন্ত সত্য জবানবন্দি দেন। ফলে, কটক শহরে বে-আইনি মদের ঠেক-এ দুই শত মদ্যপায়ীর মৃত্যুর জন্য দুইজন পূর্ণমন্ত্রী চিহ্নিত হয়ে যান। এবং তার ফলে, অনাদি সাহুকে পুলিশের উর্দি খুলে ফেলতে হয় তাঁকে রাজ্যের 'স্পোর্টস্ ডিরেকটার' পদে বদলি করা হয়।....পৃঃ. 108

(৯) **পি. কে. সিন্‌হা, বিহার অ্যাঃ সার্ভিস** : ইতিহাস নিজের পুনরাবৃত্তি। ইনি পাটনার খৈরনার। রাজনীতি ব্যবসায়ীদের ছত্রছায়ায় যেসব গুণ্ডা-মস্তান পাটনা শহরে বেআইনী গৃহনির্মাণ করেছিল তা ভাঙতে শুরু করেন। ফলে চাকরি থেকে বরখাস্ত হন। সততার মূল্য দিতে।.....পৃঃ. 97

(১০) **কিরণ বেদী, আই. এ. এস.** : কারা-সংস্কারে মগ্নচৈতন্য এই মহিলা অফিসারের কৃতিত্বে তাঁকে বহির্ভারত 'ম্যাগ্‌সেসে' পুরস্কারে বিভূষিত করেছে। অন্তর্ভারতে 'সততা'-অপরাধে এই মহিলাকে ক্রমাগত বদলি করে কব্জা করার প্রচেষ্টা চলেছে।....পৃ. 159

(১১) **কে. জে. আলফন্স. আই. এ. এস.** : দিল্লি শহরে দশহাজার কোটি টাকার জবরদখল জমি-বাড়ি উদ্ধার করে ইতিহাস রচনা করেছেন। তাঁর বিরুদ্ধে ২৪,০০০ মামলা ঝুলছে। আই. এ. এস-কুলে ইনি বিচিত্র ব্যতিক্রম। কারণ সৎ কাজ করার অপরাধে এখনো তাঁকে কোনও শাস্তি দেওয়া যায়নি। কিমাশ্চর্যমতঃপরম্!.....পৃ. 142

(১২) **এস. কে. চাড্ডা, আই. এফ. এস.** : এই না-মানুষ দরদী বনদপ্তরের অফিসার একজাতের বিরল প্রজাতির সামুদ্রিক কাছিমকে রক্ষা করতে গিয়ে নিজের চাকরি এমন কি প্রাণ পর্যন্ত হারাতে বসেছিলেন। সাধারণ মানুষের ভালবাসা এবং তৎপরতা তাঁকে রক্ষা করেছে ষড়যন্ত্রীমশাইদের ক্রোধানল থেকে। তাঁকে, এবং সেই অবলুপ্তিমুখীন বিরল প্রজাতির কাছিমদের...পৃ. 138

(১৩) **রীনা বেঙ্কটরামন, আই. এ. এস** ঃ

বাঁকুড়ার এই মহিলা ডি. এম.-এর পথচল্‌তি মানুষের দেওয়া নাম হয়ে গিয়েছিল 'বুলডোজার লেডি'। বাঁকুড়া শহরে বেআইনি ঝোপড়ি-বাড়ি ভেঙে তিনি অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। বাঁকুড়া পৌরসভার ঘুঘুর বাসা ভেঙে দিতেও তাঁর বাধেনি। বাধ্য হয়ে দেশশাসনের প্রয়োজনে তাঁকে 'রুটিন' বদলি করে দিতে হল।....পৃঃ. 160

(১৪) **অসিত ভট্টাচার্য, আই. এ. এস.** : কলকাতা ব্রেবোর্ন-রোড পাসপোর্ট অফিসের চেহারা পালটে দিয়েছিলেন কয়েক মাসের মধ্যে। দালাল এবং অসৎ সরকারী কর্মীর ঘুঘুর বাসা ভেঙে ইতিহাস রচনা করেন। শোনা যায়, তাঁর শ্বশুরমশাইকেও 'কিউ'-এর লাইনে দীর্ঘ সময় দাঁড়াতে হয়েছিল। আজ্ঞে হ্যাঁ, পিতা নন, শ্বশুর —বেটার হাফের পিতৃদেব!....পৃ. 137

(১৫) **স্মরণ সিং, আই. এ. এস.** : মহাপরাক্রমশালী মুখ্যমন্ত্রীমশাই প্রথমে ইঙ্গিতে জানালেন : মোটা মাথায় ঢুকল না। বাধ্য হয়ে স্পষ্টভাষে ইচ্ছা প্রকাশ করলেন, তবুও না। শেষে বাধ্য হয়ে আদেশ জারী করলেন —স্মরণ সিং তবু নির্বিকার। সরকারি চাকরিতে গ্রহণ করার জন্য যে কেরানিদের পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে তার ফলাফলের উপরেই তিনি প্রার্থীদের চাকরি দেবেন —এই তাঁর ধনুকভাঙা পণ! মুখ্যমন্ত্রী-নির্বাচিতদের পিছনের দ্বার দিয়ে ঢুকতে দেবেন না। বলতে ভুলেছি, ওঁর ঘাড়ে ঐ 'মোটা মাথা' কিন্তু একটাই ছিল।....পৃঃ. 117

(১৬) **উল্‌হাস যোশী, আই. পি. এস.** : তাঁর কীর্তিকাহিনী নিয়ে 'সান্‌ডে অবজার্ভার'-এ যে নিবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল তার নাম : 'মশা বনাম হাতি'! প্রবীণ প্রধানমন্ত্রীর ভালমন্দ কিছু হলে দিল্লীমসনদে যাঁর চড়ে বসার যথেষ্ট সম্ভাবনা, সেই গজদানব নির্বাচনে ভূতলশায়ী হলেন যে কয়টি হেতুতে তার মধ্যে অন্যতম প্রধান কারণ ঐ মচ্ছড়ের মোক্ষম কামড়....পৃ. 154

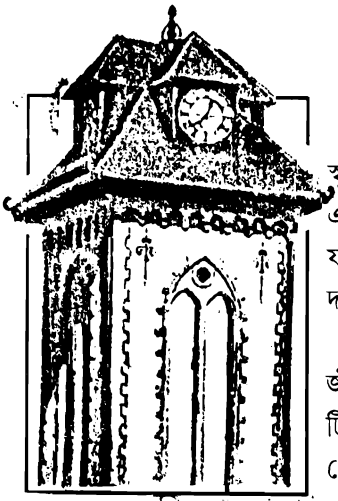

এক

স্কুল-কলেজে নেশা ছিল ক্রিকেট। ইংরেজিতে শব্দটার একটা যোগরূঢ় অর্থ আছে : ভদ্রতা। 'কিউ' ভেঙে কেউ যদি অন্যায়ভাবে ডিঙিয়ে যেতে চায় তখন আমরা বলি : দ্যাটস্ নট ক্রিকেট!

তা সেই ক্রিকেটখেলা ছেলেবেলা থেকে আমার জীবনকে নানাভাবে প্রভাবিত করেছে। আমি ছিলাম স্কুল টিমের 'উইকেট-কিপার-কাম ওপনিং ব্যাট'। ও খেলাটাতে ঐ তে-কাঠিই তো যা কিছু — জীবনে যেমন : সত্য-শিব-সুন্দর! তা সে যাই হোক, উইকেট-কিপার হওয়াতে শিখেছি যথেষ্ট। লাভের অঙ্কে সারা জীবনে জমা পড়েছে অনেক কিছু — কাপ-ডিশ, কাচের গ্লাস, ঘড়ি, চশমা, তেলের শিশি! দণ্ডায়মান অবস্থায় হস্তচ্যুত হবার পর উইকেট-কিপারের প্রতিবর্তী ক্ষিপ্রতায় লুফে নিতে পেরেছি ঐ ভঙ্গুর জিনিসগুলি ভূমিস্পর্শ করার আগেই। আবার 'কিপার' হওয়ায় লোকসানের অঙ্কেও জমা পড়েছে বেশ কিছু। তেকাঠির পিছনে উৎগ্রীব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে একটা 'উটরোগ' সারা জীবনের মতো বাসা বাঁধল আমার গ্রীবায়! যে বলটা নির্ঘাত ঐ তেকাঠিতে এসে পৌঁছতো সেই সত্য-শিব-সুন্দরের অভিযাত্রীকে কোন স্বাধিকারপ্রমত্ত অন্যায়ভাবে পদাঘাত করা মাত্র আমার কণ্ঠনালীতে অভ্যস্ত একটা লব্জ প্রতিবর্তী প্রেরণায় স্বতঃ উৎসারিত হয়ে উঠবেই : 'হাউজ্জ্যাট'!

সরকারী চাকরি জীবনের ঊষাযুগে স্বনামে লেখার অনুমতি পাইনি। অথচ পার্মানেন্ট লায়াবিলিটি ক্যাম্পে উদ্বাস্তু নরনারীদের ডাম্প করে রাখায়, দণ্ডকারণ্যে তাদের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা দেখে কলম বিদ্রোহ করত। ছদ্মনাম নিতে হল ফলে। বোধকরি নামচয়নের সময়েও কৈশোরের উইকেট-কিপিংটাই আমাকে চালিত করেছিল। কৌরব সভায় দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের সেই নারকীয় আয়োজনের দিনে যখন ভীষ্ম-দ্রোণ বা ভীমার্জুনের মতো ডব্‌ল্-ট্রিপ্‌ল সেঞ্চুরি-ব্যাট 'ডাক' করছেন — উভয় অর্থেই — অথবা আপনমনে বিবেককে সান্ত্বনা দিচ্ছেন : 'এমনটা তো হয়েই থাকে', তখন উঠে দাঁড়িয়েছিল : বিকর্ণ! সেই তরুণ 'এটিকেট-কিপার' বিকর্ণই প্রতিবাদীকণ্ঠে চিৎকার করে উঠেছিল : 'হাউজ্জ্যাট!'

একমাত্র প্রতিবাদী বিকর্ণই সভাকক্ষ ত্যাগ করে চলে গিয়েছিল। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব ইংরেজি জানলে নির্ঘাৎ ওর মুখে ডায়ালগ বসিয়ে দিতেন : 'দ্যাটস্ নট ক্রিকেট!'

'বকুলতলা পি এল ক্যাম্প' থেকে 'মান মানে কচু', 'অরণ্যদণ্ডক' থেকে 'এমনটা তো

হয়েই থাকে' — ক্রমাগত সেই একঘেয়ে : 'হাউজ দ্যাট!'

তার ফলে ক্রমে হয়ে পড়েছি একান্তচারী, অন্তেবাসী, একঘরে!

'উইকেট-কিপার' বা 'ওপনার' হিসাবে মোটামুটি সাফল্যলাভ করলেও 'ব্যাটসম্যান' হিসাবে কিছুতেই পৌঁছতে পারলাম না আমার কাঙ্ক্ষিত সপ্তম স্বর্গে : সেঞ্চুরি!

পঞ্চাশের ওপারে পৌঁচেছি বেশ কয়েকবার। কিন্তু তার পরেই আমার ঘাড়ে এক ভূত চাপতো! হয়ে পড়তাম নার্ভাস। হয় অহৈতুকী ঠুক-ঠুক, নয় ওভার-বাউন্ডারির উচ্চাকাঙ্ক্ষায় ক্যাচ-আউট! কিছুতেই তীর্থের শেষপ্রান্তে পৌঁছে ব্যাট তুলে দর্শকদের অভিনন্দন লাভ করতে পারিনি। ক্রিকেট-জীবনে আমার সর্বোচ্চ স্কোর বর্ধমান মাঠে। 'ওপন' করে 'নট-আউট' ছিলাম। চোখের সামনে ও প্রান্তে দশ-দশজন বিদায় নিল তবু আমার 'সেঞ্চুরি' করা হল না!

আত্মজীবনী লেখার মওকা পাব বলে আশা করি না। 'রূপমঞ্জরী'র দ্বিতীয় খণ্ড বাকি, 'না-মানুষী বিশ্বকোষ'-এর তৃতীয় খণ্ডের জন্য না-হোক বিশটি বর্গের স্তন্যপায়ী প্রাণী অধীর প্রতীক্ষায় অপেক্ষা করছে। ফলে আমার জীবনের সেই 'হায়েস্ট স্কোর'-এর কাহিনীটা এই মওকায় বলে নিতে দিন। আমার চরম সাফল্য ও পরম ব্যর্থতার ইতিকথা!

সেটা 1939 ; দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তখন শিশু। আমি আসানসোল ই. আই. আর. স্কুলের নবম শ্রেণীর ছাত্র। আসানসোল রেলওয়ে ইন্সটিট্যুটের হয়ে আমাদের স্কুলের দুজন মাস্টারমশাই খেলতেন। ভূপেনবাবু-স্যার, আর সতীশবাবু-স্যার। (তখনও বি-কে-জি, এস.সি.বি. ইত্যাদি বলার রেওয়াজ চালু হয়নি)। আর আমরা দুজন ছাত্রও খেলতাম। বোলার হিসাবে মোহিত চাটুজ্জে আর উইকেট-কিপার-কাম-ওপনার হিসাবে আমি। ক্যাপ্টেন ছিলেন রেলের গার্ডবাবু : কিরণ চট্টোপাধ্যায়। বর্ধমান রেলওয়ে ইন্সটিট্যুটের আমন্ত্রণে আমরা খেলতে গেছি আসানসোল থেকে। 'টস্' জিতে ব্যাট করতে যাব — 'প্যাড' পরছি ; মোহিত ওপাশ থেকে বললে, বর্ধমান টীমে একজন সাহেব আছে রে, নারান!

আমি বলি, তুই কী করে জানলি?

ও বলে, স্কোরবুকে নাম দেখলাম যে : বায়রন ভ্যাট!

— বায়রন! কবি বায়রনের নাতির প্রনাতি নাকি?

মোহিত বলে, খোদায় মালুম! মনে হয় অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান। মাঠে নামুক, বদনখানি দেখলেই বুঝতে পারব।

ওপাশ থেকে ক্যাপ্টেন কিরণ চাটুজ্জে ভরসা দেন, না হে না! ঘাবড়াইও না, নারাইন্না! সাহেব নয়। অ্যাংলোও নয়। বুঝলা না? বাঙালের পো। মৈমনসিংহের নেত্রকুনা! বামুনের পুলা। অর পৈত্রিক নাম : বীরেন ভট্টাচার্য! লিখসে : বায়রন ভ্যাট!

তা আম্মো যশুরে বাঙ্গাল! নাম লিখাইছি : কাইরন চ্যাট! অখন বুঝ! — যেমন সওয়াল তেমনই জবাবডা তো দ্যাওন চাই!

সেবার আমরা জিতেছিলাম। বায়রনকে কাৎ করেছিলেন কায়রন। কিন্তু আমি সেঞ্চুরি করতে পারিনি! সেটাই আমার ক্রিকেট-জীবনের হায়েস্ট স্কোর : 'সেভেন্টিওয়ান নট-আউট'!

জানি, আপনারা বিরক্ত হচ্ছেন : ধান ভানতে কেন এই গাজন!

বলছি। হেতুটি বিচিত্র। 'রানাউট' হতে হতে কোনক্রমে ক্রিজে পৌঁছে লিখেছিলাম : '**আবার সে এসেছে ফিরিয়া**'। সেটা প্রকাশিত হয়েছিল নব্বই সালের বইমেলায়। তখন আমার স্কোর ছিল আশি। তারপর ধীরে ধীরে এগিয়েছি কাঙ্ক্ষিত স্বর্গের দিকে। ড্রিংক্স - ব্রেকএ সরবিট্রেট গিল্‌তে গিল্‌তে। গত বছর বইমেলায় প্রকাশিত হয়েছে আমার তিন বছর ধরে লেখা নব-নবতিতম গ্রন্থ : **বাস্তুশিল্প**! এবং তারও পরে এই কয়মাসে ধুঁকতে ধুঁকতে পার হয়েছি আরও বাইশ গজ ক্রীজ। রান-আউট হইনি, হুমড়ি খেয়েও পড়িনি! অথচ কী আশ্চর্য দেখুন — সেই বর্ধমান মাঠে 1939 সালে যা ছিলাম, হিসাব মতো আজও আমি তাই : 'সেভেন্টিওয়ান নট-আউট'!

স্কুলজীবনের কিস্‌সা শুনিয়েছি। এবার কলেজ জীবনেরটা শোনাই। বি. ই. কলেজ হস্টেলে আমার সিট ছিল ডাউনিং ইস্টের একতলায়, দশ নম্বর ঘরে। আমার কক্ষবন্ধু ছিল খগেন দাশগুপ্ত — যে কলকাতায় মেট্রো রেল নির্মাণের সময় ছিল ঐ সংস্থার চীফ এঞ্জিনিয়ার। নিট অ্যান্ড ক্লিন, নিয়মানুবর্তী, অতুলনীয় ঝকঝকে একটি মেট্রো রেলের মালা যে পরিয়ে দিয়েছিল কলকাতার ভূকণ্ঠে — এস্‌প্ল্যানেড থেকে টালিগঞ্জ! আমারই কক্ষবন্ধু! কেউ আমাদের ঠিকানা জানতে চাইলে বলতাম : টেন ডাউনিং স্ট্রিট!

কলেজের ছাত্র ইউনিয়নে আমি ছিলাম ড্রামা-সেক্রেটারি। সে আমলে হাসির নাটক বিশেষ পাওয়া যেত না। অথচ বার্ষিক স্যোশালে হাসির নাটকই সবাই চায়। 'ব্যাপিকাবিদায়', 'অলীকবাবু' ইত্যাদি তখন আর অভিনীত হত না। 'মানময়ী গার্লস স্কুল' গত বছর হয়ে গেছে। ফলে নিজেই লিখে ফেললাম একটি প্রহসন : 'মুশকিল আসান।' নাট্যামোদী কয়েকজন সতীর্থকে পড়ে শোনালাম। তারা রাজি হয়ে গেল। সেটাই মঞ্চস্থ করা হবে। সেটা বোধহয় 1945 সাল। সেক্রেটারি হিসাবে প্রথামাফিক নোটিস-বোর্ডে বিজ্ঞপ্তি দিলাম, নির্দিষ্ট দিনে ইন্সটিট্যুট হলে নাটকের চরিত্রবণ্টন করা হবে। ইচ্ছুক ছাত্রেরা যেন পরিচালকের সঙ্গে দেখা করে। অর্থাৎ আমার সঙ্গে।

নির্দিষ্ট দিনে নাট্যামোদীরা সবাই হাজির। অরুণ বোস্ নির্বাচিত হল নায়িকা হিসাবে। সে আমলে ছেলেরাই মেয়েদের চরিত্রে অভিনয় করত। গোটা বি. ই. কলেজে একটিও

ছাত্রী ছিল না। থাকলেও কোন সুরাহা হত না। স্কটিশে বা প্রেসিডেন্সিতেও ছেলে-মেয়ে এক মঞ্চে অভিনয় করত না তখন।

আমার এক সহপাঠী — স্কটিশের সায়েন্স গ্র্যাজুয়েট সুধীন্দ্রনাথ সরকার এগিয়ে এসে বলল, 'এই নারান, আমাকে একটা পার্ট দে।'

সুধীন্দ্রনাথের উচ্চতা পাঁচ ফুট পাঁচের কাছাকাছি। টক্‌টকে ফর্সা গায়ের রঙ। ঠোঁট দুটো টুকটুকে। হাসিটা মিষ্টি। আমি বলি, তোর গলার স্বর যে পুরুষের মতো। তোকে তো ফিমেল পার্ট দেওয়া যাবে না।

সুধীন ধমকে ওঠে : আমি কি বলেছি ফিমেল রোল করব?

আমিও উল্‌টে ধমক দিতে যাচ্ছিলাম। সামলে নিলাম নিজেকে। এখন আমরা সহপাঠী নই। আমি ড্রামা সেক্রেটারি আর ও চরিত্রপ্রার্থী প্রত্যাশিত কুশীলব। গম্ভীর হয়ে বলি, বেশ! তুই এই ডায়লগটা পড়ে শোনা।

ও পড়ল। বেশ বাগিয়েই পড়ল। কিন্তু আমার মনোমত হল না। মুখটা যতদূর সম্ভব দুঃখিত দুঃখিত করে বলি, এক্সকিউজ মি, সুধীন, নাটক তোর দ্বারা হবে না। গলাটা বাধা না হলে তোকে একটা ফিমেল রোল দেওয়া যেত, কিন্তু...

ও মাঝপথে আমাকে থামিয়ে দেয় : এনাফ্!

উঠে দরজার দিকে চলতে থাকে। আমি আমতা আমতা করি : তুই ইচ্ছে করলে প্রম্পটার হতে পারিস কিন্তু . . .

ও দরজা পর্যন্ত চলে গিয়েছিল। সেখানেই ঘুরে দাঁড়াল। আমার দিকে পূর্ণদৃষ্টি মেলে তাকালো। আমার তখন মনে হয়েছিল, রাগে, আক্রোশে, আমার প্রতি ঘৃণায় ওর চোখ দুটো জ্বলছে। এখন বুঝতে পারি : না! সেই খণ্ডমুহূর্তে ওর বুকের ভিতর একটা সুপ্ত আগ্নেয়গিরি হঠাৎ উদ্গীরণ উন্মুখ হয়ে পড়েছিল। একটা অন্তর্লীন দাহিকাশক্তির কিছুটা প্রতিফলিত হয়েছিল ওর দু-চোখে। ও বললে, একটা কথা বলে যাই, মনে রাখিস্, নারান! নাটক লিখে অথবা অভিনয় করে তুই কোন দিন প্রতিষ্ঠা পাবি কি না জানি না, কিন্তু আমি পাব!

কী দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে কথাগুলো বলেছিল সুধীন্দ্রনাথ! তারপর পাঁচ পাঁচটা দশক পার হয়ে গেছে, তবু তার সেই দার্ঢ্যমণ্ডিত দৃঢ়প্রত্যয়ী ঘোষণার কথাটা ভুলতে পারিনি।

না পারার একটা বিশেষ হেতুও যে আছে। আজ এই জীবনের অপরাহ্ণ-বেলায় অকুণ্ঠ স্বীকৃতি দিয়ে যাচ্ছি : সুধীন্দ্রনাথের ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে ফলে গিয়েছিল। সাহিত্যসেবী হিসাবে আমার প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ 'মুশকিল আসান'। পরে বুঝেছি, সেটা সার্থক নাটক হয়নি। প্রথম এডিশান নিঃশেষিত হবার পর তাই তার পুনর্মুদ্রণ হতে দিইনি। তারপর এই পঞ্চাশ বছরে বেশ কয়েকটি নাটক লিখেছি, পাণ্ডুলিপি অবস্থায়

তার অভিনয়ও হয়েছে — মফঃস্বলে, কলকাতার রামমোহন হলে, গিরীশ মঞ্চে এবং রবীন্দ্র সদনেও। আমি নিজেও কয়েকটিতে অভিনয় করেছি। কিন্তু কোন নাটক আর পুস্তকাকারে ছাপতে সাহস পাইনি। অভিনেতা হিসাবে কেউ আমাকে চেনে না। নাট্যকার হিসাবে কোথাও কল্‌কে পাইনি।

আর সুধীন্দ্রনাথ সরকার?

শুধু ভারতীয় নয়, আন্তর্জাতিক খ্যাতির অধিকারী সে!

নাট্যজগতে তার নাম যাঁদের সঙ্গে একনিশ্বাসে উচ্চারিত হয় তাঁরা : নবান্নখ্যাত বিজন ভট্টাচার্য, প্রবাদপ্রতিম শম্ভু মিত্র, বিদ্রোহী ভৃগু উৎপল দত্ত, ঘাসিরাম কোতোয়ালখ্যাত বিজয় তেণ্ডুলকার, কর্ণাটকের গিরীশ কারনাড, মহারাষ্ট্রের হাবিব তনবীর, অথবা দিল্লীর শহীদ সফদার হাস্‌মি!

আপনারা অবাক হচ্ছেন? হবার কথাই। আমি কলেজ রেজিস্টার মোতাবেক নামটা লিখেছি। আমার এই শততম গ্রন্থখানি — 'নাটকখানি' — যাকে উৎসর্গ করে ধন্য হলাম, আমার সেই সহপাঠী বন্ধুর নাম **শ্রী সুধীন্দ্রনাথ সরকার, বি. এসসি., বি. ই., সি. ই.,** ওরফে : **বাদল সরকার!**

* * *

ইচ্ছে থাকলেও, আগেই বলেছি, আত্মজীবনী লিখবার সময় আমি পাব না বোধহয়। বাদলও এখন 'একাত্তর নট-আউট'। তারও সময় অল্প। তবে শতায়ু-হলেও সে আত্মজীবনী লিখবে না। আরও খানকতক নাটক লিখবে। তাই এই সুযোগে আমাদের কলেজ-জীবনের কিছুটা স্মৃতিচারণের সুযোগ দিন। যার নামে নাটকটা উৎসর্গ করা গেল তার কিছু অন্তরঙ্গ কথা বলে নিতে দিন। তাতে ওর জীবনীকারের সুবিধা হবে।

বি. ই. কলেজে পড়ার সময়েই — আর কেউ জানত না, আমি জানতাম — বাদল ছিল অবিভক্ত বাঙলার, অবিভক্ত কম্যুনিস্ট পার্টির একজন একনিষ্ঠ কর্মী। ঠিক জানি না, আমি নাটক লিখবার চেষ্টা করি বলেই বোধহয় সে আমাকে একটু নেকনজরে দেখত। প্রায় প্রতিটি শনিবারে — কখনো অনুমতি নিয়ে, কখনো না পেয়ে — আমরা হস্টেল ছেড়ে কলকাতায় পালিয়ে আসতাম। আমার বাবা, মা, দাদা-দিদিরা থাকতেন বউবাজার অঞ্চলে। বাদলও হস্টেল থেকে 'কাটত'। ওরও গন্তব্যস্থল মধ্য-কলকাতায়। বি. ই. কলেজ বাস-টার্মিনাস থেকে বাসে উঠ্‌লে ধরা পড়ে যাবার আশঙ্কা ; তাই অনেক সময় হাঁটাপথে বাতাইতলায় এসে আমরা বাসে চাপতাম।

কোন এক শনিবার বাতাইতলা বাস স্ট্যান্ডে দেখা হয়ে গেল বাদলের সঙ্গে। ও হঠাৎ এগিয়ে এসে বললে, নারান, তুই তো নাটক-ফাটক লিখিস্‌। জীবনকে দেখবি?

আমি বলি, আমি 'নাটক' লিখি, 'ফাটক' চিনি না।

ও বললে, তবে থাক!

— মানে?

— 'ফাটক'কে ভয় পাস্ বল্‌লি যে!

আমি রুখে উঠি, 'ফাটককে ভয় পাই' একথা আমি বলিনি মোটেই। কিন্তু 'জীবন'টা কে?

— ফাটকের ভয় সত্যিই যদি না থাকে তবে আয় আমার সঙ্গে।

— কিন্তু 'জীবন' কার নাম বললি না তো?

— সেকথা বলে বোঝানো যায় না। আয় না আমার সঙ্গে। নিজের চোখেই দেখবি। চিনে নিবি।

বাদল আমাকে নিয়ে গিয়েছিল খিদিরপুর ডক-ইয়ার্ডের বস্তি এলাকায়। অমন দমবন্ধ পরিবেশে আমি আগে কখনো যাইনি। অথচ লক্ষ্য করে দেখলাম, বস্তির বাসিন্দাদের কাছে বাদ্‌লা অতি পরিচিত। কর্দমাক্ত পথ ধরে আমরা দু-বন্ধু চলেছি, আর দু-পাশের ছাপরা থেকে অজানা-অচেনা মানুষ আমাদের দুজনকে 'পেন্নাম' অথবা 'ছালাম' জানাচ্ছে। জানাচ্ছে বাদলকেই। আমি নিমিত্ত মাত্র। যেহেতু আমি সঙ্গে আছি তাই রথের উপর কাঠের ঘোড়ার মতো 'পেন্নাম' পাচ্ছি! বাদল কখনো কাউকে প্রশ্ন করছে, "কী হে বসির, তোমার বাচ্চার জ্বরটা ছেড়েছে?" কাউকে বলছে, "আক্রামভাই, এবার তোমাদের ইউনিয়ানে কাকে দাঁড় করাচ্ছ ভেবে রেখেছ?...না, না, আমার কথা মানবে কেন? তোমাদের লোক তোমরাই পছন্দ করবে।" কখনো কোন অবগুণ্ঠনবতীর সামনে থমকে থেমে গিয়ে বলছে, "কী হল রে ময়না? তোর মরদের পাত্তা এখনো পাওয়া যায়নি?" মেয়েটি আমাদের চেয়ে বড়। জীর্ণ-ধূলিমলিন বসন তার অঙ্গে। কাঁকালে শিশু। সে ডুগরে কেঁদে ওঠে। বাদল বড় দাদার মতো অক্লেশে তার মাথায় হাত রেখে সান্ত্বনা দেয়। ওর-মুঠিতে গুঁজে দেয় দুটো টাকা। চল্লিশের দশকের সে দুটি মুদ্রার বর্তমান বাজারদর হয়তো হাজার টাকা। নিশ্চয় ওর পকেট-মানি। তারপর ও হয়তো ময়নার পাশের ছাপরাটায় টোকা দেয়। বের হয়ে আসে উদাম-গা, লুঙ্গিধারী একজন মেহনতি মানুষ। বাদল তাকে বলে, ছগনলাল! ময়না তোমার বহিন, যেমন আমারও বহিন। দেখ, ভুখের তাড়নায় ও যেন আড়কাঠির খপ্পরে না পড়ে।

স্বীকার্য : পাঁচ দশক পরে 'ছগনলাল, ময়না, আক্রামভাই' নামগুলো আমি কল্পনা করেছি — কিন্তু ঘটনাবিন্যাসে, পেন-অ্যান্ড-ইংক স্কেচে কল্পনার আশ্রয় আমি নিইনি। আমি স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম। স্ট্রাকচারাল এঞ্জিনিয়ারিং ক্লাসে আমাদের ইনফ্লুয়েন্স-লাইন ডায়াগ্রামের সাহায্যে অঙ্ক কষতে হত। বাদলও তা কষত। আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি সেসব অঙ্ক কষতে কষতে বাদল মনে মনে আরও একটা অঙ্ক কষত — ময়না কতটা স্ট্রেস-স্ট্রেন নিতে পারবে, কখন ময়নার মেরুদণ্ডটা 'সেফ-লোডের' সীমা

অতিক্রম করায় ভেঙে যাবে। আর ঐ স্বামীত্যক্তা যুবতী মেয়েটির জীবনে আড়কাঠির 'ইনফ্লুয়েন্স-লাইন-ডায়াগ্রামটা' কেমনতর!

শেষমেষ আমাকে বাসে তুলে দিয়ে বাদল বলেছিল, কীরে নারান। 'জীবন'কে দেখলি? চিনতে পারলি? বস্তির জীবন? এদের কথা লিখিস্ তোর বইতে। না হলে সবটাই বেহুদ্দো পণ্ডশ্রম!

* * *

তারিখটা মনে আছে। তারিখটা যে ভোলার নয়। মনুমেন্টের নিচে দাঁড়িয়ে এপার-বাঙলা ওপার-বাঙলার শেষ মুখ্যমন্ত্রী মহামহিম হোসেন শহীদ সুরাবর্দি ছায়েব 'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান' ঘোষণা করার ছেষট্টি ঘণ্টা পরের কথা। আঠারোই আগস্ট 1946, বেলা আড়াইটে। বাস-ট্রাম মটোরগাড়ি তো দূরের কথা, পথে একটা সাইকেল-আরোহী কি পথচারীও নেই। সমস্ত কলকাতার প্রতিটি বাড়ির দরজা-জানলা বন্ধ। শুধু মাঝে মাঝে সার দিয়ে চলেছে মিলিটারি কনভয়। গতকাল পর্যন্ত দুই সম্প্রদায়ের রণহুঙ্কার শোনা গিয়েছিল। আজ — অল কোয়ায়েট অন দ্য ক্যালকাটা ফ্রন্ট!

আমাকে বাড়ি যেতেই হবে। মেজদির অবস্থা ক্রিটিক্যাল। আছেন বউবাজারে। হাসপাতালে সীট বুক করা আছে। সন্তান সম্ভাবনা। কিন্তু ছত্রিশ বছর বয়সে তাঁর তৃতীয় সন্তান হচ্ছে। ভগ্নিপতি ডাক্তার। মিলিটারির মেজর। যুদ্ধ থেমে গেছে, কিন্তু যুদ্ধে আহত সৈনিকদের চিকিৎসা তখনো চলছে, ফলে ছুটি পাননি। গাইনি ডেট দিয়েছেন আগস্টের শেষ সপ্তাহে। আমাকে যেতেই হবে! অনুমতি নেবার চেষ্টা করা বৃথা — হাওড়া সহ গোটা কলকাতায় কার্ফু।

থার্ড গেটের কাছাকাছি পাঁচিলের একটা ইট আলগা। ওখান দিয়েই টপকাতে হবে। গাছের আড়ালে আড়ালে পাঁচিলটার দিকে এগিয়ে চলেছি। ছেলেরা সবাই ক্লাসে। প্রফেসাররাও। ঠাকুর-চাকরেরা দিবানিদ্রায় মগ্ন। টহলদারী দারোয়ানটা এখন কোথায় জানি না। হঠাৎ পিছন থেকে কে যেন চাপা গলায় ডেকে ওঠে, এই নারান!

চমকে পিছন ফিরি : বাদল।

বললে, থার্ড গেটের ধারেই মাঠে ওড়িয়া ঠাকুরেরা টোয়েন্টি-নাইন খেলছে। দেখলেই ধরিয়ে দেবে। ওদিক দিয়ে হবে না। আমার পিছু পিছু আয়।

জিজ্ঞেস করি, তুই কলকাতায় যাচ্ছিস কেন?

— সে অনেক কথা! ওসব খেজুরে আলাপ পরে হবে। আয়।

অনেক ঘুরপথে বাদল আর আমি কলেজ কম্পাউন্ডের বাইরে এসে পৌঁছলাম। তারপর সোজা হাঁটা পথ। নিম্বার্ক আশ্রম, শালিমার গেট হয়ে ফোর-শোর রোড। এ পথটা নির্জন। কলকারখানা বন্ধ। জনমানবশূন্য। অনেক কায়দা করে বিসর্পিল পথে এসে

পৌঁছলাম হাওড়া ব্রিজে। মিলিটারি কনভয় যাচ্ছে। সাহস হল না পার হতে। 'দেখন্-গুলি'র হুঁশিয়ারি বেতারে প্রচার করা হচ্ছে ঘণ্টায় ঘণ্টায়। একজন মাঝি রাজি হয়ে গেল। চড়া পাড়ানি নিয়ে বাবু-ঘাট তক্ পৌঁছে দেবে। গঙ্গায় দু-একটা নৌকা চলাচল করছে বটে। মিলিটারির তাতে ভ্রূক্ষেপ নেই। ওপারে এসে পৌঁছলাম যখন — তখন দুপুর গড়িয়ে বিকেল। জনমানবহীন ঘাট্‌লা থেকে পায়ে পায়ে উঠে এলাম হ্যারিসন রোডে। আজ্ঞে হ্যাঁ, গান্ধিজী তখনো ভারত-বিভাগ রুখতে আপ্রাণ লড়ে যাচ্ছেন — তিনি জীবিত — ফলে, ওটা হ্যারিসন রোডই।

বাদল বলল, মিলিটারি-টহল শুধু বড় রাস্তায়। কলকাতার এঁদো গলির পাত্তা ওরা জানে না। আয়, গলি-ঘুঁজি দিয়েই পাড়ি মারতে হবে।

আমি বলি, বেশ। তাই চল তাহলে —

স্ট্র্যান্ড রোডের মোড়ে একটা গলিতে সেঁদুতে যাব হঠাৎ পিছন থেকে শোনা গেল ব্যাঘ্রগর্জন : য়ু দেয়ার! হল্‌ট্! অর এল্‌স্....

'অন্যথায় কী হবে' জানি। বেতারে ঘণ্টায়-ঘণ্টায় প্রচারিত হচ্ছে সাবধানবাণী : 'দ্যাখন গুলি'! থিয়েটারের ভাষায় যাকে 'স্টিল্' হয়ে যাওয়া বলে আমরা দুজনেই তাই — ড্রামা-সেক্রেটারি আর সিলেক্‌শান-টেস্ট-এ গাড্ডু-খাওয়া কুশীলব!

— অ্যাবাউট টার্ন।

এ পাশ ফিরে মুখোমুখি হলাম মহাপ্রভুর। হাইল্যান্ডার গোরা। হাতে স্টেন-গান। বাগিয়ে ধরে আছে। জানতে চাইল খাজা ইংরেজি 'উরুশ্চারণে' : শহরে কার্ফু, জান না? কে তোমরা? কোথায় যাচ্ছ? মাথার উপর হাত তোল।

একটা কথা জিজ্ঞেস করি : ইদানীংকালে অঙ্কনমঞ্চ-আয়োজিত বাদল সরকারের নাটকে বাদলকে বেমক্কা কোন গাছের চরিত্র অভিনয় করতে দেখেছেন? হাওয়ায় গাছের পাতা ঝির্‌ঝির করে কাঁপছে? অবিকল সেই ভঙ্গি। হরেকেষ্ট-হরেরাম কায়দায় বাদলের দুহাত স্বর্গপানে তোলা। দেখা-দেখি আম্মো গৌর-নিতাই। আমাদের চারহাতের বিশটা আঙুলকে কষ্ট করে নাড়াতে হচ্ছে না — আপনা থেকেই থরথর করে কাঁপছে!

আমি সাহেবকে বুঝিয়ে বলতে থাকি, আমরা এঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্র। হস্টেল ছেড়ে বাড়ি যাচ্ছি। নিতান্ত জরুরি প্রয়োজন! উপায় নেই। আমাদের যেতেই হবে।

স্টেনগানটা এক হাতে ধরে লোকটা আমাদের দু পকেটে থাবড়া মারল। না, বোমা বা হ্যান্ডগ্রেনেড নেই। মায় পেনসিল-কাটা ছুরি পর্যন্ত নেই। লোকটা খিঁচিয়ে ওঠে : কী এমন মর্মান্তিক প্রয়োজন?

কী বলব ভেবে পাচ্ছি না। আমার দিদি হয়তো হাসপাতালে, ঠিক জানি না ; বাদলের প্রয়োজনটা কীসের সে সম্বন্ধে কোন ধারণাই নেই। আমাকে আমতা-আমতা করতে

দেখে বাদল আমাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে মহড়া নিল। হঠাৎ বেমক্কা এমন একটা ডায়ালগ ঝাড়ল যা : লা-জবাব!

— ব্রেভ সোলজার! উড য়ু মাইন্ড আনসারিং ওয়ান অফ মাই কোশ্চেন্স নাউ?

...দেড় থেকে দু-সেকেন্ড বিরতি দিয়ে দাখিল করল সেই মর্মান্তিক প্রশ্নটা : হ্যাভ য়ু এভার ল্যভড্ এ লেডি?

লোকটা হাঁ। প্রশ্নটা মোক্ষম এবং আচম্‌কা। ব্যক্তিগত তো বটেই। এবারও দেড়-সেকেন্ড বিরতি দিয়ে কাঁপা-কাঁপা গলায় বাদল ঝাড়ল তার পরের পংক্তিটা। ওর তাৎক্ষণিক স্বরচিত নাটকের পরের ডায়লগ : মাই সুইটি ইজ অন হার ডেথ্‌বেড! ইন আ হসপিটাল!

আশ্চর্য পরিবর্তন হয়ে গেল লোকটার। হাওড়া-ব্রিজের চুড়োর দিকে তাকিয়ে রইল একটা খণ্ডমুহূর্ত। বোধকরি ওর স্মৃতিপটে ফুটে উঠেছে ড্যাফোডিল-পাড়ার কোন সোনাচুল নীলনয়নার ছবি — হাজার হাজার মাইল দূরে ওর ফেলে-আসা নিজের 'সুইটি'।

লোকটা বাদলের পিঠে একটা বাঘের থাবা মেরে সান্ত্বনা দিল। বলল, অত সহজে ভেঙে পড়তে নেই। মা মেরীকে স্মরণ কর। তোমার গার্ল-ফ্রেন্ড নিশ্চয় সেরে উঠবে।

তারপর আমার দিকে ফিরে বললে, য়ু টু মে গো! তবে গলি দিয়ে যেও না। ওখানে চোরাগোপ্তার ভয়। এই ট্রামরাস্তার মাঝবরাবর হাঁটতে থাক। যাও!

বাদলের দু-চোখে — কী আশ্চর্য! কী অপরিসীম আশ্চর্য — টলটল করছে দু-ফোঁটা জল! কেমন করে হল? গ্লিসারিন তো ছিল না আমাদের পকেটে!

দুজনে হাঁটতে হাঁটতে এসে পৌঁছলাম কৃষ্ণদাস পালের পায়ের কাছে। আমি এবার বাঁক নিলাম ডাইনে — বউবাজারমুখো, বাদল বাঁয়ে হেদোর দিকে। গোরা সার্জেন্টকে বোকা বানিয়ে আমরা কিন্তু হাসবার অবকাশ পাইনি। হ্যারিসন রোডের উপর উবুড় হয়ে পড়ে আছে ছুরিকাবিদ্ধ কিছু মৃতদেহ। ফুলে ঢোল হয়ে গেছে। এখনো তাদের সৎকার করা যায়নি। আর দেখেছিলাম একটা মৃত শকুনকে। বেচারি। মায়াবিনী কলকাতায় লোভে পড়ে এসেছিল — বুঝতে পারেনি তার প্রকাণ্ড পাখার বিস্তার এখানে বিপদজনক। দুই কারেন্টবাহী ট্রামলাইনের তারের ছোঁয়ায় সেও প্রাণ দিয়েছে!

বাদল সরকারের অভিনয় বহুবার দেখেছি। কিন্তু সবচেয়ে অভিভূত হয়েছিলাম সেই 18.8.46 তারিখে — হ্যারিসন রোড অঙ্গনমঞ্চে। মুহূর্তমধ্যে কল্পিত নায়িকার মৃত্যু-সম্ভাবনায় কেমন করে জলে ভরে গেল ওর চোখদুটো?

* * *

ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল পাশ করার পরে। বাদল গেল ডি. ভি. সি.। সে ক্রমে টাউন প্ল্যানিং-এ বিশেষজ্ঞ হয়ে ওঠে। পরে চলে যায় আফ্রিকায়। আমি উদ্‌বাস্তু পুনর্বাসনের

পৌঁছলাম হাওড়া ব্রিজে। মিলিটারি কনভয় যাচ্ছে। সাহস হল না পার হতে। 'দেখন্-গুলি'র হুঁশিয়ারি বেতারে প্রচার করা হচ্ছে ঘণ্টায় ঘণ্টায়। একজন মাঝি রাজি হয়ে গেল। চড়া পাড়ানি নিয়ে বাবু-ঘাট তক্ পৌঁছে দেবে। গঙ্গায় দু-একটা নৌকা চলাচল করছে বটে। মিলিটারির তাতে ভ্রূক্ষেপ নেই। ওপারে এসে পৌঁছলাম যখন — তখন দুপুর গড়িয়ে বিকেল। জনমানবহীন ঘাট্‌লা থেকে পায়ে পায়ে উঠে এলাম হ্যারিসন রোডে। আজ্ঞে হ্যাঁ, গান্ধিজী তখনো ভারত-বিভাগ রুখতে আপ্রাণ লড়ে যাচ্ছেন — তিনি জীবিত — ফলে, ওটা হ্যারিসন রোডই।

বাদল বলল, মিলিটারি-টহল শুধু বড় রাস্তায়। কলকাতার এঁদো গলির পাত্তা ওরা জানে না। আয়, গলি-ঘুঁজি দিয়েই পাড়ি মারতে হবে।

আমি বলি, বেশ। তাই চল তাহলে —

স্ট্র্যান্ড রোডের মোড়ে একটা গলিতে সেঁদুতে যাব হঠাৎ পিছন থেকে শোনা গেল ব্যাঘ্রগর্জন : য়ু দেয়ার! হল্‌ট্! অর এল্‌স্....

'অন্যথায় কী হবে' জানি। বেতারে ঘণ্টায়-ঘণ্টায় প্রচারিত হচ্ছে সাবধানবাণী : 'দ্যাখন গুলি'! থিয়েটারের ভাষায় যাকে 'স্টিল্' হয়ে যাওয়া বলে আমরা দুজনেই তাই — ড্রামা-সেক্রেটারি আর সিলেক্‌শান-টেস্ট-এ গাড্ডু-খাওয়া কুশীলব!

— অ্যাবাউট টার্ন।

এ পাশ ফিরে মুখোমুখি হলাম মহাপ্রভুর। হাইল্যান্ডার গোরা। হাতে স্টেন-গান। বাগিয়ে ধরে আছে। জানতে চাইল খাজা ইংরেজি 'উরুশ্চারণে' : শহরে কার্ফু, জান না? কে তোমরা? কোথায় যাচ্ছ? মাথার উপর হাত তোল।

একটা কথা জিজ্ঞেস করি : ইদানীংকালে অঙ্কনমঞ্চ-আয়োজিত বাদল সরকারের নাটকে বাদলকে বেমক্কা কোন গাছের চরিত্র অভিনয় করতে দেখেছেন? হাওয়ায় গাছের পাতা ঝির্‌ঝির করে কাঁপছে? অবিকল সেই ভঙ্গি। হরেকেষ্ট-হরেরাম কায়দায় বাদলের দুহাত স্বর্গপানে তোলা। দেখা-দেখি আম্মো গৌর-নিতাই। আমাদের চারহাতের বিশটা আঙুলকে কষ্ট করে নাড়াতে হচ্ছে না — আপনা থেকেই থরথর করে কাঁপছে!

আমি সাহেবকে বুঝিয়ে বলতে থাকি, আমরা এঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্র। হস্টেল ছেড়ে বাড়ি যাচ্ছি। নিতান্ত জরুরি প্রয়োজন! উপায় নেই। আমাদের যেতেই হবে।

স্টেনগানটা এক হাতে ধরে লোকটা আমাদের দু পকেটে থাবড়া মারল। না, বোমা বা হ্যান্ডগ্রেনেড নেই। মায় পেনসিল-কাটা ছুরি পর্যন্ত নেই। লোকটা খিঁচিয়ে ওঠে : কী এমন মর্মান্তিক প্রয়োজন?

কী বলব ভেবে পাচ্ছি না। আমার দিদি হয়তো হাসপাতালে, ঠিক জানি না ; বাদলের প্রয়োজনটা কীসের সে সম্বন্ধে কোন ধারণাই নেই। আমাকে আমতা-আমতা করতে

দেখে বাদল আমাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে মহড়া নিল। হঠাৎ বেমক্কা এমন একটা ডায়ালগ ঝাড়ল যা : লা-জবাব!

— ব্রেভ সোলজার! উড য়ু মাইন্ড আনসারিং ওয়ান অফ মাই কোশ্চেন্স নাউ?

...দেড় থেকে দু-সেকেন্ড বিরতি দিয়ে দাখিল করল সেই মর্মান্তিক প্রশ্নটা : হ্যাভ য়ু এভার ল্যভড্ এ লেডি?

লোকটা হাঁ। প্রশ্নটা মোক্ষম এবং আচম্‌কা। ব্যক্তিগত তো বটেই। এবারও দেড়-সেকেন্ড বিরতি দিয়ে কাঁপা-কাঁপা গলায় বাদল ঝাড়ল তার পরের পংক্তিটা। ওর তাৎক্ষণিক স্বরচিত নাটকের পরের ডায়লগ : মাই সুইটি ইজ অন হার ডেথ্‌বেড! ইন আ হসপিটাল!

আশ্চর্য পরিবর্তন হয়ে গেল লোকটার। হাওড়া-ব্রিজের চুড়োর দিকে তাকিয়ে রইল একটা খণ্ডমুহূর্ত। বোধকরি ওর স্মৃতিপটে ফুটে উঠেছে ড্যাফোডিল-পাড়ার কোন সোনাচুল নীলনয়নার ছবি — হাজার হাজার মাইল দূরে ওর ফেলে-আসা নিজের 'সুইটি'।

লোকটা বাদলের পিঠে একটা বাঘের থাবা মেরে সান্ত্বনা দিল। বলল, অত সহজে ভেঙে পড়তে নেই। মা মেরীকে স্মরণ কর। তোমার গার্ল-ফ্রেন্ড নিশ্চয় সেরে উঠবে।

তারপর আমার দিকে ফিরে বললে, য়ু টু মে গো! তবে গলি দিয়ে যেও না। ওখানে চোরাগোপ্তার ভয়। এই ট্রামরাস্তার মাঝবরাবর হাঁটতে থাক। যাও!

বাদলের দু-চোখে — কী আশ্চর্য! কী অপরিসীম আশ্চর্য — টলটল করছে দু-ফোঁটা জল! কেমন করে হল? গ্লিসারিন তো ছিল না আমাদের পকেটে!

দুজনে হাঁটতে হাঁটতে এসে পৌঁছলাম কৃষ্ণদাস পালের পায়ের কাছে। আমি এবার বাঁক নিলাম ডাইনে — বউবাজারমুখো, বাদল বাঁয়ে হেদোর দিকে। গোরা সার্জেন্টকে বোকা বানিয়ে আমরা কিন্তু হাসবার অবকাশ পাইনি। হ্যারিসন রোডের উপর উবুড় হয়ে পড়ে আছে ছুরিকাবিদ্ধ কিছু মৃতদেহ। ফুলে ঢোল হয়ে গেছে। এখনো তাদের সৎকার করা যায়নি। আর দেখেছিলাম একটা মৃত শকুনকে। বেচারি। মায়াবিনী কলকাতায় লোভে পড়ে এসেছিল — বুঝতে পারেনি তার প্রকাণ্ড পাখার বিস্তার এখানে বিপদজনক। দুই কারেন্টবাহী ট্রামলাইনের তারের ছোঁয়ায় সেও প্রাণ দিয়েছে!

বাদল সরকারের অভিনয় বহুবার দেখেছি। কিন্তু সবচেয়ে অভিভূত হয়েছিলাম সেই 18.8.46 তারিখে — হ্যারিসন রোড অঙ্গনমঞ্চে। মুহূর্তমধ্যে কল্পিত নায়িকার মৃত্যু-সম্ভাবনায় কেমন করে জলে ভরে গেল ওর চোখদুটো?

* * *

ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল পাশ করার পরে। বাদল গেল ডি. ভি. সি.। সে ক্রমে টাউন প্ল্যানিং-এ বিশেষজ্ঞ হয়ে ওঠে। পরে চলে যায় আফ্রিকায়। আমি উদ্‌বাস্তু পুনর্বাসনের

কাজে প্রথমে পি. এল. ক্যাম্প, পরে কলোনী, শেষে দণ্ডকারণ্যে। দীর্ঘ বিরতির পর আবার দেখা হল ষাটেক দশকের মাঝামাঝি। ওর অভিনয় দেখতে গিয়ে। তখন ও প্রসিনিয়াম স্টেজে স্বরচিত নাটক অভিনয় করে। পর পর অনেকগুলো নাটক দেখলাম।

একদিন বাদল এল আমার অফিসে, নিউ সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিংস্-এ। আমি তখন প্ল্যানিং সার্কলের সুপারিন্টেন্ডিং এঞ্জিনিয়ার। বাদল বললে, কলকাতার উপকণ্ঠে, বারাসাতের দিকে, সে একটা 'নাট্যাশ্রম'-জাতীয় কিছু বানাতে চায়। জমি পাওয়া যাবে। ছোট্ট একটা অভিনয়-মঞ্চ থাকবে — 'মহড়া' নেবার। নাটক প্রদর্শনের জন্য নয়। থাকবে লাইব্রেরী এবং একটি গেস্ট-রুম। দ্বিতলে ওদের স্বামী-স্ত্রীর আবাস।

আমি বলি, তা আমার কাছে কেন রে? তুই নিজেই তো সিভিল এঞ্জিনিয়ার। ও কুণ্ঠিত হয়ে বল্‌লে, আমার বোর্ড-টী, সেট-স্কোয়ার, স্কেল, সব কোথায় হারিয়ে গেছে। এঞ্জিনিয়ারিং ছেড়ে এখন যে শুধু নাটক নিয়েই মেতে আছি।

রাজি হয়ে গেলাম। আমি পারিনি। ও পেরেছে। ও দু-নৌকায় পা রাখেনি। ওর মনোমতো একটি দ্বিতল বাড়ির নকশা ছকে দিলাম। নিয়ে চলে গেল। ব্যস! তারপর আর তার পাত্তা নেই। মানে, বাড়ি করার ব্যাপারে। বেশ কিছুদিন বাদে আর এক নাট্যাঙ্গনে পাকড়াও করলাম ওকে। বলি, কী হল রে? তোর সেই 'নাট্যাশ্রম'-এর?

ম্লান হাসল। বলল, ও হবে না রে! তোকে বৃথাই খাটালাম।

— কেন? অর্থাভাব?

— হ্যাঁ, সেটা তো আছেই। তাছাড়া কী জানিস? আমার মাথায় অন্য চিন্তা এসেছে। প্রসিনিয়াম-থিয়েটারে অভিনয় করব না আর। ওতে দর্শক আর কুশীলবেরা একাত্ম হতে পারে না।

বলি, বুঝেছি। যাত্রার দল খুলবি এবার? যাত্রার এখন খুব রমরমা।

ও ধমক দেয়, ছাই বুঝেছিস! যাত্রা কেন হবে? থিয়েটারই। তবে চারিদিক খোলা মেলা। উইংস নেই, ড্রপসীন নেই —

— সে তো যাত্রাতেও থাকে না।

— কিন্তু যাত্রাতে অভিনয়-মঞ্চ থাকে। দর্শক আর কুশীলব দলের মধ্যে ব্যবধান থাকে। যাত্রায় পোশাক লাগে, মেক-আপ লাগে...

আমি ঠাট্টা করে বলি, মানে? তুই কি এই টি শার্ট আর প্যান্ট পরে বাল্মীকি অথবা শাহজাহানের পার্ট করবি?

ও বললে, না! তা করব না। কারণ উই হ্যাভ হ্যাড এনাফ অফ বাল্মীকি অ্যান্ড শাহজাহাঁ। তবে হ্যাঁ, এই পোশাকেই আমি 'স্পার্টাকুস' সাজব। গাছ-পাহাড়-মেঘ-নদীর পার্ট করব। তোরা যেটাকে অডিটোরিয়াম বলিস তার ভিতরে ঢুকে গিয়ে অভিনয় করে

আসব। দর্শকদলও যোগ দেবে তাতে!

বিরক্ত হয়ে বলি, তোর পাগলামির একটা সীমা থাকবে তো বাদ্‌লা?

দৃঢ়স্বরে মাথা ঝাঁকিয়ে ও বলেছিল, না! থাকবে না! কারণ তা থাকলে চার্লি চ্যাপলিন সবাক-যুগে নির্বাক ছবি তৈরি করতেন না ; ওয়াল্টট ডিজনে তুলির ডগায় সিনেমা বানাতেন না। নারান, পিনোক্কিও ছবির সেই গানটা তোর মনে আছে?

"When you wish upon a star,
Makes no difference who you are !
Anything your heart desires
Will come to you — "

[তারার কাছে চাইবি যখন,
চাইবি রে তোর প্রাণ খুলে,
'তুই কে?' — সেটা তুচ্ছ তখন,
যাস্‌নে যেন গান ভুলে।
তারার পানে হাত পেতেছে যে, সে
পৌঁছে গেছে 'সব-পেয়েছি'র দেশে।।]

আমি একটা 'ফলিং স্টারের' কাছে এই 'উইশ' রেখেছি! বিনা মেক আপে, বিনা সাজ-পোশাকে, আমি যেন দর্শকের হৃদয় জয় করতে পারি। ওদের হৃদয় যেন আমার অন্তরের মৃদঙ্গের তালে 'রেসনেন্স' জাগায়। দর্শক ও কুশীলব যেন একত্রে সেই আনন্দতীর্থে উপনীত হয়। সেই উপনিষদের মন্ত্রটা রে নারান : ওঁ সহ নাববতু, সহ নৌ ভুনক্তু, সহ বীর্যং করবাবহৈ!

কিছুই না বুঝে পাগলটার হাত থেকে অব্যাহতি পেতে আমি বলি, বুঝেছি, বুঝেছি! এ তো সোজা কথা! মানে ইয়ে ...ঐ কী যেন উপনিষদের মন্ত্রটা!

* * *

জর্জ অরওয়েল-এর 'অ্যানিমাল ফার্ম' — যার পেনাম্রাবলম্বনে এই নাটকটি রচিত — তা আমাকে সরবরাহ করেছিল বাদলই। বলেছিল, পড়ে দ্যাখ, ভাল নাটক হবার উপাদান আছে।

সেটা উনিশ শ চুয়াত্তর। আমি তখন 'বিশ্বাসঘাতক' লিখছি। আমার মাথায় তখন অ্যাটম বোমা। বলি, নাটক-ফাটক তো তুই লিখিস, আমায় কেন?

ও হেসে বলে, না 'ফাটক'-এর ভয় আর নেই। দেশটা স্বাধীন হয়ে গেছে। কিন্তু নাটকই যে লিখতে হবে এমন কোন পূর্বশর্ত নেই। গল্পই লেখ না।

আমি স্বভাবতই পল্লবগ্রাহী। 'বিশ্বাসঘাতক' শেষ হতেই পড়ে দেখলাম 'অ্যানিমাল ফার্ম'। বিষয়বস্তু অভিনব। বক্তব্যও জোরালো। আমি কিন্তু তত্ত্বগতভাবে অরওয়েল-এর

সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত হতে পারলাম না। আমার মনে হল, একটা বিশেষ 'ইজম্'কে হেয় প্রতিপন্ন করতে এটি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে লেখা। মূল বক্তব্য যেটা, সেটা পণ্ডিত জওয়াহরলাল নেহেরুও বলেছেন তাঁর 'ডিস্‌কভারি অব ইন্ডিয়াতে' — অর্থাৎ সাচ্চা বিপ্লবীও ক্ষমতালাভ করার পরে বদলে যায়, প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে। একই কথা বলেছেন ইতিহাসবিদ লর্ড অ্যাকটন : "Power tends to corrupt, but absolute power corrupts absolutely." [ক্ষমতা মনুষ্যচরিত্রকে কলুষিত করার চেষ্টা করে কিন্তু বাধাহীন সর্বময় ক্ষমতা চূড়ান্তভাবে কলুষিত করে।]

পড়লাম অরওয়েলের : 1984 ; এবারও একমত হতে পারলাম না। অথচ 'অ্যানিমাল ফার্ম' আমাকে ক্রমাগত খোঁচাতে থাকে— যাকে বলে 'হন্ট' করা। উপন্যাস নয়, 'হিন্দের বন্দী' করে লিখে ফেললাম একটা নাটক। নাম দিলাম "এক-দুই-তিন...!"

প্রায় ঐ সময়েই — চুয়াত্তর সালের শেষাশেষি — মুক্ত অঙ্গনের শৌভনিক গোষ্ঠীর এক কর্মকর্তা আমার কাছে একটি নাটক চাইলেন। আমি একদিন ওঁদের মুক্ত অঙ্গনে গিয়ে নাটকটা পড়ে শোনালাম। এককথায় ওঁরা রাজি হয়ে গেলেন। মাসকতক মহড়া দিয়ে নাটক মঞ্চস্থ করা হল। দালালেশ্বরের চরিত্রে অনবদ্য অভিনয় করেছিলেন নিমু ভৌমিক! কয়েক মাসের মধ্যেই নাটকটি জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। প্রতি সন্ধ্যায়ই 'হাউসফুল' চলতে থাকে।

তারপর একদিন। সেটা পঁচাত্তরের জুন মাসের মাঝামাঝি। এলাহাবাদের একটি রায়ে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী মহোদয়ার নির্বাচন অবৈধ বলে ঘোষণা করা হল। ইন্দিরা গেলেন সুপ্রীম কোর্টে। জিতলেন। কিন্তু সারা ভারতে তাঁর ভাবমূর্তিতে একটা কালির ছোপ লাগল। ঐ যাকে বলে, 'গলি গলিমে শোর হ্যয়...'

ঐ সময়ে টালিগঞ্জ থানা থেকে ও. সি. এসে মুক্ত অঙ্গনে 'এক-দুই-তিন...' নাটকটা দেখলেন। কর্মকর্তারা আপ্যায়নের ত্রুটি রাখেননি। চা-সিগ্রেট আর মুক্ত অঙ্গনের ডবল ডিমের হাফ-ডেভিল, মানে বিখ্যাত 'হাফ-ডিমের ডবল ডেভিল'। ভবি ভোলার পাত্র নয়। পান চিবুতে চিবুতে যাবার সময় তিনি শৌভনিক কর্মকর্তাকে বলে গেলেন, এ নাটকটা বন্ধ করে দিন। না হলে ঝামেলা হবে! বুয়েছেন?

শৌভনিকের সেই বড়কর্তা তর্কাতর্কি করেননি। আমাকে টেলিফোনে দুঃসংবাদটা জানালেন। পরদিনই আমি তড়িঘড়ি গিয়ে দেখা করলাম সেই পুলিশ-সাহেবের সাথে, টালিগঞ্জ থানায়। আমি যুক্তিতর্ক দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করলাম যে, এ-নাটকটা ইন্দিরা-গান্ধী সরকারের বিরুদ্ধে কোনও বক্তব্য রাখেনি। থানা অফিসার বললেন, তাহলে আপনি কাকে বলেছেন 'শুয়ারকা-বাচ্ছা যুগযুগ জিও!'?

আমি বোঝাতে চাই যে, আমি ও-কথা মোটেই বলিনি। বলেছে নাটকের কিছু চরিত্র।

আসলে মূল বইটা জর্জ অরওয়েলের লেখা। আমি আইডিয়াটা নিয়েছি মাত্র। তিনি এ নাটক লিখেছিলেন রাশিয়ার কম্যুনিজমকে ব্যঙ্গ করে। ইন্দিরাজী কম্যুনিস্ট নন আদৌ। ইন্দিরাজীর পরমপূজ্য পিতৃদেব অবশ্য প্রাকস্বাধীনতা যুগে একবার লিখেছিলেন, "আমি বিশ্বাস করি, পৃথিবীর সামনে আজ দুটিমাত্র পথ খোলা আছে — হয় ফ্যাসিজম, নয় কম্যুনিজম্। আমি কম্যুনিজম-এর পক্ষে। আমাকে নির্বাচনের ভার দিলে আমি তাকেই বরণ করে নেব। ফ্যাসিজম্ ও কম্যুনিজম ছাড়া দুনিয়ার সামনে আজ আর কোন পথ নেই — একটিকে মেনে নিতে হবেই।" — কিন্তু দেখুন, ওটা নেহেরুজীর কথার কথা। নির্বাচনের ভার যখন পেলেন তখন তিনি তো কম্যুনিজমকে বেছে নেননি। তাঁর কন্যাও নেননি...

দারোগা বললেন, আপনি তো অদ্ভুত দুঃসাহসী মানুষ, মশাই। থানায় এসে উপযাচক হয়ে বলছেন যে, ম্যাডাম ফ্যাসিস্ট!

আমি প্রতিবাদ করি, না, না। তা বলব কেন?

— বলেননি? আপনিই বলছেন, দুনিয়ার সামনে দুটো মাত্র পথ খোলা আছে — ফ্যাসিজম আর কম্যুনিজম। ম্যাডাম যদি কম্যুনিজম-এর পক্ষে না হন তবে আপনার মতে তিনি ফ্যাসিস্ট!

আমি আমতা-আমতা করি, কী আশ্চর্য! না, মানে, আমি সে-কথা বলিনি। ও-কথা তো বলেছিলেন জওয়াহরলালজী!

—আবার 'বাপ তুলছেন'! আচ্ছা আসুন এবার, আমার অন্য কাজ আছে।

আমার আর কিছু করণীয় ছিল না। কারণ নন-কম্যুনিস্ট এবং নন-ফ্যাসিস্ট ম্যাডাম কিছুদিনের মধ্যেই এমার্জেন্সি ঘোষণা করলেন (26 জুন 1975)। জয়প্রকাশজী জেল খাটতে গেলেন। আমার নাটক বন্ধ রইল।

দীর্ঘদিন পরে 'নবকল্লোল' পত্রিকার দুঃসাহসী সম্পাদক প্রবীরবাবু আমার কাছে পূজা-সংখ্যার জন্য এই নাটকটা চেয়ে নিয়ে ছেপেছিলেন। বন্ধুবর চণ্ডী লাহিড়ীর আঁকা কার্টুনসমেত।

নামকরণ সম্বন্ধে কিছু কৈফিয়ৎ দেবার আছে। আমার এই শততম গ্রন্থের প্রকাশক সুধাংশু দে নামটা শুনে আপত্তি দাখিল করেছিল : 'ঐ একই নামে একটি জনপ্রিয় বই বাজারে আছে, দাদা।'

আমি বলি, না নেই। আমার বইয়ের নাম 'এক-দুই-তিন' নয়, বইটার নাম, 'এক.দুই..তিন্ ডট্-ডট্-ডট্!' ঐ তিনটি ফুটকির মধ্যেই আমার মূল বক্তব্য বিধৃত! ঐ তিনটি ফুট্‌কি-চিহ্নেই মূল লেখকের সঙ্গে এ নাট্যকারের পার্থক্য। ঐখানেই এ-গ্রন্থের আশা-ভরসা সব কিছু।

আমি যেমন কিছুই না বুঝে বাদলকে বলেছিলাম, বুঝেছি, বুঝেছি। এ তো উপনিষদের সোজা কথা। লেখকের ব্যাখ্যায় বিব্রত সদাব্যস্ত সুধাংশুও বোধহয় তেমনি কিছু না বুঝেই বলল, বুঝেছি! মানে...ইয়ে, ঐ ডট্-ডট্-ডট্! এ তো সোজা কথা!

* * *

বাল্যকালে একটা বই পড়েছিলাম — মিনু মাসানির লেখা, 'আওয়ার ইন্ডিয়া'। লেখক দেখিয়েছিলেন, ভারতবর্ষে সব কিছু আছে, অথচ কিছুই নেই। ভারতের খনিজ সম্পদ, বনাঞ্চল, কৃষিক্ষেত্রের উর্বরতা, বৃষ্টিপাত, সব কিছুই আশাব্যঞ্জক — তবু এদেশের মানুষের প্রচণ্ড অভাব! খাদ্য, বস্ত্র, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, শিল্প-বাণিজ্য প্রতিটি ক্ষেত্রে। লেখক বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে, প্রতিটি সমস্যা এসে একই সূচীমুখে মিলিত হচ্ছে : দেশটা পরাধীন!

আজকে আমাদের নাতি-নাতনিরা দেখছে, দেশটা যদিও স্বাধীন, কিন্তু সমস্যাগুলি ইতিমধ্যে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে। সে-যুগে পুলিশ বিপ্লবীদের যেমন ধরত, তেমনি ধরতে পারত চোর-ডাকাত-গুণ্ডাদের। এখন পুলিশ তা পারে না। বা পারলেও করে না। তখন গুণ্ডার দল রাত্রে লুকিয়ে হানা দিত, এখন প্রকাশ্যে তারা যা নয় তাই করছে। মুখ্যমন্ত্রী ধৃতরাষ্ট্র, তাঁর পুলিশ বৃহন্নলা।

বছরদুয়েক আগে লিখেছিলাম 'এমনটা তো হয়েই থাকে'। তার কৈফিয়তে প্রসঙ্গত লিখেছিলাম :

> "এমন দুর্দিনে অত্যাচারিত সাধারণ মানুষ তাকিয়ে থাকে একদল ভাগ্যবানের দিকে — যাঁরা ঈশ্বরের করুণায় দশের মধ্যে দশম : প্রতিভাবান।
>
> "তাঁরা শিল্পী, সাহিত্যিক, কবি, নাট্যকার, প্রবন্ধকার, সাংবাদিক।
>
> "নীল বাঁদরের অত্যাচার দেখে একদিন রুখে দাঁড়িয়েছিলেন দীনবন্ধু, মাইকেল, ফাদার লঙ, হরিশ মুখুজ্জে। অথচ আজ? লালবাঁদর-সবুজবাঁদর-গেরুয়াবাঁদরদের অত্যাচার দেখে এগিয়ে আসছেন না কোন শিল্পী-সাহিত্যিক। তাঁরা দ্বিধাবিভক্ত! হয় দক্ষিণপন্থী, নয় বামপন্থী! কেউ নয় : সত্য-শিব-সুন্দরপন্থী।"

কৈফিয়তের শেষাশেষি আমি আরও বলেছিলাম : "ওটা কখনোই শেষ কথা হতে পারে না — 'এন্তাই তো হোন্তাই রহ্‌তা' ; অর্থাৎ 'এমনটা তো হয়েই থাকে!'

> "শেষ কথা : না! এমনটা হবার কথা নয়! এমনটা আমরা হতে দেব না।
>
> "পারেন তো সে কথাই বলুন। জোর গলায়। রাস্তায় নেমে এসে। বলান এই অধম বৃদ্ধকে দিয়ে। তাহলে এই উনসত্তর বছর বয়সে এ-বৃদ্ধ মহব্বতের কিস্‌সা লেখার ধাষ্টামোকে ছেড়ে পথে নেমে আসবে। যেমন এসেছিলেন 'গরম হাওয়া'

ছায়াছবির শেষদৃশ্যে প্রফেসর বলরাজ সাহানী।

"কিন্তু একটা শর্ত আছে!

"আপনাদের মিছিল দক্ষিণপন্থী, বামপন্থী অর্থাৎ কায়েমী স্বার্থপন্থী হলে চলবে না। আপনাদের হাতে তখনই হাত মেলাব যখন আপনারা হবেন সত্য-শিব-সুন্দরপন্থী! যতদিন আপনারা সে ব্যবস্থা করতে না পারছেন ততদিন ক্যাডারপুত্রস্নেহে অন্ধ-ধৃতরাষ্ট্রের এই নৈরাজ্যে 'একঘরে বিকর্ণে'র ছোট্ট ভূমিকাতেই আমাকে অভিনয় করতে দিন না।

"তামাম ন-শুধ্।"

দু-বছর পরে এই শততম-গ্রন্থের কৈফিয়ৎ লিখতে বসে মনে হচ্ছে — আমি বোধহয় সেবার ঠিক কথা লিখিনি। না, ভুলও নয়। তবে ওতে উচ্ছ্বাস এবং অভিমান মিশ্রিত হয়েছিল। শিল্পীকে হতে হবে গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত স্থিতপ্রজ্ঞের মতো : দুঃখে সে অনুদ্‌বিগ্নমন, সুখে সে বিগতস্পৃহ। তার সাধনা Emotion recollected in tranquillity. তার প্রতিজ্ঞা — কোনমতেই সে যোগভ্রষ্ট হবে না। উভয় অর্থেই যোগ। আত্মনেপদী অন্তর্লীন সাধনায় অনুভূতির যোগ, এবং পরস্মৈপদীতে পাঠক-পাঠিকার সঙ্গে মানসপংক্তিভোজনে আন্তরিক যোগসেতু। ব্যক্তিগতভাবে অভিমান করার অধিকার তো তার নেই। সে কোন্ অধিকারে বলবে, "তোমাদের মিছিল সত্য-শিব-সুন্দর অভিমুখী হলে তবেই আমি হাত মেলাব!" ওরাই যে উল্‌টে বলবে — পথ দেখাবার দায়িত্বটা কার? যে স্বেচ্ছায় কলমটা তুলে নিয়েছে সেই একের, না যে বইটা পড়তে তুলে নিয়েছে হাতে সেই লাখের? এই সর্বব্যাপী অবক্ষয়ের তমিস্রায় কোন্ পথে আমরা যাব তা বলার দায়িত্ব তো তোমার, লেখক!

নতমস্তকে আমাকে তা মানতে হবে। কলমটা হাতে তুলে নেবার ধৃষ্টতা আমিই দেখিয়েছি বটে!

এই দু-আড়াই বছরে আরও একটা সত্য অনুভব করেছি — সে কথাই বলি। আমি বুঝতে পেরেছি যে, আমি একা নই, আমি অন্তেবাসী নই! আমার বেদনার সমব্যথীরা তো আমার চতুর্দিকে! শারীরিক অক্ষমতায় আগের মতো গ্রাম-বাঙলায় ঘুরে ঘুরে নিজে চোখে সব কিছু আর দেখতে পারি না। কিন্তু ওদের কণ্ঠস্বর তো শুনতে পাই! কলকাতার বইমেলায় লিট্‌ল ম্যাগাজিন স্টলে ঘুরে বুঝেছি — আমার মতো একই যন্ত্রণায় ভুগছে অনেক অনেক কবি-সাহিত্যিক-কথাশিল্পী-সম্পাদক! তাদের কথা পরে বিস্তারিত আলোচনা করতে হবে — কারণ সাহিত্যের শুচিতা, তার আদর্শ তো একমাত্র তারাই আজ ধরে রেখেছে! বিজ্ঞাপনের আশায়, সরকারী দাক্ষিণ্যের আশায়, তাঁরা সত্যভ্রষ্ট হয়নি! তথাকথিত প্রতিষ্ঠিত বাজারি দৈনিক, পাক্ষিক, মাসিকে এই কবি-সাহিত্যিকেরা

অপাংক্তেয়, ব্রাত্য। তবু এরা বিবেক বিকিয়ে দেয়নি। বিক্রি কম বলে ওরা বিজ্ঞাপন পায় না, এবং বিজ্ঞাপন পায় না বলেই বিক্রি কম! ক্রেতা-পাঠক যে চটুল-কাহিনীতে শুধু সানন্দ হতে চায়।

সরকার নিয়ন্ত্রিত দূরদর্শন এবং বণিকপ্রসাদপুষ্ট সংবাদপত্রও তাই চায়।

লিট্‌ল ম্যাগাজিনের কথা পরে বিস্তারিত আলোচনা করতে হবে ; কিন্তু তাছাড়াও আছেন কিছু প্রতিষ্ঠিত কবি-সাহিত্যিক — সংখ্যায় হয়তো অল্প — যাঁরা বিবেক বিকিয়ে দেননি। প্রতিষ্ঠিত পত্রিকায় তাঁরা অনুপস্থিত, রবিবারের তথাকথিত 'বেস্ট-সেলার লিস্টে'ও বিশেষ কারণে অনুল্লেখিত। তা হোক, পাঠকমহলে তাঁরা সমাদৃত, বইপাড়ার প্রকাশকেরা তাঁদের সাদরে কাছে টেনে নেন। তাঁরা সবাই জনপ্রিয়!

মহাশ্বেতা নিরবচ্ছিন্ন ধারায় উপহার দিয়ে যাচ্ছেন একটি প্রাগার্য-সভ্যতার সংবাদ। যাদের কথা এই কলকাতা শহরে বসে কিছুতেই জানতে পারতাম না। সেই বাবা তিলকামাঝি মুর্মু অথবা সিদ্‌হোর শেষ 'বংশীধর'দের হাসি-অশ্রুর কথা।

দীর্ঘ কারাযন্ত্রণা ভোগ করেও অপরিবর্তিত আজিজুল হক মেরুদণ্ড সোজা রেখেই লিখছেন *মনু মহম্মদ হিটলার!* মৌলবাদীদের মুখোস টেনে ছিঁড়ে ফেলে দিলেন তিনি।

এই দশকে প্রকাশিত হয়েছে আর একটি অসামান্য উপন্যাস : *বকুল*। লাল-অতিলাল-নাতিলাল-নীল পার্টির মুখোস যেভাবে টেনে ছিঁড়ে ফেলেছেন নজরুল ইসলাম, তাতে তাঁর উদ্দেশ্যে প্রতিটি পাঠক মাথার টুপি খুল্‌বে। হয়ত এই বইটির জন্য পাঠক-পাঠিকার হার্দ্য অভিনন্দন ছাড়া লেখক আর কোন পুরস্কার পাবেন না। তা তিনিও জানেন, আমরাও জানি। কারণ পুরস্কার তো দেবে লাল-নীল পার্টি অথবা বণিকসভা! তাদের নাকেই তো লেখক ঝামা ঘষে দিয়েছেন!

প্রফুল্ল রায় লিখছেন বিহারের প্রত্যন্ত গ্রামের সুখদুঃখের কথা। যদিও হালফিলের বিহার নয়!

কিন্তু সমাজের আর্থসামাজিক অস্তিত্ব — কী পশ্চিমবাঙলার, কী ভারতের — আজ যে নিশ্চিত মহামৃত্যুর পথে চলেছে, তা থেকে মুক্তির উপায় কেউ দেখাতে পারছেন না। ক্ষোভে এই সংখ্যালঘু সাহিত্যিকের দল ফেটে পড়ছেন; কিন্তু নতুন করে '*ভবানী মন্দির*' আর রচিত হচ্ছে না! আমরা সবাই যেন দিশেহারা! নজরুল ইসলামের নায়ক — নির্ভীক পুলিশ অফিসার বকুল বিশ্বাস — শেষ দৃশ্যে বৈকুণ্ঠপুর ছেড়ে চলে যাচ্ছে মাথা সোজা রেখেই; কিন্তু তার সাধের বৈকুণ্ঠপুরকে সে সমর্পণ করে যেতে বাধ্য হল ঐ কালোবাজারী ধনকুবেরদের কাছে 'রক্ষিতা' করে। যে ধনকুবেরের দল লাল পার্টির আপাদমস্তককে কিনে রেখেছে — এমনকি, উপন্যাস অনুসারে, কলকাতা হাইকোর্টের জনৈক বিচারপতিকেও!

নজরুল ইসলামের *বকুল* আমাকে মুগ্ধ করেছে! কিন্তু তিনিও সমাধান পথের কোনও ইঙ্গিত দিতে পারেননি। বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করলাম, তাঁর উপন্যাসের শেষ পংক্তিটি আমার পঁচিশ বছর আগে-লেখা *পাষণ্ড পণ্ডিত*-এর শেষ পংক্তির সঙ্গে হুবহু মিলে গেছে

"পুব আকাশে তখন সূর্য উঠছে!"

নিষ্প্রভাত অমারাত্রি হতে পারে না এ কথা বলেই কি দায়িত্ব থেকে খালাস পাবেন *বকুল* অথবা *পাষণ্ড পণ্ডিত*-এর লেখক?

* * *

বুদ্ধদেব গুহ তাঁর *ঋভু* দ্বিতীয় পর্বের প্রথম অধ্যায়েই সক্ষোভে লিখলেন :

> পাঠক! দিনান্তে কি একবারও ভাবেন? একজনও কি ভাবেন? আপনারা নিজেদের, নিজেদের আগত ও অনাগত সন্তানদের কোন্ রৌরবে নিক্ষেপ করছেন? এবং করে যাচ্ছেন?
>
> গণতন্ত্রে বাস করেও কি আপনি মনে করেন না যে, কিছুমাত্র করণীয় ছিল আপনার?
>
> এই দেশ রাজীব গান্ধীর বা অর্জুন সিং-এর, বা লালকৃষ্ণ আদবানির, শৈলেন দাশগুপ্তের বা সোমেন মিত্রের অথবা জ্যোতিবাবুর যতটুকু আপনারও ঠিক ততটুকুই। একটুও বেশি নয় বা কমও নয়। সোনিয়া গান্ধী অথবা প্রিয়াঙ্কা গান্ধীরাই কি অনাদিকাল চোর বা চাকর মনোবৃত্তির আমাদের মালিক বা মালকিন বনে থাকবেন?
>
> চিরটা কাল? ভেবে দেখবেন, পাঠক!

ধরা যাক, পাঠক এবং পাঠিকা দুজনেই ভেবে দেখলেন। লেখকের সঙ্গে একমত হলেন। তারপর? গণতন্ত্রের বাহক হিসাবে কী তাঁদের করণীয়? ভোট দেওয়া ছাড়া? জলের কুমির এবং ডাঙার বাঘের মধ্যে পাঁচ বছর অন্তর একবার বেছে নেওয়া ছাড়া? প্রধানমন্ত্রী থেকে পাড়ার বিধায়ক-'মদতিত' মস্তান পর্যন্ত সবাই ভারতবর্ষের আর্থসামাজিক ব্যবস্থাকে যে রূপ দিয়ে রেখেছেন পাঠক-পাঠিকা তার পরিবর্তন করবেন কেমন করে? ভেবে দেখার পর? বুদ্ধদেব গুহ বলছেন :

> যাঁদের আপনারা বিধানসভাতে বা লোকসভাতে ভোট দিয়ে পাঠান তাঁরা প্রত্যেকেই আপনার সেবক।...নিজেদের অভিযোগ ও অসুবিধার কথা সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে জানান।...নেতাদের দায়িত্ববান করে তুলুন!

এটা কেমন কথা হল, লেখক? আপনি ক্ষুব্ধ, প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ, মানছি! কিন্তু ভেবে দেখুন, স্যার, আমরা কি প্রতিনিয়ত ঐ সাংসদ ও বিধায়কদের কাছে আবেদন করছি না? ধর্না দিচ্ছি না? তাঁদের মদৎপুষ্ট মস্তানদের হাত থেকে কিঞ্চিৎ রেহাই পেতে? কিন্তু ওঁরা

তো জ্ঞানপাপী। জেগে ঘুমোচ্ছেন। কী প্রক্রিয়ায় ওঁদের দায়িত্ববান করে তুলব?

লেখক এর পর বললেন, 'আপনি যা চাইবেন, তাই হবে।'

হবে? হচ্ছে? পশ্চিম বাঙলায়? বিহারে? আমরা 'ফলিং স্টারের' কাছে 'উইশ' করেছি বলেই!

পুনরায় ক্ষুব্ধ হয়ে বললেন, 'এমন করে বাঁচার চেয়ে মরাও ভাল।'

'মরা-বাঁচার' প্রসঙ্গে এখনি আসব। তার পূর্বে বলি, লেখক ঐ পরিচ্ছেদের শেষাশেষি লিখলেন :

> পাঠক! সব শিক্ষারই তো শেষ গন্তব্য এখন অর্থোপার্জন! আসুন, পড়াশুনা এবং অন্য নেশা ছেড়ে কোনও রাজনৈতিক দলে নাম লেখাই। আমরা তো আর প্রমোদ দাশগুপ্ত বা মমতা ব্যানার্জি বা বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের মতো মূর্খ নই! আখের কিছুটা গুছিয়ে নিই।"

না! শ্রদ্ধেয় লেখক! আমরা আপনার সঙ্গে একমত নই! সমাজের মাথায় একদল অসাধু ব্যক্তি চড়ে বসেছে বলেই মেনে নিতে পারছি না যে, গোটা দেশটা অসাধু, মেনে নিতে পারছি না যে, আমাদের সব প্রচেষ্টার শেষ গন্তব্য অর্থোপার্জন! অর্ধশিক্ষিত ট্যাক্সিচালক আজও ঠিকানা খুঁজে খুঁজে সঠিক ব্যক্তিকে তার হারানো সুটকেস ফেরত দিয়ে যায়। বাজারে সবজিওয়ালা বলে, "বাবু, আপ্‌নের গুণ্‌তিতে ভুল হৈছে — এড্ডা নুট বেশি দিয়া ফ্যাললেন। ন্যান, ধরেন।" এঞ্জিনিয়ার বিজন বোস যখন সশস্ত্র মস্‌তানদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন — খালি হাতে — তখন তাঁর প্রেরণা কী ছিল? অর্থোপার্জন? '*দহন*' উপন্যাস লেখিকা সুচিত্রা ভট্টাচার্য ঘটনা সংস্থাপন করেছেন কল্পনায়; কিন্তু তার মূল প্রেরণা একটি সত্য ঘটনা।

শেষ যুক্তি : বলিষ্ঠ জনপ্রিয় লেখক বুদ্ধদেব গুহ *ঋভু* লিখেছেন কি অর্থোপার্জনের জন্য? লেখার সময়টা চেম্বারে বসে থাকলে শুধু পরামর্শ দিয়েই তাঁর উপার্জন দ্বিগুণ হত। মূল প্রেরণা : "দু-একটি কাঁটা করি দিব দূর, তার পরে ছুটি নিব।" তাই তিনি প্র্যাকটিস কমিয়ে *ঋভু* লেখেন!

স্বীকার্য, তীব্র অভিমানে লেখক এখানে সিনিক হয়ে গেছেন। প্রতিদিন সংবাদপত্রে যা পড়ি তাতে সাধারণ মানুষ মনমেজাজ ঠিক রাখতে পারে না। কিন্তু কবি, সাহিত্যিক, মননশীল লেখককে যে যোগভ্রষ্ট হতে নেই! অন্নদাশঙ্করের ভাষায় "তাকে গর্ভিণী নারীর মতো সযত্নে গর্ভরক্ষা করতে হয়।" কারণ আলোকবর্তিকা তুলে ধরার দায়িত্বটা যে তাঁরই স্কন্ধে। উত্তেজিত, অভিমানক্ষুব্ধ পাঠক-পাঠিকা যখন 'সিনিক' হয়ে ওঠে, অন্ধকারে পথ হারিয়ে মদ ধরে, ড্রাগ-অ্যাডিক্ট হয়ে পড়ে, অথবা যখন বিবেককে বিকিয়ে দিয়ে রাজনৈতিক দাদাদের ছত্রছায়ায় আখের গুছিয়ে নিতে বসে, তখন কবিই তো তাকে

পথ দেখাবেন, সাহিত্যিকই তো তার শুভবুদ্ধিকে জাগ্রত করবেন!

ফলে, শ্লেষ নয়। সেন্টিমেন্ট নয়। আসুন, আমরা বিচার-বিবেচনা করে দেখি : স্বাধীনতা লাভের অর্ধশতাব্দী অতিক্রান্ত হবার পরেও কেন আমরা 'পরাধীন!' কে আমাদের শত্রু? আর কে হতে পারে আমাদের সম্ভাব্য মিত্র।

হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন বুদ্ধদেব গুহ— এ দেশ যতখানি জ্যোতিবাবুর ততখানি আপনার-আমার। এবং ঐ যে কথাটার আলোচনা মুলতুবি আছে ; 'এভাবে বেঁচে থেকে কী লাভ?'

কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে আপনি-আমি প্রাণ দিলেই কি দেশের হালটা বদলাবে? একক প্রতিবাদ তো অসংখ্যবার হয়েছে। আজও হচ্ছে! ভেবে দেখুন : নাট্যকার সফদার হাশ্‌মির কথাটা। জন্মসূত্রে মুসলমান, কর্মসূত্রে সাচ্চা সাম্যবাদী। জ্যোতিবাবুর মতো 'সফল' ব্যারিস্টার নয়, 'হ্যাভ-নট' দলের প্রতিনিধি! বিস্কুটের কারখানা দূর অস্ত্‌ একটা বিস্কুটও ছেলের হাতে তুলে দেবার ক্ষমতা তার নেই। নাট্যকার। নাট্যশিল্পী। বলতে পারেন, মুজফ্‌ফর আহ্‌মেদের মতো, কাজী নজরুলের মতো, চারু মজুমদার বা সুশীতল রায়চৌধুরীর মতো মধ্যবিত্তের সাম্যবাদী। দিল্লীর পথে-পথে নাটক করে ফিরত প্রাণচঞ্চল যুবকটি। নাটকের মাধ্যমে প্রতিবাদ ছিল তার ধর্ম। গুণ্ডারাজের কর্মকর্তারা লোভ দেখালো তাকে, পোষ মানাতে চাইল : জরু-গরু, নোকরি-বকরি-ছুকরি সবই মিলবে — যদি ঐ পথনাটক করা ছেড়ে পার্টিতে নাম লেখায়। রাজি হল না আদর্শবাদী লোকটা! ফলে কী হল ? একদিন নীলপার্টির পোষা গুণ্ডার দল ট্রাকে চেপে এসে মেশিনগান চালালো। রক্তে ভেসে গেল দিল্লির রাজপথ। সারা ভারতে একজনমাত্র শিল্পী প্রতিবাদ জানাল টেলিভিশানের পর্দায়। নিতান্ত আচমকা! কারণ শাবানা আজমি জানতেন যে, কোন রাজনৈতিক নেতা বা ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টের করুণায় তিনি ভারতবিখ্যাতা হননি, হয়েছেন নিজের প্রতিভায়।

কিন্তু সফদার হাশ্‌মির কী হল? কব্বর! গড়ে উঠল একটা স্মারক সমিতির ট্রাস্ট। ট্রাস্ট দিল্লি শহরে পথনাটক করা বন্ধ করে দিলেন। অর্থাৎ 'হাশ্‌মি মেমোরিয়াল ট্রাস্ট' এই সিদ্ধান্তটা নেবার মুহূর্তেই সফ্‌দার হাশ্‌মির জীবনাদর্শের শেষ যবনিকা পড়ল — তাঁর শেষবারের মতো মৃত্যু হল! না, ভুল হল। এটা পেনালটিমেট মৃত্যু। শেষ মৃত্যুটা রাজনীতির হাতে। বলছি সে কথা! ট্রাস্ট শুরু করলেন একটি ভ্রাম্যমাণ হাশ্‌মি প্রদর্শনী। মোবাইল ভ্যানটার দামই তো কয়েক লক্ষ টাকা! কে অর্থ জোগালো? এ প্রশ্নটি লা-জবাব! সংবাদপত্রে দেখলাম, আহমেদাবাদ না বরোদা, কোথায় যেন একদল দর্শক এসে প্রদর্শনীতে হাম্‌লা করেছে! বড় বড় পোস্টার ছিঁড়ে ফেলেছে! কেন? সফ্‌দার হাশমি তো নিরন্ন জনগণের কোন পাকা ধানের ক্ষেত্রে কখনো মই দেয়নি! তাহলে এই

অহৈতুকী আক্রমণের হেতু কী? সংবাদে প্রকাশ : একটি পোস্টারে রাম-সীতাকে নাকি ভাইবোন হিসাবে দেখানো হয়েছে। তাতেই 'হেঁদু' দর্শকেরা ক্ষুব্ধ — ঐ 'মোছলমানের' প্রদর্শনী শুরু হতে দেবে না!

কী আশ্চর্য! কী অপরিসীম আশ্চর্য! কোন সাংবাদিক জানতে চাইলেন না, কোন সংবাদপত্রে ব্যাখ্যা দেওয়া হল না : কেন ঐ পোস্টার? জাভা না বরবুদুর কোথাকার এক লোক-সংস্কৃতিতে ভারতবর্ষের রাম-সীতা নাকি ভাই-বোনে বিবর্তিত হয়েছেন বলে জানিয়েছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ, তাঁর *জাভা-যাত্রীর পত্র* গ্রন্থে। তাঁর সে মন্তব্য নিয়ে, কই, কোন বিক্ষোভ তো হয়নি! একই কথা লিখেছিলেন জাতীয় অধ্যাপক আচার্য সুনীতিকুমার! সেটা ছিল একটা সাংস্কৃতিক গবেষণার বিতর্কমূলক বিষয়বস্তু। কিন্তু তার সঙ্গে সফ্‌দার হাশমির কী সম্পর্ক? তার নাটকে, তার সাহিত্যে, তার সাম্যবাদী চিন্তাধারায় রাম-সীতার সামাজিক সম্পর্ক তো আদৌ ওঠেনি। তাহলে? সাম্যবাদী সফদার হাশমিকে ঐ সাম্প্রদায়িক বিতর্কের মধ্যে পেড়ে ফেলল কারা? কী উদ্দেশ্যে? যারা 'শহীদ হাশমি' ট্রাস্টকে অর্থ সাহায্য করেছিল, তারাই কি? নীল পার্টি — যাদের গুণ্ডার দল হাশ্‌মিকে হত্যা করেছিল তারা—নীরব। লাল পার্টি — যারা সাম্যবাদের অজুহাতে নিরন্ন পশ্চিম বাঙলার চাল সুদূর কিউবায় পাঠাতে আগ্রহী, তাঁরাও স্বদেশে ঐ সাচ্চা সাম্যবাদীর মতবাদকে মুছে ফেলায় কোন আপত্তি জানালেন না! যেন : 'এমনটা তো হয়েই থাকে!'

রাজনৈতিক কারণে তাঁরা এখন যে নীলপার্টির সমর্থক।

"এমন ভাবে বেঁচে থাকার চেঁয়ে মরে যাওয়াও ভাল!"[২]

তা ঠিক! সফদার হাশ্‌মির আদর্শটা পর্যন্ত মরে ভূত হয়ে গেল!

ভেবে দেখুন বিজন বসুর কথা। ঢাকুরিয়া রেল লাইনে যারা মাঝে-মধ্যে ডাকাতি করে, এক চুনাও থেকে আর এক চুনাও তক্ চার-পাঁচ বছর কোনক্রমে ডাকাতির অর্থে দিন গুজরান করে, তাদের পুলিশ চেনে, প্রশাসনও চেনে। লাল-নীল-নাতিলাল সবাই চেনে, যথাযোগ্য স্থানে প্রণামী দিয়েই তারা স্বাধীন ব্যবসা করে, তাদের বাধা দিতে গিয়ে প্রাণ দিলেন পঁয়ত্রিশ বছরের এঞ্জিনিয়ার বিজন বসু!

নীট ফল? 'ঐকান্তিক প্রচেষ্টা' সত্ত্বেও রেলপুলিশ ডাকাতদের সনাক্ত করতে পারল না। ও. সি. সাস্‌পেন্ড হলেন। কাগজের হৈ-চৈ মিটলে বদলি ও পুনর্বহাল হলেন। বেচারি ও. সি.! কী করবে সে? ইলেকশানের সময়ে যারা জানকবুল বুথ ক্যাপচার করে তাদের হাতে তো দড়ি পরানো যায় না!

অনেকদিন পরে যখন বালিগঞ্জে ফ্লাইওভার হল, তখন সদাশয় পশ্চিমবঙ্গ সরকার বাহাদুর স্মরণ করেছিলেন বিজন বসুকে। অকৃতদার বিজন বসু জীবিত থাকলে আর

কী আশা করতে পারতেন, বলুন? মস্তানপার্টির হাতে নিহত হবার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন বলেই না অমন একটা জব্বর সেতু তাঁর নামে চিহ্নিত হয়ে গেল!

ভেবে দেখুন ডি. সি. পোর্ট বিনোদ মেহ্‌তার কথা। কিংবা ইনকাম ট্যাক্স বিভাগের আন্‌মোল মুক্তা মুক্তি সেনের কথা। তাঁরাও অক্লেশে প্রাণ দিলেন। যেমন দিয়েছিলেন অপহৃতা কন্যার সন্ধানে ডাক্তার শ্যামাপদ রায়চৌধুরী। বলিষ্ঠ চিত্রপরিচালক তপন সিনহা সেই বাস্তব কাহিনী নিয়ে একটি অনবদ্য চলচ্চিত্র আমাদের উপহার দিয়েছেন — কিন্তু তিনি সজ্ঞানে শেষদৃশ্যে পরিবর্তনে বাধ্য হয়েছিলেন! শ্যামাপদর হয়েছিল — সৌমিত্রের হল না। ঐ শহীদ হওয়ার সৌভাগ্যের কথাটা বলছি আর কি! সত্যি কথাটা বল্‌লে তপনবাবুর ছবি সেনসরে ছাড় পেত না!

কিংবা ধরুন ছত্রিশগড় ডিস্টিলারির মালিক ধনকুবের কৈলাশপতি কেডিয়ার শ্রমিকদলন নীতির বিরুদ্ধে এককসংগ্রামী শঙ্কর গুহ নিয়োগী। কী অদ্ভুত ঘটনাপ্রবাহ দেখুন:

ভিলাই কানালের রাস্তার ধারে আর কে ইন্ডাস্ট্রিজ-এর একটি গুদাম একরাতে পুড়ে ছাই হয়ে গেল। সেই রাত্রে শঙ্কর গুহ নিয়োগী ছিল রায়পুরে। তাতে কী? ইলেকশানে যারা কালো টাকার বন্যা ডাকায় তাদের ইঙ্গিতে স্থানীয় পনেরজন শ্রমিকের সঙ্গে রায়পুর থেকে পুলিশে পাকড়াও করে নিয়ে এল শঙ্করকেও। কয়েকদিন পরে ভিলাই টাইম্‌স্ পত্রিকার সম্পাদক ডাঃ দেবীদাস তাঁর সম্পাদকীয় কলমে লিখলেন, "এটা কী অপূর্ব কাকতালীয় ঘটনা, আপনারা বিবেচনা করে দেখুন। গুদামটি তৈরী করার পর ছয় বছর কেটে গেছে, কর্তৃপক্ষ সেটিকে অগ্নিকাণ্ডের জন্য ইন্সিওর করাননি। অথচ অগ্নিকাণ্ডের মাত্র পনের দিন পূর্বে গুদামটি সবরকম দুর্ঘটনার জন্য মোটা টাকার বীমা করানো হল। কোন্ জ্যোতিষী কর্তৃপক্ষকে জানালেন যে, পক্ষকালের মধ্যে গুদামটি অগ্নিদগ্ধ হতে চলেছে? তথ্যটা জানতে পারলে আমরা সিদ্ধান্তে আসতে পারি : ভিলাই টাইম্‌স্ অফিসটা অগ্নিকাণ্ডের জন্য বীমা করানো উচিত কি না।"

এই সম্পাদকীয় প্রকাশিত হবার আটচল্লিশ ঘণ্টার ভিতর অফিস-ফেরত ড: দেবীদাস প্রকাশ্য দিবালোকে ছুরিকাহত হলেন।

গভীররাত্রে কে অগ্নি সংযোগ করেছিল পুলিশ তা জানতে পেরেছিল, কিন্তু প্রকাশ্য দিবালোকে সম্পাদককে কে, কী কারণে ছুরিকাহত করল তার সন্ধান পেল না।

শঙ্কর গুহ নিয়োগীর দেহে আটটা বুলেট বিঁধেছিল!

কে হত্যাকারী — বলা বাহুল্য — 'সেটা বহু অনুসন্ধান করেও' পুলিশ নাকি হদিস করতে পারেনি। কিন্তু গুলিবিদ্ধ হওয়ার পূর্বেই শঙ্কর জেনে গিয়েছিল — তার ঘরে একটি টেপরেকর্ডেড ক্যাসেট রেখেও গিয়েছিল। সাহিত্য-সংস্কৃতিতে বিশেষ অবদানের

জন্য ঐ মিলমালিক কৈলাশপতি কেডিয়াকে বিশেষ পুরস্কারে ভূষিত করতে চলেছেন মধ্যপ্রদেশ সরকার। না করবেন কেন? কেডিয়াকে মদৎ যোগাচ্ছিলেন সিম্প্লেক্সের শিল্পপতি স্বয়ং মূলচাঁদ শাহ!

সুতরাং ওটা কোন সমাধান নয়। 'নন্দলালে'র চিন্তাধারাটা হাস্যকর — নিশ্চয় মানছি 'অভাগা দেশের কী হবে তাহলে আমি যদি মারা যাই।' কিন্তু তার বিপ্রতীপ চিন্তাধারাও আমাদের শেষ সমাধানে পৌঁছে দিতে পারবে না। ব্যক্তিগতভাবে আমরা শহীদ হব সন্দেহ নেই!

প্রথমে বুঝে নেবার চেষ্টা করি কেমন করে এমনটা হল। যে ইতিহাস আমাদের শেখানো হয়েছে তার বাহিরে স্বাধীনতা-উত্তর ভারতের প্রকৃত ইতিহাসটা কী? তাঁতিয়া টোপি, বালগঙ্গাধর তিলক থেকে নেতাজী সুভাষচন্দ্র যে স্বপ্ন দেখেছিলেন তা বাস্তবায়িত হওয়ার পরেও কেন মনে হচ্ছে আমরা পরাধীন! স্বাধীন দেশের পতাকা আছে, জাতীয়-সঙ্গীত আছে, সংবিধান আছে — তবু দেশের নিরন্ন মানুষ কেন এমন চরম অবমাননাকর জীবনযাপনে বাধ্য? হিন্দু আর মুসলমান পাশাপাশি গ্রামে দশকের পর দশক সুখে-শান্তিতে বাস করতে করতে হঠাৎ কার ইঙ্গিতে এমন মারমুখী হয়ে উঠছে? কেন? কার স্বার্থে? রেলে-বাসে-পথে-ঘাটে দল বেঁধে ডাকাতেরা এসে আমাদের সর্বস্ব লুণ্ঠন করে নিয়ে যাচ্ছে অথচ পুলিশ কিছুই করে উঠতে পারছে না। উপরন্তু পুলিশের দলই য়ুনিফর্ম পরে পতিতাপল্লীতে মাতলামি করছে, পথপার্শ্বে নিদ্রিতা যুবতীকে তুলে নিয়ে গিয়ে থানার মধ্যে গণবলাৎকার করছে ; আর, প্রদেশের সর্বোচ্চ নেতা মনে করছেন 'এমনটা তো হয়েই থাকে!' কেন? কেন? কেন?

দেশশাসক তথা দেশশোষক রাজনীতি-ব্যবসায়ী, কোটিপতি শিল্পপতি ও বণিকসম্প্রদায়, ঐ উভয়দলের সৃষ্ট সংবাদপত্র এবং পোষা গুণ্ডা-মস্তান এবং অসাধু পুলিশ, অকর্মণ্য প্রশাসক আমলার যে বিষচক্র আজ সংবিধানকে কব্জা করে ফেলেছে তা থেকে আমাদের কীভাবে মুক্তি হতে পারে তা বিচার বিশ্লেষণ করে দেখা যাক।

প্রথমবার মুক্তিযুদ্ধে আমরা হেরে গিয়েছিলাম : পলাশীপ্রান্তরে।

দ্বিতীয়বার প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধেও হেরে গিয়েছিলাম : 1857এ!

তৃতীয়বার বুঝতেই পারলাম না যে, এবারও হেরেছি : 1947এ!!

এই আমাদের শেষ সংগ্রাম! ঐ অতি শক্তিশালী বিষচক্রের বিরুদ্ধে আবার আমাদের বাঁশের কেল্লা বানাতে হবে। পাঠিকা! পাঠক! আমরা বুদ্ধদেব গুহের সঙ্গে একমত — এভাবে বেঁচে থাকার চেয়ে মরে যাওয়াও ভাল। মরতে আপনিও রাজি, আমিও রাজি! তবে মরার আগে ওদের মেরে মরার চেষ্টাটা করব না?

ঐ যারা আমার দেশমাতৃকাকে আজ উলঙ্গ করে ছেড়েছে!

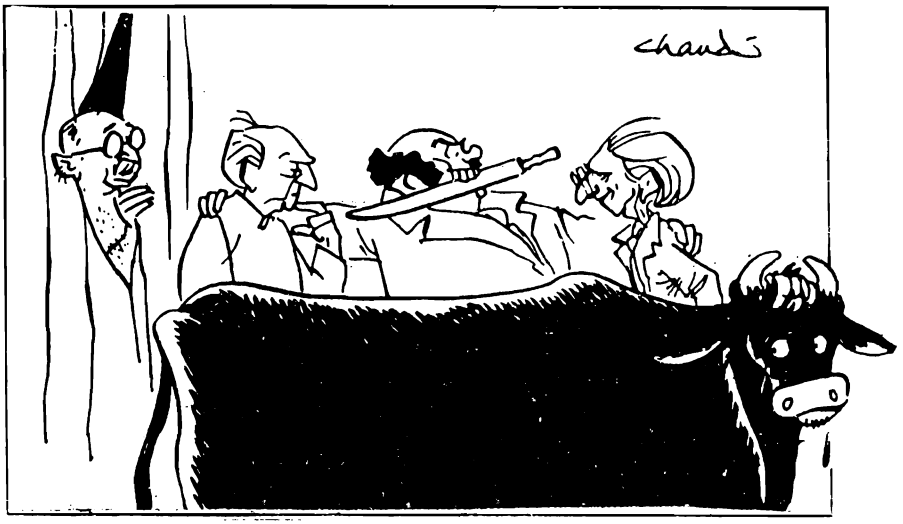

দুই

একটু আগেই ঐতিহাসিক আর গবেষকদের কাছে আর্জি রেখেছি; স্বাধীনতার পরবর্তী যুগের ইতিহাসটা নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে নূতন করে লিখতে। সেই নজির টেনে যুগসন্ধিক্ষণের একটি অনুদ্‌ঘাটিত ঐতিহাসিক ঘটনা লিপিবদ্ধ করে এই 'কৈফিয়ৎ'এর দ্বিতীয় পর্যায়ের সূচনা করতে চাইছি। আজ্ঞে হ্যাঁ! অনুদ্‌ঘাটিত, অনুচ্চারিত একটি বিচিত্র ঘটনা-পরম্পরা। সেটা জানতেন ওঁরা পাঁচজন এবং আমরা এগারোজন। এই ষোলোজনের ভিতর কেউই কখনো তা প্রকাশ করেননি। গান্ধীজী না হলেও তাঁর আদর্শ আজ ভারতে বিস্মৃতপ্রায়; আর নেতাজীর জন্মশতবর্ষের প্রাক্কালে এ-মাসেই দেখছি আনন্দবাজারে ছাপা হয়েছে, "পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ নবম ও দশম শ্রেণীর ইতিহাসের পাঠক্রমের ভার লাঘব করতে গিয়ে নেতাজী প্রসঙ্গে প্রায় সব ঐতিহাসিক তথ্যই বাদ দিয়েছে। সেই সঙ্গে বাদ পড়েছে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের একটা গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ও। সংশোধিত পাঠক্রমে সুভাষচন্দ্র বসুর রাজনৈতিক কার্যাবলী, ফরওয়ার্ড ব্লক গঠন, **আজাদ হিন্দ ফৌজের লড়াই**, ... **১৯৪৬ সালের নৌবিদ্রোহ**, ইত্যাদি কিছুই থাকছে না। অথচ এসব বিষয় চলতি পাঠক্রমে ছিল। এ বিষয়ে মন্ত্রী কান্তি বিশ্বাসকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, স্কুলের পাঠক্রম ঠিক করে পর্ষদ। রাজ্য সরকার কখনও তাতে হস্তক্ষেপ করে না। নেতাজী প্রসঙ্গ বাদ পড়েছে কি না, তিনি এখনও জানেন না। পর্ষদের উপসচিব (শিক্ষা) ঈশিতা চট্টোপাধ্যায় সংশোধিত পাঠক্রম সম্পর্কে একটি বিজ্ঞপ্তি বার করেছেন গত তেশরা ফেব্রুয়ারি ('95)। তাতে বলা হয়েছে, সংশ্লিষ্ট

পাঠক্রম 1995-96 শিক্ষাবর্ষ (অর্থাৎ নেতাজী শতবর্ষ) থেকেই কার্যকর হবে। অর্থাৎ আসছে মে মাস থেকে নতুন যে ইতিহাস বই পড়ানো হবে, তাতে এই সংশোধন থাকবে। সংশোধিত পাঠক্রমে কংগ্রেসে নেতাজীর ভূমিকার উল্লেখমাত্র থাকলেও তাঁর বাকি জীবন ও সংগ্রামের কথা কিছুই থাকবে না। ... নতুন শিক্ষাবর্ষে নবম ও দশম শ্রেণীতে ওঠা ছাত্ররা জানবে না নেতাজী কীভাবে ব্রিটিশ রাজশক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিলেন। তাঁর অন্তরীণ থাকা, ছদ্মবেশে দেশত্যাগ, বিদেশের মাটিতে আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন করে দেশের একাংশকে মুক্ত করার কাহিনী অজানা থেকে যাবে।"

আনন্দবাজারের স্টাফ রিপোর্টার ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মাননীয় কান্তি বিশ্বাসকে এ প্রশ্নটা অবশ্য করেননি, "রাজ্য সরকার পর্ষদের কাজে হস্তক্ষেপ তো করেন না, কিন্তু প্রচণ্ড কর্মদক্ষতার পরিচয় পেলে উপসচিবকে সচিবপদে উন্নীত করার সুপারিশ তো করতে পারেন?"

না, এ প্রশ্নটা ওঠেনি। জবাব তাই আমরা জানি না।

* * *

এই যখন দেশের হাল তখন আমি যেটুকু তথ্য জেনেছি তা লিপিবদ্ধ করি। এতদিন করিনি। বিবেকের নির্দেশে। সার্ভিস কন্ডাক্ট রুল্‌স্ বলে "Barring judicial inquiries and those ordered by the Govt. or Parliament, no person shall give evidence, except with the prior sanction of the Government." আমি অবশ্য অবসরপ্রাপ্ত পেনশনভোগী ; তবু বলি, না, আমি কোনও 'এভিডেন্স' দিচ্ছি না। কেন্দ্রীয় উপমন্ত্রীর কাছে যা শুনেছি তাই বিবৃত করছি। এতদিন প্রকাশ করিনি এই কারণে যে, যাঁর গৃহে আমন্ত্রিত হয়ে কাহিনীটা 1962 সালে শুনেছিলাম, তিনি ছিলেন তদানীন্তন ভারতের 'সিনিয়ারমোস্ট' আই.সি.এস্ অফিসার। তিনি আমাদের এগারোজনকেই মৌখিকভাবে বলেছিলেন : তথ্যটা প্রকাশ না করতে।

তাহলে আজ লিপিবদ্ধ করছি কী যুক্তিতে? প্রথা বলে, ত্রিশ বৎসর অতিক্রান্ত হলে যে কোন ঐতিহাসিক দলিল আর সরকারের গোপন তথ্য নয়, ইতিহাসের অধিকারে। যে যুক্তিতে মৌলানা আজাদের আত্মজীবনীর একটি বিশেষ অনুচ্ছেদ ত্রিশ বছর পরে প্রকাশিত হল। যে যুক্তিতে গান্ধীহত্যা মামলায় প্রতিবাদী নাথুরাম গড্‌সের জবানবন্দি ত্রিশ বছর পরে প্রকাশ করা হল।

কৈফিয়ৎ দিয়েছি। এবার ঘটনাটা বিবৃত করি।

আমি তখন দণ্ডকারণ্যে ডেপুটেশনে কাজ করি। উড়িষ্যার কোরাপুটে। এক্সিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ার। তপশীল উপজাতির কমিশনার তথা পূর্ত, গৃহনির্মাণ ও সরবরাহ দপ্তরের উপমন্ত্রী অনিলকুমার চন্দ দণ্ডকারণ্য পরিদর্শনে এসেছেন। রাত্রে চেয়ারম্যান-সাহেব তাঁর

বাড়িতে একটা নৈশভোজের আয়োজন করলেন। আমরা এগারোজন নিমন্ত্রিত ছিলাম — নয়জন বাঙালী, দুজন অবাঙালী, চীফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটার মিস্টার অ্যান্ড মিসেস্ জনসন। দিনের বেলা অফিশিয়াল ওয়ার্কিং লাঞ্চ হয়েছে; এটা চেয়ারম্যান-সাহেবের ব্যক্তিগত নিমন্ত্রণ।

চেয়ারম্যান তদানীন্তন ভারতের প্রবীণতম আই.সি.এস. : স্বনামধন্য পদ্মবিভূষণ সুকুমার সেন।

কাহিনীটি বিবৃত করেছিলেন অনিলকুমার চন্দ : 'আফটার-ডিনার' খোশগল্পে। সুধীজনমাত্রেই জানেন অনিল চন্দ ছিলেন তাঁর আমলে ভারতবিখ্যাত। লন্ডন স্কুল অব ইকনমিক্সের স্নাতক। বত্রিশ সালে তিনি শান্তিনিকেতন শিক্ষাভবনে যোগ দেন। পরের বছর থেকে রবীন্দ্রনাথের প্রয়াণকাল পর্যন্ত তিনি ছিলেন গুরুদেবের একান্ত সচিব। তিপ্পান্ন সালে রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ পরিষদের অষ্টম অধিবেশনে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন।

এত কথা বলছি বোঝাতে যে, যাঁর কাছে কাহিনীটা শুনেছিলাম তাঁর কথার কতটা গুরুত্ব। শ্রদ্ধেয় অনিল চন্দ প্রায় পনের বছর আগেকার একটি বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা আমাদের শোনালেন সে রাত্রে।

ভারত তখন পরাধীন। জিন্না-ঘোষিত 'ডাইরেক্ট-অ্যাকশন ডে' 16 আগস্ট 1946 অতিক্রান্ত। সমস্ত ভারত জ্বলছে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষবহ্নিতে — বিশষ করে পঞ্জাব, কাশ্মীর, বাংলা, কিছুটা উত্তরপ্রদেশ ও বিহার। দেশের নেতারা দিশেহারা! গান্ধীজী তখন সেবাগ্রামে। কী একটা কাজে মহাত্মাজীর সঙ্গে পরামর্শ করতে অনিল চন্দ এসেছেন শান্তিনিকেতন থেকে। আছেন আশ্রমের অতিথিশালায়। মহাত্মাজীর সঙ্গে কথা বলছেন, হঠাৎ টেলিফোনটা বেজে উঠল। যন্ত্রটা ছিল দুজনের মাঝামাঝি। কিন্তু মহাত্মাজী ছিলেন শায়িত। তাই অনিল চন্দ রিসিভারটা তুলে শুনলেন। অবাক হয়ে গেলেন। বললেন, বাপুজী, পণ্ডিতজী কথা বলছেন, ধরুন।

— পণ্ডিতজী? জবাহর? দেহ্‌লীসে কেয়া?

হাত বাড়িয়ে যন্ত্রটা নিয়ে শুনলেন। তারপর অনেকক্ষণ নীরবে শুনে যা বললেন তা রীতিমতো চাঞ্চল্যকর সংবাদ। হ্যাঁ, জওয়াহরলাল নেহরুই ও-প্রান্তে কথা বলছিলেন ; কিন্তু দিল্লী থেকে ট্রাংক-কলে নয়। আহ্‌মেদাবাদ স্টেশানের সুপারিন্টেন্ডেন্ট-এর ঘর থেকে। ওঁরা তিনজন এইমাত্র দিল্লী থেকে আহ্‌মেদাবাদ এক্সপ্রেসে এখানে এসেছেন।

অনিল চন্দ শুধু বললেন, ঔর দোনো কৌন? পণ্ডিতজী কে অলাবা?

— আজাদ ঔর প্যাটেল। তুম যাতে হো কঁহা? ব্যয়ঠে রহো!

অনিল চন্দ এই পর্যায়ে আমাদের বলেছিলেন, বাপুজী তাঁর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় দিয়ে—অথবা কোন ঐশ্বরিক ক্ষমতায়—হয়তো বুঝতে পেরেছিলেন কেন ঐ তিনজন সর্বভারতীয়

নেতা অতর্কিতে সেবাগ্রামে উপস্থিত হয়েছেন। আরও বলেছিলেন, "জানি না, বাপুজী এ কথাও ভেবেছিলেন কিনা যে—ওঁরা তিনজন, উনি একা! তাই কি আমাকে উঠে যেতে বারণ করলেন?"

সমস্ত কথোপকথন আমার স্মরণে নেই। এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে স্মৃতির মণিকোঠা হাৎড়ে আন্দাজে কিছু লেখা ঠিক হবে না। কথোপকথনের দু-তিনটি পংক্তি শুধু মনে আছে। কারণ তা ভোলা যায় না। একবার শুনে আপনারাও ভুলতে পারবেন না বাকি জীবনে। যেটুকু মনে আছে বিবৃত করি।

তার পূর্বে একটা কাজের কথা বলে নিই। বাষট্টি সালে আমি পনের বছরের পুরানো যে ঘটনাটি শুনেছিলাম সেই ঘটনাস্থলে উপস্থিত পাঁচজন স্বনামধন্য চরিত্র সকলেই প্রয়াত — চারজন স্বর্গে, একজন বেহেস্তে। সুকুমার সেন-মশায়ের সেই নৈশভোজে আমরা যে-এগারোজন ছিলাম তার ভিতর পাঁচজন প্রয়াত, দুজন কোথায় আছেন জানি না। বাকি চারজনের সন্ধান জানাতে পারি। আমি সস্ত্রীক জীবিত। আর আছেন দণ্ডকারণ্য প্রজেক্টের তদানীন্তন পার্চেজ অফিসার শ্রী হীরেন্দ্রনারায়ণ সান্যাল। যাদবপুরের মেকানিকাল এঞ্জিনিয়ারিঙের স্নাতক — বর্তমানে অশীতিপর তরুণ। এবং তাঁর সহধর্মিণী, আমার দিদির সহপাঠিনী শ্রীমতী সুপ্রীতি সান্যাল, এম.এ., বি.টি.। বছরদশেক আগে এঁর নাম সংবাদপত্রে দেখে থাকবেন। কারণ কোন স্ত্রীশিক্ষায়তনের প্রধান শিক্ষিকা হিসাবে অবসর নিয়ে তাঁর আজীবনসঞ্চিত প্রভিডেন্ট-ফান্ডের লক্ষাধিক টাকা তিনি রামকৃষ্ণ মিশনকে দান করে দিয়েছিলেন। যে-কোন পাঠক-পাঠিকার কৌতূহল চরিতার্থ করতে নয়, কোনও গবেষক বা জীবনীকারের প্রয়োজন হলে আমাকে চিঠি লিখবেন, ওঁদের দুজনের ঠিকানা ও টেলিফোন নম্বর জানাব।

স্মৃতিচারণটুকু এবার শেষ করি—

জওয়াহরলালই আলোচনা শুরু করেন। যুক্তিতর্ক দিয়ে তিনি মহাত্মাজীকে বোঝাতে চাইছিলেন যে, মাউন্টব্যাটেন-প্রস্তাবিত ভারত বিভাগ স্বীকার করে নেওয়া ছাড়া দেশের সামনে আর কোনও বিকল্প পথ খোলা নেই। প্রতিদিন অন্তত একহাজার নরনারী নিহত হচ্ছে সমগ্র ভারতে।

মহাত্মাজী জানতে চাইলেন এ বিষয়ে আজাদ ও প্যাটেল কী বলেন।

দুজনেই তাঁদের মতামত দিলেন। ওঁদের মতে পরিস্থিতি যা দাঁড়িয়েছে তাতে 'ভারত-বিভাগ' অনিবার্য। যত দেরী হবে ততই মৃতের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। ওঁরা তিনজনে একমত হয়েই বাবুজীর আশীর্বাদ ভিক্ষা করতে এসেছেন।

মহাত্মাজী বেঁকে বসলেন। তিনি রাজি নন।

গান্ধীজীর প্রতিক্রিয়া সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। আমার মতো পক্ককেশ

প্রবীণদের স্মরণ হবে মহাত্মাজীর উক্তি : "ভারত যদি বিভক্ত হয় তবে তা হবে আমার মৃতদেহের উপর।"

এটা ইতিহাসস্বীকৃত।

নতুন তথ্য যেটুকু অনিলকুমার পরিবেশন করেছিলেন তা এই—গান্ধীজী বলেছিলেন, এব্ লিংকনকেও তাঁর ঘনিষ্ঠ সহকর্মীরা এবং তাঁর জেনারেলরা একই কথা একদিন বলেছিল : আমেরিকাকে দু-টুকরো করে ভ্রাতৃবিরোধের অবসান ঘটাতে। লিংকন স্বীকৃত হন্‌নি — তিনি প্রাণ দিয়েছিলেন, কিন্তু আমেরিকাকে দু-টুকরো হতে দেননি! আমরাই বা পারব না কেন? কংগ্রেসের ছোট ছোট সেবাদল তৈরি করে চল, আমরা এক-একজন এক-এক দিকে রওনা হই।

ওঁরা তিনজন স্বীকৃত হতে পারেন না।

আবার সবিনয়ে স্বীকার করি : কে কী বলেছিলেন তা পর পর সাজিয়ে নিয়ে বলতে পারব না। তার মধ্যে আমার কল্পনার ভেজাল অনিবার্যভাবে অনুপ্রবেশ করবে। তবে এটুকু মনে আছে, শেষ পর্যন্ত পণ্ডিতজী নাকি বলেন, বাপুজী! পার্টিশান ইজ নাউ এ সেট্‌ল্ড ফ্যাক্ট! আপনি যদি আমাদের সঙ্গে একমত না হতে পারেন তাহলে নিরপেক্ষ থাকুন।

গান্ধীজী মানতে রাজি হননি। পণ্ডিতজীর কণ্ঠে অর্ধশতাব্দী পূর্বেকার লর্ড কার্জনের কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়েছিলেন কি না তাও বলেননি। বলেছিলেন, না, আমি তো নিরপেক্ষ নই! আমি ভারতবিভাগের বিপক্ষে! নিরপেক্ষ থাকতে যাব কেন?

প্যাটেল নাকি এই সময়ে বলেন, সে-কথা তো আপনি আমাদের ইতিপূর্বেও জানিয়েছেন, বাপুজী! আমাদের তিনজনের বিনীত অনুরোধ — ও-কথা প্রেসকে জানাবেন না!

গান্ধীজী এ-কথায় নাকি বিরক্তি প্রকাশ করে বলেন, প্রেস্‌কে আমি কখন কী বলব তার নির্দেশ আমি কি তোমার কাছে নিতে যাব, সর্দারজী?

এই সময় — অনিল চন্দের স্মৃতিচারণ অনুসারে — সর্দার প্যাটেল নাকি একটা বেফাঁস উক্তি করে বসেন : তাহলে তো আমরা দেখতে বাধ্য হব, যাতে আপনার স্টেট্‌মেন্ট সংবাদপত্রে না পৌঁছায়।

মহাত্মাজী এতক্ষণ অর্ধশয়ান অবস্থায় আলাপচারী করছিলেন। একথায় হঠাৎ সোজা হয়ে উঠে বসলেন। প্যাটেলের দিকে পূর্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে সবিস্ময়ে বললেন : কেয়া কহা?...ও। ইয়ে বাত হ্যয়! আভি সমঝ্ গয়া!

মুষ্টিবদ্ধ বলিরেখাঙ্কিত শীর্ণ দুটি হাত প্যাটেলের দিকে বাড়িয়ে ধরে বলতে থাকেন, মুঝে অ্যারেস্ট করনা চাহ্‌তে হো? তো করো! লায়ে হো হ্যান্ডকাফ?

আজাদ ও জওয়াহরলাল দুজনে একযোগে ঝাঁপিয়ে পড়েন : ছি! ছি! ছি! এ কী বলছেন, বাপুজী! সর্দার ও কথা বলতে চায়নি মোটেই!

এতক্ষণ যা লিখেছি — কখনো 'ডাইরেক্ট ন্যারেশানে' কখনো 'ইনডাইরেক্ট' — তার অনেকটাই স্মৃতিনির্ভর, কিছুটা আন্দাজে, হয় তো বা কিছুটা কল্পনানির্ভর। কিন্তু এবার যে কয়টি পংক্তি লিপিবদ্ধ করছি তা তিন দশকের উপর আমার স্মৃতিপটের মণিমঞ্জুষায় সযত্নে সঞ্চিত হয়ে আছে — ছেনি, হাতুড়ি দিয়ে খোদাই-করা শিলালিপির মতো!

মহাত্মাজী সখেদে বলে ওঠেন, হাঁ! অব তুম তিনো ইয়ে কহ্ সক্‌তে হো, কিঁউ কি মেরা বেটা তো ইঁহা নেহী হ্যয় না?

জওয়াহরলাল সবিস্ময়ে প্রশ্ন করেন, কিস্‌কি বাত কর রহেঁ হ্যঁয়, বাপু?

— ওয়হ্ বেটা! যো হম্‌পর অভিমান করকে ঘর ছোড়কে চলা গয়া থা! অব সুনা হ্যয় কি ওয়হ্ বার্তানিয়াকা সাথ লড়াই করতে হুয়ে শহীদ বন্ চুকা। অগর্ ওয়হ্ রহ্‌তা, তো ম্যয়ভি দেখ্ লেতা, ক্যায়সে তুম্ তিনো . . .

গান্ধীজী 'সেন্টিমেন্টাল' ছিলেন, এমন অপবাদ তাঁর শত্রুতেও দেবে না। খুব সম্ভবত সেদিন বাক্যটা তিনি অসমাপ্ত রাখেননি। কিন্তু তার পনের বছর পরে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে অনিলকুমার চন্দ তা পারলেন না। তাঁর গলাটা ধরে এল। বাক্যটা অসমাপ্ত রেখেই চোখ থেকে চশমাটা খুললেন এবং পকেট থেকে রুমালটা বার করলেন।

নেতাজী জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপনের কার্যক্রম-হিসাবে নাকি আমাদেরই ভোটে নির্বাচিত সদাশয় পশ্চিমবঙ্গ সরকার এখন থেকেই উদ্‌যোগী হয়েছেন — স্কুলপাঠ্য পুস্তক থেকে নেতাজী-বিতাড়নের সার্কুলার ইস্যু হয়ে গেছে। তা যাক! কিন্তু মহাকাল তো কোনও 'চুনাও'-এর পরোয়া করে না। ইতিহাস তো কারও কাছে ভোট চাইতে আসে না। সেই ইতিহাসের তাই জানা থাকা দরকার যে, সুদূর সাইগনের বেতারে কোন এক দোশরা অক্টোবর তারিখে ব্রিটিশ কারাগারের জনৈক বন্দীকে যিনি 'পিতৃসম্বোধন' করে, সর্বপ্রথম '*জাতির পিতা*' আখ্যা দিয়েছিলেন, সেই বুড়ো বাপও তাঁকে '*মেরা বেটা*' সম্বোধন করেছিলেন — নিদারুণ অসহায়ত্বে, পরম নিঃসঙ্গতায়, চরম দুর্দিনে!

* * *

অনিলকুমার বর্ণিত সেবাগ্রামের ঐ ঘটনা সম্ভবত সাতচল্লিশ সালের মে-মাসের। কারণ পুরাতন নথিপত্র ঘেঁটে দেখছি যে, মাউন্টব্যাটেন প্ল্যান নিয়ে কংগ্রেসের যে মিটিং হয়েছিল তার তারিখ ঐ বছরের দোশরা জুন। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য ছাড়া সে-সভায় বিশেষ অতিথিরূপে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন ডক্টর খান সাহেব, ডক্টর জয়রামদাস দৌলতরাম, জয়প্রকাশ নারায়ণ, রামমনোহর লোহিয়া এবং গান্ধীজী। এই মিটিঙে গান্ধীজী তাঁর উষ্মা প্রকাশ করেন। বলেন, মাউন্টব্যাটেন প্ল্যানে কী কী শর্ত আছে

তা ইতিপূর্বে তাঁকে জানানো হয়নি। জওয়াহরলাল ও প্যাটেল নীরব থাকেন এ-অভিযোগের বিষয়ে। গান্ধীজী ব্যতিরেকে জয়প্রকাশ ও রামমনোহর প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। এই প্রসঙ্গে আরও বলি, মৌলানা আজাদের পরে স্বাধীন ভারতে প্রথম কংগ্রেস সভাপতি হয়েছিলেন আচার্য কৃপালনী, কিন্তু মহাত্মাজীর তীব্র মনোবেদনার কথা জানতে পেরে, সেবাগ্রামে গিয়ে গান্ধীজীর সঙ্গে কথা বলে, আচার্য কৃপালনী কংগ্রেস সভাপতির পদ থেকে পদত্যাগ করেন — মাত্র তিন মাসের মধ্যে। নভেম্বর, সাতচল্লিশ।

* * *

ভারতবর্ষ তিন টুকরো হয়ে গেল। পশ্চিম-পাকিস্তান, পূর্ব-পাকিস্তান, আর মাঝখানে ভারত। অর্ধশতাব্দী ধরে ভারতের শাসন-ব্যবস্থায় — রাজনীতি-ব্যবসায়ীর দল, বণিক ও ধনিক সম্প্রদায় কী ভাবে আমাদের সংবিধানকে কব্জা করে, প্রশাসন ও পুলিশের নৈতিক মান নিজ নিজ স্বার্থে অবনমন ঘটিয়ে বর্তমান ন্যক্কারজনক পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে এবার তা আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করব। গোটা ভারতে তা হয়েছে ধীরে ধীরে, ধাপে-ধাপে। একাধিক অপশাসকের স্বার্থান্ধ চিন্তায় ও অপকীর্তিতে। কিন্তু পশ্চিম-বাঙলায় — বলা উচিত সুবে-বাঙলায় — তা ঘটেছিল প্রাক-স্বাধীনতা কালেই। স্বাধীনতার ঠিক এক বছর আগে এই সোনার বাঙলাকে রৌরবে রূপান্তরিত করার গৌরব একটিমাত্র অপশাসকের : সুবে-বাঙলার শেষ মুখ্যমন্ত্রী জনাব শহীদ সুরাবর্দী।

আজ বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী — আরবসাগর তীরে শারদ পাওয়ার থেকে পশ্চিম বাঙলার জ্যোতি বসু, লালু ও মুলায়ম যাদব, মধ্যপ্রদেশের সুন্দরলাল পাটোয়া থেকে তামিলনাড়ুর জয়ললিতা, উড়িষ্যার বিজু পট্টনায়ক — নিজ নিজ এলাকায় পুলিশকে ব্যক্তিগত ও পার্টিগত স্বার্থে যেভাবে নিয়োগ করছেন, ঠিক তাই করেছিলেন সুবে এপার-বাঙলা ওপার-বাঙলার শেষ মুখ্যমন্ত্রী সুরাবর্দী। উনিশ শ ছেচল্লিশে।

ষোলই আগস্ট 1946, মনুমেন্টের নিচে দাঁড়িয়ে সুরাবর্দী যখন 'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান' বক্তৃতা করছেন তখন তাঁর গোপন নির্দেশ ও ব্যবস্থাপনায় মুসলমান গুণ্ডা আর লুঠেরার দল অবাধে হিন্দুর দোকান-বাড়ি লুঠ করছিল। আমি আর আমার সহপাঠী বাদল, সেই ধ্বংসের চিত্র প্রত্যক্ষ করেছিলাম আটচল্লিশ ঘণ্টা বাদে — তা আগেই বলেছি। ঐ আঠারই আগস্ট, 1946-এর 'দ্য স্টেটসম্যান' পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল : "Over 270 killed, 1600 injured in two days" (Report on "Direct Action" of Muslim League)। সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়নি, কিন্তু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় জানি যে, ঐ সংখ্যা দুটির পঁচানব্বই ভাগ হিন্দুর। এ কথা লিখে গেছেন দু জন সাংবাদিক — যাঁরা না-হিন্দু, না-মুসলমান। প্রথমত, লেওনার্ড মোস্‌লে ('লাস্ট

ডেজ অব ব্রিটিশ রাজ') এবং দ্বিতীয়ত, মাইকেল এডওয়ার্ডস্ ('লাস্ট ইয়ার্স অব ব্রিটিশ ইন্ডিয়া')। তাঁরা স্পষ্টাক্ষরে লিখেছেন যে, মুসলীম লীগ নেতাদের — বিশেষ করে সুরাবর্দীর — গোপন নির্দেশে পুলিশ গুণ্ডাদের কোন বাধা দেয়নি।

কিন্তু তারপরেই চাকা ঘুরে গেল। উনিশ তারিখ থেকে কলকাতায় হিন্দুরা সঙ্ঘবদ্ধ হল — ঘুরে দাঁড়াল। ঠিক তখনি মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে কলকাতা পুলিশ সক্রিয় হল। শুরু হল ধরপাকড়। সুরাবর্দী ঐ সময় বেছে নিলেন নোয়াখালি জেলার তিনটি থানাকে, যেখানে মুসলমানেরা নিরঙ্কুশভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ : রামগড়, বেগমগঞ্জ এবং লক্ষ্মীপুর। দাঙ্গার ভয়াবহতা এবং প্রশাসনের নির্লিপ্ততায় দিল্লী থেকে ছুটে এলেন মহাত্মা গান্ধী। প্রায় অশীতিপর বৃদ্ধ। মহাত্মাজীর কাছে সব চেয়ে বিস্ময়কর মনে হয়েছিল — প্রশাসনিক নির্লিপ্ততা! ইংরেজ জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট, ডিভিশনাল-কমিশনার এবং ইংরেজ পুলিস-সুপারদের কাছে তিনি বারংবার ঐ একই প্রশ্ন করতে থাকেন : কেন? কেন? কেন?

সুরাবর্দীর অলিখিত নির্দেশে ইংরেজ প্রশাসকের দল সেদিন নোয়াখালির সংখ্যালঘু গ্রামবাসীর জান-মান-ইজ্জত রক্ষা করতে পারেননি একথা যেমন সত্য তেমনি সত্য তাঁদের সকুণ্ঠ অকৃত্রিম স্বীকৃতি। চট্টগ্রাম বিভাগের ইংরেজ কমিশনার উইলিয়াম ব্যারেট ঐ দাঙ্গায় পুলিশ ও প্রশাসনের ব্যর্থতার হেতু বিজ্ঞাপিত করে একটি অসামান্য রিপোর্ট প্রণয়ন করেছিলেন। সেই রিপোর্ট তিনি শুধু মুখ্যমন্ত্রীকে প্রেরণ করেই কর্তব্য শেষ করেননি। বিলাতের সংবাদপত্রে প্রকাশ করেছিলেন। সে হিম্মৎ তাঁর ছিল — যা নেই, অনেক দুঃখে লিপিবদ্ধ করে যাচ্ছি — আজকের দিনের অধিকাংশ আই. পি. এস. এবং আই. এ. এস. উচ্চপদস্থ অফিসারদের। মেহ্‌তা-হত্যা, বিজন হত্যা, মুক্তি সেন হত্যা, ডাক্তার শ্যামাপ্রসাদ-হত্যা, অনিতা হত্যা, শঙ্কর গুহ নিয়োগী অথবা সফদার হাশমির হত্যাকাণ্ডের নেপথ্য-নায়ক কোন্ কোন্ কোটিপতি জনদরদী নেতা সে-কথা বলবার মতো হিম্মৎ এঁদের হয়নি। কারণ এঁরা সবাই 'অফিশিয়াল সিক্রেসি অ্যাক্টের' 'বন্ডেড লেবার আই.এ.এস'।

আজ্ঞে হ্যাঁ! পি. এস. আপ্পু, অনাদী সাহু, সঞ্জীব চাড্ডা, উল্লাস যোশী, নাগরাজন ভিট্টল, এ. সি. সেন, আভাস চ্যাটার্জি, স্মরণ সিং, সঞ্জয় মুখার্জি, বিশ্বনাথ মুখার্জি, অর্কপ্রভ অথবা নজরুল ইসলামের নাম আমার জানা আছে। তাঁদের দুঃসাহসী কীর্তিকাহিনীর কথা আপনাদের সামনে উপস্থাপিত করার জন্যই তো এই 'কৈফিয়ৎ'; কিন্তু সে তো অতি সাম্প্রতিককালের ঘটনা। আমি আপাতত লিপিবদ্ধ করছি অবক্ষয়ের ইতিহাস!

উইলিয়াম ব্যারেট রচিত ঐ রিপোর্টটি সাংবাদিক সুখরঞ্জন সেনগুপ্তের মতে

(বর্তমান পত্রিকা 28.11.92) : "সর্বকালের জন্য স্মরণীয় এ কারণে যে, কোনও মুখ্যমন্ত্রী তাঁর রাজনৈতিক মতলব হাসিল করার জন্য পুলিশ ও প্রশাসনকে কী ভাবে নিষ্ক্রিয় করে দিতে পারে তার দৃষ্টান্ত রয়েছে এই রিপোর্টটিতে।"

অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু ঐ সময়ে মহাত্মাজীর সঙ্গে পদব্রজে নোয়াখালির গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে পরিভ্রমণ করছিলেন। স্মৃতিচারণ গ্রন্থে ('মাই ডেজ উইথ গান্ধীজী'-তে) তিনি যা লিখেছেন তার আংশিক বঙ্গানুবাদ :

"বেশির ভাগ দুষ্কৃতিকে গ্রেপ্তার করা যায়নি। তারা অবাধে ঘুরে বেড়াচ্ছে। যে কয়জন অপরাধজীবী ধরা পড়েছে, তাদের শাসকদলের কর্মীরা এই বলে আশ্বাস দিচ্ছে যে, তাদের মামলাগুলি আদালতে পেশ করতে বাধ্য হলে পুলিশ আইনের ঢিলে-ঢালা ফাঁক রাখবে, যাতে অপরাধীরা বেকসুর বেরিয়ে আসতে পারে। ফলে আক্রান্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের মনোবল ভেঙে পড়ছে। জেলা প্রশাসনের উপর স্বতই তারা আস্থা রাখতে পারছে না।"

কোথা থেকে উদ্ধৃতিটা দেওয়া হয়েছে আগেভাগে না বলে দিলে 'কুইজ মাস্টার' হরেক রকম জবাব পাবেন। এটা হতে পারে 'লালের' স্নেহধন্য লালুবাবুর নৈশ-বিহারের বীভৎসতা, অথবা বিজুবাবুর কলিঙ্গ শোষণ, কিংবা শারদ পাওয়ারের দাউদি দাওয়াইয়ের পাওয়ার-পলিটিক্স অথবা মুলায়েমের যাদব-মুষল : বাব্‌রি-মসজিদের চূড়ায় রাম-নাম-সৎ-হ্যয় পুকার। কিংবা পাঠকের হয়তো ধন্দ লাগতে পারে : এটা বুঝি এত ভঙ্গ তবু রঙ্গে ভরা মুক্তবেণীর স্বরাজ্যে জ্যোতির্ময় খাশদখল!

: ভারতবর্ষের সেই ট্রাডিশন সমানে চলেছে!

* * *

প্রসঙ্গান্তরে যাবার আগে আর একটা কথা বলে যাই :

জনাব হোসেন শহীদ সুরাবর্দী অন্তর থেকে বিশ্বাস করেছিলেন যে, 'ডাইরেক্ট অ্যাকশান ডে'-তে সুপরিকল্পিতভাবে কাফের নিধন করে তিনি মুসলিম জনগণের দৃষ্টিতে শ্রেষ্ঠনেতায় পরিণত হয়েছেন। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী খাজা নাজিমুদ্দিনকে তিনি লীগের পরিষদীয় দলের নির্বাচনে পঁয়তাল্লিশ সালেই হারিয়ে লীগ দখল করেছেন। ফলে পাকিস্তান রূপায়িত হলে তিনিই হবেন অবিসংবাদিতভাবে পুব-বাঙলার প্রধানমন্ত্রী। বাস্তবে তা হল না কিন্তু। পূর্বপাকিস্তান জন্ম নেবার মাত্র এক সপ্তাহ আগে কলকাতায় মুস্‌লিম লীগ পরিষদ দলের নির্বাচন হল। জনগণেশের প্রচণ্ড কৌতুকই বলুন অথবা মহাকালের ন্যায়নিষ্ঠ বিচার — খাজা নাজিমুদ্দিনের কাছে হেরে গেলেন শহীদ সুরাবর্দী। অবস্থা এমন হল যে, তিনি ঢাকায় পালিয়ে যেতেও সাহস পেলেন না — মহাত্মা গান্ধীর

কাছে আত্মসমর্পণ করে প্রাণ বাঁচাতে চাইলেন।

সুরাবর্দীর এই অপমানকর পরাজয়ের কারণ খুঁজতে গিয়ে সেকালে সাংবাদিকেরা অনেক যুক্তি-তর্কের অবতারণা করেছিলেন। অর্ধশতাব্দী অতিক্রান্তে আজ মনে হয় তার দুটি হেতু।

নাজিমুদ্দিনের কাছে নির্বাচনে পরাজিত সুরাবর্দী

মূল কারণ এই যে, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় সামান্য সংখ্যক কিছু লুঠেরা ও গুণ্ডা লাভবান হলেও সাধারণ মানুষ বিধর্মী নিধনে খুশি হয়নি, হয় না! কী হিন্দু, কী মুসলমান! সে প্রথমে মানুষ, পরে হিন্দু বা মুসলমান। বিধর্মী শিশুর হত্যায়, বিধর্মী নারীর নির্যাতনে সে মর্মাহত হয়। সুরাবর্দী আয়োজিত দাঙ্গায় 'স্টেটস্‌ম্যান' পত্রিকার হিসাবে কলকাতা ও নোয়াখালি মিলিয়ে প্রায় পাঁচ হাজার হিন্দু-মুসলমান প্রাণ হারায় এবং দশহাজার আহত হয়। দ্বিতীয়ত, প্রথম দিকে শুধু হিন্দুরাই লুণ্ঠিত ও নিহত হলেও পরে বহু মুসলমান পরিবারও নিশ্চিহ্ন হয়ে যান!

এই দাঙ্গা প্রশমিত করতে মহাত্মা গান্ধীর প্রচেষ্টা অতুলনীয়। প্রথমদিকে বাধা পেলেও তাঁকে সাহায্য করতে পরবর্তী কালে আপামর-জনসাধারণ এগিয়ে এসেছিলেন। মৃত্যুভয় তুচ্ছ করে এগিয়ে এসেছিলেন — কী হিন্দু, কী মুসলমান। কী কংগ্রেস, কী কম্যুনিস্ট পার্টি। শহীদ হয়েছিলেন স্মৃতীশ বন্দ্যোপাধ্যায়, শচীন মিত্র, লালমোহন সেন এবং ননী সেন। ঐ সময় কলকাতা শহরের ট্রাম-শ্রমিক ইউনিয়ন ছিল বামপন্থীদের (সি. পি. আই. এম. তখনো জন্মায়নি, সেটা ছিল কম্যুনিস্ট পার্টির) কব্জায়। যাঁরা শ্রমিকদের মধ্যে কাজ

করতেন তাঁরা ছিলেন সাচ্চা সাম্যবাদী — মহম্মদ ইসমাইল, সোমনাথ লাহিড়ী, আব্দুল রেজ্জাক, সত্যনারায়ণ মিশির, জহরুল হক, ধীরেন মজুমদার! কে হিন্দু কে মুসলমান চেনা যায়নি। সবাই সাম্যবাদী! তাঁরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে পথে নেমেছিলেন। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার অজুহাতে ট্রাম গাড়ি চালানো তাঁরা বন্ধ হতে দেননি!

সুরাবর্দী মহাত্মাজীর ছত্রছায়ায়

এর পাশাপাশি সাম্প্রতিক কালের আর একটি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পর্যালোচনা করুন : 1989 সালে, মহরমের মাসে, বিহারের ভাগলপুর শহরে যে নির্মম দাঙ্গা সংঘটিত হয়েছিল। 11.3.95 তারিখের আনন্দবাজারে এই দাঙ্গা নিয়ে সম্পাদকীয় ছিল : *লজ্জাকর ভাগলপুর উপাখ্যান*।

সংবাদে বলা হয়েছে, সাড়ে পাঁচ বছর আগে সংঘটিত ভাগলপুরের রক্তাক্ত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার জন্য যে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছিল তাঁরা এতদিনে তাঁদের রিপোর্ট জমা দিয়েছেন। তাঁদের হিসাবে দাঙ্গার প্রায় আড়াই হাজার মানুষ প্রাণ দেন। রিপোর্টে এজন্য দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ভাগলপুরের জেলা প্রশাসন এবং পাটনার তদানীন্তন সরকারকে দায়ী করা হয়েছে। কমিশনের মতে এজন্য দায়ী : ভাগলপুরের জেলা শাসক, পুলিশ সুপার, রাজ্য পুলিশের একজন ডি.আই.জি. এবং স্বয়ং আই.জি.।

> "যখন এক সম্প্রদায়ের উন্মাদ দাঙ্গাবাজরা অন্য সম্প্রদায়ের নিরীহ নিরস্ত্র জনসাধারণের উপর চড়াও হইয়াছে তখন তাহাদের নিরস্ত ও নিবৃত্ত করার পরিবর্তে এই অফিসাররা তাহাদের উস্কানি দিয়াছেন এবং আক্রান্তরা সুরক্ষা

চাহিলে অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া থাকিয়াছেন। দাঙ্গার সম্ভাবনা জানিয়াও পাটনার রাজ্য সরকারের কর্তাব্যক্তিরা সমগ্র পরিস্থিতির প্রতি অপরাধমূলক ঔদাসীন্য ও নিস্পৃহতা দেখাইয়াছেন বলিয়াও রিপোর্টে অভিযোগ করা হইয়াছে। স্বাধীনতার পর এ দেশে যখনই বড় কোনও সাম্প্রদায়িক হানাহানির ঘটনা ঘটিয়াছে, তখনই তাহার তদন্তে কমিশন নিযুক্ত হইয়াছে। কিন্তু তদন্ত রিপোর্টগুলি কদাচিৎ জনসমক্ষে প্রকাশ করা হইয়াছে। ... দোষী ব্যক্তিরা শেষ পর্যন্ত শাস্তি পাইল কি না, এ সংশয়ও জনমনে জাগিয়াছে।... ভাগলপুর দাঙ্গার রিপোর্টে, দেখা যাইতেছে রক্ষক পুলিশ অফিসারেরাই ভক্ষকের ভূমিকা লইয়াছিলেন। তাহাদের মধ্যে ভাগলপুর রেঞ্জের আই.জি.-র ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দাঙ্গাবাজ হিন্দু মৌলবাদীদের হাতে আক্রান্ত তাড়া খাওয়া এক সংখ্যালঘু জনতার সামনে দাঁড়াইয়া তিনি প্রকাশ্যে হুমকি দিয়াছিলেন, এখানে তিনি আর একটি কারবালার প্রান্তর বানাইয়া ছাড়িবেন। ...উল্লেখ্য, এই লোকটিই মাত্র কয়দিন আগে বিহার পুলিশের ডি.জি. নিযুক্ত হইয়াছেন এবং তাঁহাকে পুলিশে প্রশাসনের শীর্ষে রাখিয়াই বিহার বর্তমান বিধানসভার নির্বাচনে যাইতেছে।"

তসলিমা নাসরিনের লেখা *লজ্জা* উপন্যাসটার কথা এই প্রসঙ্গে আপনাদের মনে পড়ে যাচ্ছে তো? খুবই স্বাভাবিক। আমার কিন্তু মনে পড়ে গেল বোম্বাই থেকে প্রকাশিত একটি পত্রিকায় (Communalist Combat, Aug-Sept, 1994) এক সাংবাদিকের কাছে দেওয়া ডক্টর সুরেশ খইর্নার-এর একটি সাক্ষাৎকারের কথা। বোম্বাইয়ের নিগৃহীত মিউনিসিপ্যাল কমিশনার জি. আর. খইর্নারের সঙ্গে এঁর কোন সম্পর্ক নেই। ইনি কলকাতার বাসিন্দা, থাকেন ফোর্ট উইলিয়ামের ভিতর একটি কোয়ার্টার্সে এবং সমাজ-কল্যাণমূলক একাধিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি যুক্ত। বোম্বাইয়ের সাংবাদিককে দেওয়া তাঁর দীর্ঘ বিবৃতির বেশ কিছুটা অংশ এখানে অনুবাদ করে পরিবেশন করতে চাই — কারণ আমাদের মতে একমাত্র ডক্টর খইর্নার প্রদর্শিত পথেই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি গড়ে ওঠা সম্ভব। ধীরে ধীরে ধাপে ধাপে। জ্ঞানীগুণী মানুষদের ধরে নিয়ে এসে পদযাত্রার আয়োজন করলেই আমাদের কর্তব্য শেষ হয়ে যায় না।

রচনাটির শিরোনাম : Burying the Hatchet.

সম্পাদক সাক্ষাৎকারের মুখবন্ধে লিখেছেন, "অযোধ্যা বিরোধ থেকে উদ্ভূত 1989-এর ভাগলপুর শহরের দাঙ্গায় — সরকারী হিসাব অনুসারেই — মৃতের সংখ্যা ছিল এক হাজার ; আর তার নব্বই শতাংশই মুসলমান। মৃতের সংখ্যাটির অপেক্ষা

ভয়াবহ ছিল সাম্প্রদায়িক দানবদের নৃশংসতার ভয়ঙ্করতা। পশ্চিম বাঙলা থেকে সমাজসেবীর একটি দল ওখানে গিয়ে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করেন, দাঙ্গাবিধ্বস্ত নিষ্পাদপ শ্মশানে নূতন বিশ্বাস ও সম্প্রীতির বীজ বপন করেন। এখন সেগুলি অঙ্কুরিত চারাগাছ হয়ে উঠ্ছে। ডক্টর খইর্নারের এই সাক্ষাৎকারে সেই কাহিনীটি বিবৃত।"

ভাগলপুরে ভয়াবহ দাঙ্গাটা হয়েছিল 1989-এর অক্টোবরে। আমি ও আমার কয়েকজন সহকারী বন্ধু সেখানে প্রথম গিয়ে পৌঁছাই প্রায় ছয়মাস পরে। কলকাতা থেকে। ভাগলপুর জেলার অনেকগুলি গ্রাম আমরা ঘুরে ঘুরে দেখেছি। কেউ একশ, কেউ তিনশ গ্রামে গেছে। গণহত্যার ছয়মাস পরেও আমরা স্বচক্ষে দেখেছি অর্ধদগ্ধ মনুষ্য-দেহাবশেষের স্তূপ! কুঁড়ে ঘরে রক্তের শুকিয়ে যাওয়া দাগ, অথবা জনহীন শূন্য কুটিরের ভিতর তরোয়ালের কোপে ছিন্নভিন্ন তোষক-বালিশ — শূন্যগর্ভ বাক্স-পেটরা।

আক্রমণকারীরা বিধর্মীদের হত্যা করেই ক্ষান্ত হয়নি। শূন্যগৃহে অগ্নি সংযোগ করে গেছিল। কয়েকশত বছরের পুরাতন মস্‌জিদ ধ্বংস করে সেখানে গড়ে তোলা হয়েছে হনুমানজী অথবা দুর্গা মায়ের মন্দির। আমাদের সবচেয়ে যেটা বিস্মিত করল তা এই যে, ঘটনার এতদিন পরেও মৌলবাদী হিন্দু দাঙ্গাবাজদের মনে এতটুকু অনুশোচনা জাগেনি। অনেকেই অনায়াসে বল্‌লে, "মুসলমানেরা তো সব ব্লাডি বাস্টার্ড! যা করা হয়েছে তাই ছিল ওদের প্রাপ্য। সুযোগ পেলে যা করেছি, তা আবার করব!"

ওদিকে দাঙ্গার সেই ভয়াবহ হাহাকার থেকে যেসব মুসলমান রক্ষা পেয়েছে তারা তখন একটি মাত্র স্বপ্ন দেখছে — প্রতিশোধ! কড়ায়-গণ্ডায়! অনেকে একই কথা আমাদের বলল : "বাবুমশাইরা! আপনেরা কলকাতা থেকে এসেছেন? আমাদের উপকার করতে? একটিমাত্র পথ আছে! বড়কর্তাদের কাছে তদ্বির তদারক করে আমাদের জন্য কিছু গান-লাইসেন্স বার করে দেন। ব্যস্! বাদবাকি কাজ আমাদের!"

গোটা এলাকায় ছোট ছোট 'ঘেট্টো' গড়ে উঠেছে। অস্থায়ী ছাপড়া। এখানে-ওখানে। উইঢিপির মতো। যেসব গ্রাম হিন্দুপ্রধান সেখান থেকে মুসলমানেরা সপরিবারে সরে এসেছে মুস্‌লিম্ অধ্যুষিত গ্রামে। এবং ভাইসি ভার্সা! এই জাতীয় সাম্প্রদায়িক মেরুকরণের শেষ পরিণতি যে কী, তা সুধীজন মাত্রেই অনুমান করবেন!

কলকাতায় ফিরে এসে আমরা নিজেদের মধ্যে গভীরভাবে আলোচনা করলাম। কীভাবে অগ্রসর হওয়া উচিত? অভিজ্ঞ সমাজসেবী দাদারা বললেন, "সর্বপ্রথম

শান্তি পদযাত্রার আয়োজন কর। সাম্প্রদায়িক শান্তি-সমাবেশ আর মিলাদ-শরিফ!' কিন্তু আমাদের মনে হল তাতে কিছু লাভ হবে না। ভাগলপুর দাঙ্গার মাত্র ছয়মাস পূর্বে বাবা আম্‌তে ঐ ভাগলপুর শহরেই 'ভারত-জোড়ো' পদযাত্রা তো করে গেছেন। ভারত তো দূরের কথা — ভাগলপুরই তো তাতে জোড়া লাগেনি! তাহলে?

"আমরা জানতাম : ঐসব প্রতীকী শুভেচ্ছা, মৌখিক উপদেশ বা সহানুভূতি নিরর্থক। সমস্যাটা ওদের, সমাধান ওদেরই করতে হবে। আমরা বড়জোর অনুঘটকের ভূমিকা নিতে পারি। ক্যাটালিস্ট। প্রথম কাজ হচ্ছে জীবনে-জীবন যোগ করা। স্থির হল, অন্তত ছয়মাসকাল ধরে প্রতি মাসে আমাদের এক-একটি ছোট দল ওখানে যাবে। গ্রামে-গ্রামে ঘুরবে। ওখানে বাস করবে। ওদের জীবনের ভাগিদার হতে হবে। এভাবেই শুরু হল কাজ।

প্রাথমিক পর্যায়ে তিনটি গ্রাম আমরা বেছে নিয়েছিলাম : বাবুপুর, চান্দেরী আর রাজপুর। তিনটিই ভাগলপুরের কাছাকাছি গ্রাম। বাবুপুর হিন্দুপ্রধান গ্রাম। সেখানে কোন প্রাণহানি হয়নি। কিন্তু বর্তমানে গ্রামে একটিও মুসলমান নেই। ওদের বাড়িগুলো হয় অগ্নিদগ্ধ অথবা তার সদর দরজা হাট করে খোলা। জনমানবশূন্য। চান্দেরী ঐ ত্রয়ীর সবচেয়ে দুর্ভাগা গ্রাম। সেখানে হিসাবমতো পঁয়ষট্টি জন মুসলমান নিহত হয়েছিল একরাত্রে। যুবক-প্রৌঢ়-বৃদ্ধ নর ও নারী। মৃতদেহগুলি ফেলে দেওয়া হয়েছিল সংলগ্ন ঝিলে। যারা প্রাণে বেঁচেছিল তারা আশ্রয় নিয়েছিল রাজপুরে। সেটি মুসলমানপ্রধান গ্রাম।

প্রথম প্রথম আমরা এই তিনটি গ্রামে বারে বারে যেতাম। আমাদের মনে হল, যদি বাবুপুরের বাস্তুচ্যুত দশ-পনের ঘর মুসলমান পরিবারকে তাদের ফেলে-আসা ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারি, তাহলেই মস্ত বড় একটা কাজ হবে। কিন্তু প্রাথমিক বাধা হল বাবুপুরেরই হিন্দু মোড়লেরা। তারা ক্রমাগত বলতে থাকে — মুসলমানেরা সর্বদাই মারমুখী! সরকার ওদের সুয়োরানীর ছেলে বলে মনে করে। ওদের উচিত শিক্ষা হয়েছে। ওদের গাঁয়ে ফিরিয়ে নেওয়া হবে না!

আমরা নিজেদের চিন্তাভাবনা ওদের উপর আরোপ করতে চাইতাম না। তাহলে আমাদের কাজ ব্যাহত হবে। আমরা বরং সক্রেটিসের মতো নানান প্রশ্ন তুলে ওদের কাছে উত্তর শুনতে চাইতাম। আর উত্তর দিতে গিয়ে ওরা নিজেদের ভুলগুলো বুঝতে পারত। আমরা জানতে চাইতাম — 'তোমাদের এই বাবুপুর গাঁয়ের ঐ দশ-পনের ঘর মুসলমানকে সরকার কী কী বাড়তি সুবিধা দিয়েছে? যা তোমরা পাওনি? ঐ দশ-পনের ঘর মুসলমানের মধ্যে কজন ছিল সরকারী

চাকুরে? মানে গাঁয়ের চৌকিদার, সরকারি পিওন বা ডাক-হরকরা? অথবা গাঁয়ের স্কুলে, পোস্টাপিসে কিংবা সমবায় প্রতিষ্ঠানে চাকুরিরত?

ওরা আম্‌তা আম্‌তা করত। স্বীকার করত, ঐ বিতাড়িতদের অবস্থা ছিল হিন্দুদের তুলনায় আরও খারাপ। অশিক্ষিত অবজ্ঞাত, প্রায় সবাই মজুরচাষী। পড়িলিখি ইনসান নয়। এবং শেষ পর্যন্ত বল্‌ত ওরা নিজেদের গাঁয়ের মুসলমান বাসিন্দাকে কোন বাড়তি সুবিধা পেতে দেখেনি বটে, তবে অমুক দাদা বলেছেন, সরকার ওদের সুয়োরানীর ছেলেদের মতো নেকনজরে দেখেন।

ঐ অমুক-দাদা বহিরাগত কোন রাজনৈতিক দলের নেতা! ক্রমে এ-কথা ওরাও নিজমুখে স্বীকার করল : মনিরুদ্দি, বসির, কামাল — ওরা মানুষ খারাপ ছিল না! ওদের অবস্থা ছিল আরও খারাপ, অধিকাংশ দিনই একবেলা খেত। অথবা উপবাস। তবে অমুকদা কিন্‌তু বলতেন ...।

মুসলমানদের জমায়েতেও আমরা বৃথা সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করতাম না। প্রথম প্রথম আমরা নিশ্চুপ শুনে যেতাম ওদের নির্যাতনের কথা, আত্মীয়-বিয়োগের দুঃখের কথা। ক্রমে, ধীরে ধীরে আমাদের যুক্তিগুলো ওরা নিজেরাই শুনতে চাইল। আমরা ওদের মুখ দিয়েই বলবার চেষ্টা করলাম যে, দু-দশটা বন্দুকের লাইসেন্স যোগাড় করে দিলেই সমস্যাটা মিটবে না! হেঁদুরাও তা জোগাড় করবে। ফলে গতবার ছিল টাঙি, রাম-দা, তরোয়াল — আগামী বার হবে বন্দুকের লড়াই! ওরা স্বীকার করল : জী! হক কথা! এটা কোন সমাধান নয়। দু-পক্ষই জানত না — আমরা কাজে নামার আগেই আর একটা কাজ করেছিলাম রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করে। একটি সরকারী আদেশ জারী করিয়েছিলাম — কী হিন্দু, কী মুসলমান কেউ কোন পরিত্যক্ত জমি, বাড়ি বা ভস্মীভূত ধ্বংসস্তূপ কিনে নিতে পারবে না! এটা ওরা জানত না। ফেলে-আসা জমি বাড়ি বেচতে গিয়ে আদালতে জানতে পারে। এই প্রাথমিক ব্যবস্থাটা নেওয়া হয়েছিল বলেই আমরা শেষ পর্যন্ত হিন্দু ও মুসলমান গ্রামবাসীদের নিজ নিজ ভিটায় ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছিলাম।

ভাগলপুর শহরে আমরা বেশ কিছু মানুষের সন্ধান পেয়েছিলাম — হিন্দু এবং মুসলমান — যারা নিজেদের প্রাণের ঝুঁকি নিয়েও বিধর্মী নরনারীকে বাঁচিয়েছে। আশ্রয় দিয়েছে, নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দিয়েছে। অধিকাংশই হিন্দু এবং প্রায় অশিক্ষিত নিরন্ন মানুষ — রিকশাওয়ালা, দোকানদার, বাসের কন্ডাক্টর, গঙ্গার পারানি নৌকার মাঝি! আমরা তাদের মাঝে মাঝে ধরে নিয়ে আসতাম আমাদের মুসলিম-ভাইদের জমায়েতে।

ডক্টর খেরনার সংবাদপত্রের প্রতিনিধির কাছে বলেননি, কিন্তু তাঁর দলের একজন আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছিল — এ ব্যবস্থায় দু-জাতের উপকার হয়েছিল। প্রথম কথা, সেই দুর্যোগরাত্রিতে উন্মাদ নরপিশাচদের হাত থেকে সে-সব মুসলমান তাঁদের জান-মান বাঁচাতে পেরেছিলেন তাঁরা তাঁদের রক্ষাকারীদের স্বচক্ষে দেখে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠ্‌তেন। সমাজসেবী দলের প্রতি বিশ্বাসযোগ্যতা বৃদ্ধি পেত। জানের পরোয়া না করে যারা বিধর্মীকে বাঁচাতে চেয়েছিল তাদের নিয়ে জমায়েতে ওঁরা খুব নাচানাচি করতেন — তাদের মিঠাই খাওয়াতে চাইতেন। অন্যদিকে যেসব 'অমুকদাদা' সাম্প্রদায়িকতাকে মূলধন করে রাজনীতি ব্যবসায় অবতীর্ণ হয়েছেন তাঁদের যাতায়াতটা কমে গেল। তাঁরা ক্রমেই অবাঞ্ছনীয় বাহিরের লোক বলে গ্রামে চিহ্নিত হয়ে যেতে থাকেন। আবার ফিরে আসা যাক সাক্ষাৎকারের প্রসঙ্গে :

> ভাগলপুর শহরের অবস্থাটা বুঝতে পারবেন এই কথা থেকে : ট্রেনে বা বাসে কেউ যদি রাত আটটার পর শহরে এসে পৌঁছাতো তাহলে স্টেশন-প্ল্যাটফর্মে বা বাসস্ট্যান্ডে রাতটা কাটিয়ে পরদিন সকালে বাড়ি ফিরত। সন্ধ্যার পর গোটা শহরটা হয়ে যেত জঙ্গলের রাজত্ব — গণহত্যার ছয়মাস পরেও। কিছু রাজনীতি-ব্যবসায়ী আর তাঁদের তাঁবে কর্মরত পুলিশ ও প্রশাসন নির্বিকার। বস্তুত তাদের পৃষ্ঠপোষকতাতেই অপরাধজীবী মস্তানেরা রাতের ভাগলপুরের হর্তাকর্তাবিধাতা ছিল। আমরা দু-দলের মানুষকেই বোঝাতে চাইতাম ; এভাবে কতদিন চলবে? ভাগলপুর শহরের লক্ষ লক্ষ মানুষ এককাট্টা হয়ে ঐ দু-দশজন গুণ্ডাকে কব্জা করতে পারবে না? এ কি হয়? শেষ পর্যন্ত ওরা রাজি হয়ে গেল। প্রতিটি মহল্লায় গড়ে উঠ্‌ল এক-একটি শান্তিরক্ষা বাহিনী। তাতে সব জাতের মানুষকেই ওরা গ্রহণ করেছে : হিন্দু — ব্রাহ্মণ, যাদব, ভুঁইহার, রাজপুত, মুসলমান — শিয়া ও সুন্নি। অপরাধজীবী মস্তানদের পৃষ্ঠপোষকেরা ধীরে ধীরে সংযত হলেন। কারণ ক্রমে ক্রমে গোটা শহরে এই রকম দেড়শটি শান্তিবাহিনী গড়ে উঠ্‌ল — প্রতিটি মহল্লায়। মস্তানেরা সড়ে পড়ল — কেউ রাঁচি, কেউ ধানবাদ — নতুন এম্‌প্লয়ারের সন্ধানে।
>
> এখন ভাগলপুর শহরে মাঝরাতে কোন যাত্রী ট্রেনে বা বাসে এসে পৌঁছালে সে রিক্‌সা নিয়ে বাড়ি চলে যায়!
>
> আমাদের 'অপারেশন-ভাগলপুর' চরম সাফল্য লাভ করল অযোধ্যায় বাব্‌রি-মস্‌জিদ ভাঙার পরে। আশ্চর্যের কথা নয়? স্পর্শকাতর ভাগলপুরে তার কোন প্রতিক্রিয়াই হল না — অর্থাৎ বিরূপ প্রতিক্রিয়া। প্রতিবাদসভা হয়েছিল — হ্যাঁ দুবারই! বাব্‌রি মসজিদ ধ্বংসের পর, এবং বোম্বাই বিস্ফোরণের পরে। সভায়

মুসলমান বক্তারা নিন্দা করলেন বোম্বাই-বিস্ফোরণের — তার জবাব দিলেন হিন্দু বক্তার দল : বাব্‌রি-মসজিদ ধ্বংসের প্রতিবাদ জানিয়ে। এটা 1993-এর ঘটনা। সব শেষে জানাই, অধিকাংশ গ্রামেই বাস্তুচ্যুত মুসলমান পরিবার — ঐ মনিরুদ্দি, বসির, কামালের দল জরু-গরু নিয়ে ফিরে এসেছে, যে-যার বাপ-পিতেমোর ভিটেতে। আল্লাতালার কাছে তারা তাদের হেঁদু-ভাইদের জন্য আজ মোনাজাত করে।

* * *

জানি, অন্তত আন্দাজ করতে পারি : আপনারা এবার আমাকে কী জাতীয় প্রশ্ন করবেন। আপনারা জানতে চাইবেন — ভাগলপুরে ওঁরা যা করতে পেরেছেন, তা কি আমরা এই কল্লোলিনী কলকাতা শহরে করতে পারি না? মহল্লা-মহল্লায় শান্তিরক্ষা বাহিনী গঠন করে? কস্‌বায়, বানতলায়, বিরাটীতে, রাজাবাজারে আর এইচ. এম. কলিমুদ্দীন-ছায়েবের এলাকায় সেই কী-যেন-নাম কানা গলিটার, যেখানে অনধিকার প্রবেশ করার দুর্মতি হয়েছিল ডি. সি. পোর্ট বিনোদ মেহ্‌তার?

আজ্ঞে না, জবাব আমি দেব না। ডক্‌টর খেরনারের নিষেধ আছে। যার সমস্যা সেই সমাধান করবে। ক্যাটালিটিক্ এজেন্টরা শুধু কিছু কিছু প্রশ্ন তুলে ধরতে পারে মাত্র। আর শোনাতে পারে কিছু উদ্ধৃতি :

"বন্ধু! যা খুশি হও!
পেটে-পিঠে-কাঁধে-মগজে যা খুশি পুঁথি ও কেতাব বও!
কোরান-পুরান, বেদ-বেদান্ত, বাইবেল, ত্রিপিটক
জেন্দাবেস্তা, গ্রন্থ-সাহেব, পড়ে যাও যত সখ!
কিন্তু কেন এ পণ্ডশ্রম? মগজে হানিছ শূল?
দোকানে কেন এ দর-কষাকষি? পথে ফোটে তাঁজা ফুল।
তোমাতে রয়েছে সকল কেতাব সকল কালের জ্ঞান
সকল শাস্ত্র খুঁজে পাবে সখা! খুলে দেখ নিজ প্রাণ।।"

আমি বরং তার চেয়ে আপনাদের আর একটি দাঙ্গাবিধ্বস্ত জনপদের সত্যকাহিনী শোনাই। দুঃখের কথা, এসব খবর বাঙলা পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয় না। দাঙ্গার বীভৎসতা নেই, উদ্দীপনা নেই — ও কাহিনী পাঠক 'খাবে' না। আমি এ সত্য ঘটনাটি প্রথম জেনেছিলাম আহমেদাবাদে, আমার পুত্রের বাড়িতে — একটি স্থানীয় ইংরেজি সংবাদপত্রের রবিবাসরীয়তে। পরে উদয় মুহরকর 'A Symbol of Hope' নামে একটি স্পেশাল রিপোর্ট প্রকাশ করেন 'ইন্ডিয়া টুডে'তে (15.2.1994, পৃ : 85-88)। ঘটনাটা শুনুন :

আমেদাবাদ শহরের মাইল-পঞ্চাশ উত্তরে সিদ্ধপুর একটি প্রাচীন জনপদ। একজন জৈন সন্ন্যাসী নাকি কোন্ বিস্মৃত অতীতে এখানে সিদ্ধ হয়েছিলেন। এখন ওর চল্‌তি নাম সিধ্‌পুর। লোকসংখ্যা বর্তমানে প্রায় পঞ্চাশ হাজার। একাশীর আদমসুমারীতে হিন্দু

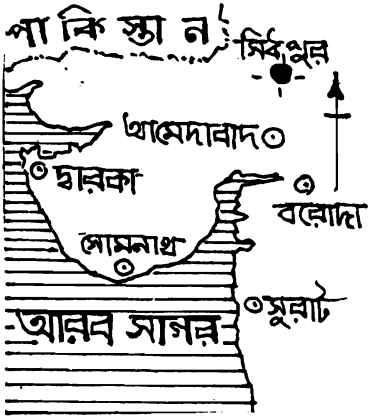

গ্রামবাসী ছিল অর্ধেকের কিছু বেশি, একানব্বইতে তারা সংখ্যায় আধাআধির কিছু কম। হিন্দু ও মুসলমান মহল্লা সুচিহ্নিত। তবে ঐ! কোথাও-কোথাও এ সম্প্রদায়ের মানুষ ওদের গাড়ুর ভিতর ঢুকে পড়েছে, কোথাও ও সম্প্রদায় সেঁদিয়েছে এদের বদনায়! গ্রামে একটি প্রাচীন মন্দির আছে, আছে একটি মস্‌জিদও। শতাব্দীর পর শতাব্দী ওরা মিলে-মিশে স্বচ্ছন্দে থাকে — তারপর কী যে হয়! হঠাৎ একদিন জ্বলে ওঠে সাম্প্রদায়িক আগুন! স্বাধীনতার পর তিন তিন বার সিধ্‌পুরে বড় জাতের দাঙ্গা হয়েছে। তার ভিতর একবার তো টানা বাইশ দিন ওখানে কার্ফু জারী রাখতে হয়েছিল, মিলিটারীর টহলদারীতে। দৈনিক দু-ঘণ্টা বাজার খুলত।

এই সিধ্‌পুরে স্বাধীনতা-উত্তরকালে চতুর্থবার বেধে গেল আবার একটি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। বাব্‌রি-মসজিদ ধূলিসাৎ হবার ঠিক পরের দিন 7.12.1992 তারিখে।

মুসলমান মহল্লা থেকে একটি উন্মত্ত জনতা আক্রমণ করল হিন্দুদের এলাকা। এরাও তৈরি ছিল। ফলে মারাত্মক কিছু ঘটল না। কিন্তু আক্রমণকারীদলের একটা দলছুট অংশ বেমক্কা পাঁচিল টপকে ঢুকে পড়ল মানুভাই দাভের ভদ্রাসনে।

দাভেরা সিধ্‌পুরের সম্ভ্রান্ত এবং সম্পন্ন বাসিন্দা। যৌথ পরিবার। ওঁরা তিনভাই। বুড়োকর্তা মানুভাই দাভে, বাহাত্তর, রাশভারী মানুষ। স্ত্রী-বিয়োগের পর ধর্মকর্ম নিয়েই থাকেন। মেজভাই ভোগীলাল, ছাপ্পান্ন ; অকৃতদার। ব্যবসাপত্র নিয়ে ব্যস্ত। সংসারের সব দায়ঝক্কি তাঁর কাঁধে। বিশেষ প্রয়োজন না হলে সংসারের কাজে তিনি দাদাকে বিব্রত করেন না। আর ছোট মহেন্দ্রভাই না-না করতে করতে এই সম্প্রতি চল্লিশ বছর বয়সে সাদি করেছে। স্বজাতির এক স্কুল-মিস্ট্রেসকে। তার স্ত্রী মীরাবাঈ সন্তান-সম্ভবা।

সেই দুর্যোগরাত্রে দাঙ্গা যখন থামল তখন দেখা গেল দাঙ্গাবাজেরা তরোয়ালের কোপে মহেন্দ্রভাইয়ের মুণ্ডুটা ঘাড় থেকে নামিয়ে দিয়ে গেছে। তার দেহটা সিঁড়ির চাতালে, মুণ্ডুটা সিঁড়ির নিচে গড়াগড়ি খাচ্ছে। একমাত্র তার গর্ভিণী স্ত্রী ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শিনী।

সিধ্‌পুরের বড় দারোগা করিৎকর্মা অফিসার। তেত্রিশ জনকে গ্রেপ্তার করে আনলেন। শুরু হল মামলা। নিম্ন আদালত তেত্রিশজনকেই দায়রায় সোপর্দ করল — অনধিকার প্রবেশ, বে-আইনী জনসমাবেশ, এবং দাঙ্গা! রায়টিং চার্জ! মাত্র দুইজনের বিরুদ্ধে 'কালপেব্‌ল্‌ হোমিসাইড' আর শেখ জলিলের বিরুদ্ধে 'ডেলিবারেট মার্ডার চার্জ'।

মামলা চলছে। মাসের পর মাস। ইতিমধ্যে মীরার একটি কন্যাসন্তান হয়েছে। মগনভাই বারোত ঐ তেত্রিশজনের অ্যাডভোকেট। মগনভাই আমেদাবাদের নামকরা উকিল। মানুভাইয়ের সমবয়সী এবং বন্ধুস্থানীয়। কিন্তু এ মামলায় তেত্রিশজন অপরাধীর পক্ষ গ্রহণ করায় ইদানীং দাভে পরিবারের সঙ্গে আর বিশেষ সদ্ভাব নেই। মগনভাই ইন্দিরা কংগ্রেসের একজন স্বনামধন্য রাজনীতিক — পূর্ববর্তী ইন্দিরা-জমানায় গুজরাটের সমবায় মন্ত্রী পর্যন্ত হয়েছিলেন। এই রাজনৈতিক প্রভাব আছে বলেই মুস্‌লিম মোড়লেরা ঐ বিধর্মীকে মামলা পরিচালনার গুরুদায়িত্বটা দিয়েছে। অবশ্য মগনভাইয়ের জুনিয়ার হিসাবে কাজ করছে তরুণ অ্যাড্‌ভোকেট উজির খান পাঠান। ঘটনাচক্রে উজিরখানের তুলো-ব্যবসায়ী বাপ্‌জানের সঙ্গে মানুভাইয়ের ব্যবসায়সূত্রে জান-পহ্‌চান আছে ; আর সেজন্য উজির খান এই দাভে পরিবারের পরিচিত। বৃদ্ধ মানুভাইকে ছেলেবেলা থেকেই সে 'আঙ্কল'-ডাকে।

মামলা এখন প্রায় অন্তিম পর্যায়ে। বাদী-প্রতিবাদী দু পক্ষেরই যাবতীয় সাক্ষীর তালিকা শেষ হয়েছে। বাকি আছে পি. পি. আর ডিফেন্স কাউন্সেলের শেষ সওয়াল। এই সময় একদিন মগনভাই বারোত সিধ্‌পুরে এলেন তাঁর মক্কেলদের সঙ্গে শেষ পরামর্শ করতে। রুদ্ধদ্বার কক্ষে বিশ্বস্ত আট-দশজন প্রথম শ্রেণীর নেতাকে ডেকে বললেন, আমি যা বুঝছি, দু-চারজন বেকসুর খালাস হলেও হতে পারে, কিন্তু প্রায় ত্রিশ জনেরই মেয়াদ হয়ে যাবে — দু-চার-ছয় মাসের জন্য। কারণ 'রায়টিং' আর অনধিকার-প্রবেশের চার্জটা প্রতিষ্ঠিত। আর আমার আশঙ্কা জলিলকে বিচারক 'গিল্‌টি' হিসাবেই রায় দেবেন। ফাঁসি হবে না মনে হয় — তবে যাবজ্জীবন ঠেকানো যাবে না!

সবাই নতমস্তকে সংবাদটা হজম করে নিল। শেষমেষ উজির খান বললে, কিন্তু স্যার, আপনি তো জানেন, তরোয়ালের কোপটা জলিল মারেনি! তার হাতে ছিল একটা ছোরা! তরোয়াল সে নিয়েই যায়নি।

মগনভাই দৃঢ় ভাবে মাথা নেড়ে বললেন, না! আমি তা জানি না। তোমরা সবাই বারে বারে সে কথা বলছ, আমি স্রেফ শুনেছি। কিন্তু মৃতের স্ত্রী দু দু-বার আইডেন্টিফিকেশন প্যারেডে জলিলকে সনাক্ত করেছে!

উজিরভাই বিরক্ত হয়ে বলে, বড়াভাই! কী বলব? মীরাবহিন দু বার ছেড়ে দুশো বার সনাক্ত করলেও যেটা মিথ্যা তা তো সত্য হয়ে যাবে না! আমি যে জানি —

জলিলের হাতে তরোয়ালটা ছিল না, জলিল কোপটা মারেনি।

— কোন যুক্তিতে একথা বলছ, উজির?

— যুক্তি-ফুক্তি বাদ দিন, স্যার! আমি যে জানি! আই নো ইট! মানে কে কোপটা মেরেছিল।

— জান? তুমি জান? কী ভাবে জেনেছ? কে সে?

— সে আমার কাছে কবুল খেয়েছে। বলেছে, যেমন করে পারেন জলিলটাকে বাঁচান, দাদা। বলেছে, ও হতভাগাটা আমাদের দলে ছিল, কিন্তু তরোয়ালটা ছিল আমার হাতে! কোপটা আমিই বসিয়েছিলাম!

মগনভাই গম্ভীরস্বরে বল্‌লেন, কে সে? আমাকে তার নাম বল?

উজির মস্‌জিদের বড়া ইমাম হাজী ইমামবক্সের দিকে তাকিয়ে দেখল। হাজী-সাহেব বললেন, সচ্ বাত! কমবক্ত্‌টা আমার কাছেও কবুল করেছে!

মগনভাই জানতে চান : সে এখন এ-ঘরে আছে?

হাজী-সাহেব তাঁর শাদা দাড়িতে হাত বুলাতে বুলাতে বলেন, মাফ্ কিজিয়ে ওকীলসাব! ইয়ে বাত ম্যয়নে নেহী কহ্ সেক্‌তা!

মগনভাই উঠে দাঁড়ালেন। বলেন, তাহলে উজির খানকেই শেষ সওয়ালটা করতে বলুন! আমাকে যখন আপনারা বিশ্বাস করতেই পারছেন না তখন আমাকে বিদায় দিন।

* * *

দিন তিনেক পরে উজির খান পাঠান এসে দেখা করল মানুভাইয়ের ভদ্রাসনে। উনি বাইরের ঘরে বসে আখ্‌বর পড়ছিলেন। আগন্তুককে দেখে কাগজটা নামিয়ে রাখলেন। উজিরখান নত হয়ে বললে, নমস্তে আঙ্কলজী! তবিয়ৎ তো ঠিক হ্যয় না?

মানুভাই দেখে নিলেন উজিরখান একা এসেছে। তার হাতে একটা বড় সুটকেস। উনি ইজিচেয়ারে শুয়েছিলেন। সোজা হয়ে বসে বললেন, আদাব অর্জ, ভকিলসাব। বৈঠিয়ে!

উজির এবার হিন্দি ছেড়ে গুজরাতি ভাষায় সবিনয়ে বললে, আপনি আমাকে চিনতে পারেননি আঙ্কেলজী! আমাকে আবার 'আপনি আজ্ঞে' কিসের? আমি সেই...ইয়ে, উজিরখান!

মানুভাই নেপথ্যের দিকে তাকিয়ে হাঁকাড় পারেন : শিউলাল!

শিউলাল উপস্থিত হলে তাকে দু-গ্লাস সরবৎ ফরমায়েশ করে আগন্তুককে বললেন, আপনাকে না-চিনব কেন ভকিলসাব? আদালতে তো কতবার দেখেছি! বলুন? কী বলতে এসেছেন?

উজির বুঝতে পারে নাতির বয়সী মানুষের সঙ্গে উনি 'আপনি-আজ্ঞে'ই করে যাবেন।

সে ইনিয়ে-বিনিয়ে অনেক যুক্তি-তর্ক দাখিল করল। হ্যাঁ, ঐ তেত্রিশজনই ওঁর ভদ্রাসনে বেআইনী প্রবেশ করেছিল, সচ বাৎ! উজীরখান পাঠান এককথায় মেনে নিচ্ছে। অন্যায় করেছে ওরা। বেঅকুফ! লেকিন বদমাস নেহি, স্রেফ বুড়বক! জামাত উলেমার উগ্রপন্থী বাঁদরগুলোর কথায় উত্তেজিত হয়ে অন্যায় করেছে! মানুভাই মহানুভব! স্বয়ং গান্ধীজীর হাতে গড়া মানুষ! সেবাগ্রামে মানুভাই বালখিল্য বাহিনীতে এককালে কাজ করেছেন, উজিরখান জানে ... আর তাছাড়া বিবেচনা করে দেখুন, জলিলের যদি ফাঁসিও হয়, তবু মহেন্দ্রভাই তো আর ফিরে আসবে না?

বৃদ্ধ এতক্ষণ তরুণ আইনজীবীর সওয়াল নির্বাক শুনে যাচ্ছিলেন। এবার শুধু বললেন, তো?

— আপনি ওদের 'মাফি' করে দিন, আঙ্কলজী! ভুল ভুলই। উত্তেজনায় এসব বেমক্কা করে বসেছে। আর সত্যিকথা বলতে কি, জলিল ঐ জঘন্য অপরাধটা করেওনি।

মনুভাই বললেন, ভকিলসাব! আপনি একটা গল্‌তি করছেন। মামলা হচ্ছে স্টেট-ভার্সেস পার্টি! আমি তো স্রেফ এফ. আই. আর. লজ করেছি; আর হাঁ, আমার বহুরানী প্রধান-সাক্ষী। সে স্বচক্ষে দেখেছে তার মরদকে তলোয়ারের কোপে দ্বিখণ্ডিত হতে! ব্যস! মামলার সঙ্গে দাভে পরিবারের এটুকুই তো সম্পর্ক। তাই নয় কি?

— জী না! আঙ্কেলজী! আপনি যদি আদালতের বাহিরে মামলাটা মিটিয়ে নিতে রাজী হন, তবে পুলিশ কেস চালাবেই না! পি.পি. সাহেব আমাকে বলেছেন, ডি. এস. পি. সাব আমাকে অ্যাশিওর করেছেন।

— আদালতের বাহিরে মামলা মিটানো! সেটা কী রকম?

উজীরখান পাঠান নতমস্তকে বললে, আমরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে চাঁদা তুলেছি! মহেন্দ্রভাইয়ের জীবন আমরা ফিরিয়ে দিতে পারব না; লেকিন মীরাবহিনের ঐ নাহ্নিমুন্নি মেয়েটার বিয়ে একদিন আপনাকে দিতে হবে। সে দায় আমাদের — ভুল করে করে ফেলা অপরাধীদের! এই সুটকেসে চার লাখ টাকা আছে, আঙ্কেলজী। বিশ বরিষ পিছে মুন্নির সাদির সময়ে তা আধা কড়োরের উপর কিছু একটা হয়ে যাবে। আপনি মামলাটা তুলে নিন।

শিউলাল এই সময় একটা কাঠের ট্রেতে দু গ্লাস সরবত নিয়ে বৈঠকখানায় প্রবেশ করে। মানুভাই উঠে দাঁড়ালেন। ভৃত্যকে বললেন, তুই এখানে দাঁড়িয়ে থাক। ভকিল সাব যদি সরবৎটা পান করেন তো ভাল, না হলে ঐ নর্দমায় ঢেলে দিস্! উনি চলে গেলে সদর বন্ধ করে দিবি। আমি পূজাঘরে যাচ্ছি ...

উজীরখান পাঠানও উঠে দাঁড়ায়। বলে আঙ্কেলজী! একটা কথা বলে যান শুধু। চার লাখ টাকার অঙ্কটা কি ভুলে কম ধরেছি?

বৃদ্ধ টল্‌তে টল্‌তে দ্বার পর্যন্ত চলে গিয়েছিলেন। এ কথায় ঘুরে দাঁড়ালেন। বললেন, ভকিলসাব! জিন্দেগীভর হান্ড্রেড-কাউন্ট সুতোই কেনা-বেচা করেছি। ভ্রাতৃরক্তের বাজারদর তো আমার জানা নেই! মুঝে মাফ কিয়া যায়!

* * *

পরদিন সকালে আহমেদাবাদ থেকে অ্যাডভোকেট মগনভাই এসে হাজির হলেন তাঁর মারুতি-সুজুকি চালিয়ে। একা। আগের রাত্রেই সিধ্‌পুর থেকে ওঁর মক্কেলের দল উজীরখানকে মুখপাত্র করে তাঁর সাথে গিয়ে দেখা করেছে, মানুভাই চারলক্ষ টাকা খেশারত প্রত্যাখ্যান করায়।

মানুভাই দাভে তাঁর বহুদিনের পরিচিত অ্যাডভোকেট বন্ধুকে সাদরে আপ্যায়ন করে বসালেন। মগনভাই বোঝাতে থাকেন সিধ্‌পুরে আবার নতুন করে একটা দাঙ্গা বাধার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। বিজেপি লীডার গিরীশ থাকারে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের জনাদুয়েক নেতাকে সঙ্গে নিয়ে এসে থানা গেড়েছেন, ওদিকে জামায়েত উলেমার কয়েকজন নেতাও এসে হাজির। মগনভাই আরও বললেন, দাঙ্গাটা এবার হিন্দু-মুসলিমের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না — সেটা হয়তো হতে বসেছে সিয়া-সুন্নির দাঙ্গা!

— বহ্‌ কৈসে?

মগনভাই বুঝিয়ে বলেন, মীরা বহুরানী গল্‌তি আদমীকে সনাক্ত করেছে। জলিল খুনটা আদৌ করেনি। তার হাতে তরোয়াল ছিলই না। যে খুনটা বাস্তবে করেছে সে মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছে। ইতিমধ্যেই অনেকের কাছে কবুল করে বসে আছে। মুশ্‌কিল এই যে, জলিল হচ্ছে সিয়া সম্প্রদায়ের আর ঐ গাড়োলটা সুন্নি। ফলে এখন মুস্‌লিম সম্প্রদায়ের ভিতরেই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধার উপক্রম।

মানুভাই সে কথায় কান না দিয়ে বললেন, তুমি ঠিক জান? জলিল তরোয়ালের কোপটা মারেনি?

— হরগিজ!

— কে করেছে তাও জান?

— এতদিন জানতাম না, গতকাল রাত্রে কমবক্ত্‌টা আমার কাছে নিজ মুখে কবুল করেছে। সাতাশ-আঠাশ বছরের একটা নওজোয়ান। পড়ি-লিখি আদমী, লেকিন আহাম্মক! বেওকুফটা একটা সাদিও করেছে বছরখানেক আগে!

মানুভাই একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিলেন একটি প্রস্তরনির্মিত মূর্তির দিকে। ওঁর বাইরের ঘরের কুলুঙ্গিতে সমভঙ্গে দণ্ডায়মান আদিনাথ বা ঋষভনাথের শ্বেতপাথরের মূর্তিটি। হঠাৎ উনি সোজা হয়ে উঠে বসলেন। বললেন, মগনভাই! একটিমাত্র শর্তে আমি মামলা তুলে নিতে রাজি আছি।

— কী শর্ত?

— মিউনিসিপ্যালিটির অফিসটা দুই মহল্লার মাঝামাঝি। আজই বেলা দুটোর সময় আমি ওখানে যাব। বহুরানীকে সাথে নিয়েই যাব। ওদেরও আসতে বল। সর্বসমক্ষে প্রকৃত খুনী আমার বহুরানীর কাছে করজোড়ে মার্জনা চাইবে। আর আমি তার শাস্তির বিধান করব। ব্যস্!

মগনভাই সবিস্ময়ে বলেন, কী শাস্তি?

— ঘাবড়াচ্ছ কেন মগনভাই, আমি জজ-সাহেব নই। প্রাণদণ্ড বা কারাদণ্ড দেওয়ার এক্তিয়ার আমার নেই! এই বুড়োর হাতের একটা থাপ্পড় কি সইতে পারবে না সাতাশ বছরের নওজোয়ান?

মগনভাই বললেন, না। তা নয়! তবে কথা হচ্ছে সর্বসমক্ষে কবুল করার কথা উঠ্ছে কি না! 'মার্ডার চার্জ' বলে কথা!

— ব্যস্! বহুৎ খুব! আমার শেষ কথা বলেছি। এখন তোমরা যা ভাল বোঝ।

* * *

বৃদ্ধ মানুভাই দাভের এই আজব শর্তটার কথা দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ল সিধ্পুরে। মহল্লা থেকে মহল্লায়। জামাত উলেমার নেতার ঘোর আপত্তি ছিল ; কিন্তু স্থানীয় মুসলিম নেতৃবৃন্দ সে কথা শুনলেন না। বেলা দুটোর কিছু আগে শ্বেতাম্বরা বিধবাকে নিয়ে মানুভাই আর ভোগীলাল যখন মিউনিসিপ্যাল অফিসে এসে পৌঁছালেন তখন সেখানে লোকে লোকারণ্য। এস. ডি. পি. ও. কোথা থেকে খবর পেয়ে এক প্লেটুন পুলিশ নিয়ে এসে মিউনিসিপ্যালিটিটা ঘিরে ফেলেছেন। মাইক্রোফোন বসানো হয়েছে জনতা নিয়ন্ত্রণের জন্য।

লোকজনকে ভিতরে যেতে দেওয়া হয়নি তা বলে। সংলগ্ন ফুটবল মাঠটায় শুধু মানুষ মানুষ আর মানুষ। হিন্দু-মুসলমান। পৃথক পৃথক জমায়েত! মিউনিসিপ্যালটির চেয়ারম্যান-সাহেব এগিয়ে এসে ওঁদের তিনজনকে মিটিং রুমে নিয়ে গিয়ে বসালেন। শহরের জনাবিশেক বিশিষ্ট মানুষ সেখানে উপস্থিত। এ দলের এবং ও-দলের। তদুপরি এস. ডি. পি. ও., সভাধিপতি, বি. ডি. ও. এবং এস. ডি. ও.।

মাথায় আধো-ঘোমটা দিয়ে সদ্যোবিধবা মীরাবাঈ তার ভাশুরের পাশের সীটে এসে বসল। অ্যাডভোকেট মগনভাই এগিয়ে এসে বললেন, বহুমা! তোমাকে একটু কষ্ট করে আমার সঙ্গে আসতে হবে। এস।

মীরাবাঈ প্রশ্নটা পেশ করার আগেই মানুভাই জানতে চাইলেন : কোথায়? কেন?

— পাশের ঘরে একটি বোরখাপরা মুসলমান সদ্যবিবাহিতা বধূ বসে আছে। তার স্বামীই এসেছে কবুল খেতে। মীরা-মা রাজী হলে মেয়েটি মীরাকে জনান্তিকে কিছু

বৃদ্ধ টল্‌তে টল্‌তে দ্বার পর্যন্ত চলে গিয়েছিলেন। এ কথায় ঘুরে দাঁড়ালেন। বললেন, ভকিলসাব! জিন্দেগীভর হান্ড্রেড-কাউন্ট সুতোই কেনা-বেচা করেছি। ভ্রাতৃরক্তের বাজারদর তো আমার জানা নেই! মুঝে মাফ কিয়া যায়!

* * *

পরদিন সকালে আহমেদাবাদ থেকে অ্যাডভোকেট মগনভাই এসে হাজির হলেন তাঁর মারুতি-সুজুকি চালিয়ে। একা। আগের রাত্রেই সিধ্‌পুর থেকে ওঁর মক্কেলের দল উজীরখানকে মুখপাত্র করে তাঁর সাথে গিয়ে দেখা করেছে, মানুভাই চারলক্ষ টাকা খেশারত প্রত্যাখ্যান করায়।

মানুভাই দাভে তাঁর বহুদিনের পরিচিত অ্যাডভোকেট বন্ধুকে সাদরে আপ্যায়ন করে বসালেন। মগনভাই বোঝাতে থাকেন সিধ্‌পুরে আবার নতুন করে একটা দাঙ্গা বাধার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। বিজেপি লীডার গিরীশ থাকারে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের জনাদুয়েক নেতাকে সঙ্গে নিয়ে এসে থানা গেড়েছেন, ওদিকে জামায়েত উলেমার কয়েকজন নেতাও এসে হাজির। মগনভাই আরও বললেন, দাঙ্গাটা এবার হিন্দু-মুসলিমের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না — সেটা হয়তো হতে বসেছে সিয়া-সুন্নির দাঙ্গা!

— বহ্‌ কৈসে?

মগনভাই বুঝিয়ে বলেন, মীরা বহুরানী গল্‌তি আদমীকে সনাক্ত করেছে। জলিল খুনটা আদৌ করেনি। তার হাতে তরোয়াল ছিলই না। যে খুনটা বাস্তবে করেছে সে মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছে। ইতিমধ্যেই অনেকের কাছে কবুল করে বসে আছে। মুশ্‌কিল এই যে, জলিল হচ্ছে সিয়া সম্প্রদায়ের আর ঐ গাড়োলটা সুন্নি। ফলে এখন মুস্‌লিম সম্প্রদায়ের ভিতরেই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধার উপক্রম।

মানুভাই সে কথায় কান না দিয়ে বললেন, তুমি ঠিক জান? জলিল তরোয়ালের কোপটা মারেনি?

— হরগিজ!

— কে করেছে তাও জান?

— এতদিন জানতাম না, গতকাল রাত্রে কমবক্ত্‌টা আমার কাছে নিজ মুখে কবুল করেছে। সাতাশ-আঠাশ বছরের একটা নওজোয়ান। পড়ি-লিখি আদমী, লেকিন আহাম্মক! বেওকুফটা একটা সাদিও করেছে বছরখানেক আগে!

মানুভাই একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিলেন একটি প্রস্তরনির্মিত মূর্তির দিকে। ওঁর বাইরের ঘরের কুলুঙ্গিতে সমভঙ্গে দণ্ডায়মান আদিনাথ বা ঋষভনাথের শ্বেতপাথরের মূর্তিটি। হঠাৎ উনি সোজা হয়ে উঠে বসলেন। বললেন, মগনভাই! একটিমাত্র শর্তে আমি মামলা তুলে নিতে রাজি আছি।

— কী শর্ত?

— মিউনিসিপ্যালিটির অফিসটা দুই মহল্লার মাঝামাঝি। আজই বেলা দুটোর সময় আমি ওখানে যাব। বহুরানীকে সাথে নিয়েই যাব। ওদেরও আসতে বল। সর্বসমক্ষে প্রকৃত খুনী আমার বহুরানীর কাছে করজোড়ে মার্জনা চাইবে। আর আমি তার শাস্তির বিধান করব। ব্যস্!

মগনভাই সবিস্ময়ে বলেন, কী শাস্তি?

— ঘাবড়াচ্ছ কেন মগনভাই, আমি জজ-সাহেব নই। প্রাণদণ্ড বা কারাদণ্ড দেওয়ার এক্তিয়ার আমার নেই! এই বুড়োর হাতের একটা থাপ্পড় কি সইতে পারবে না সাতাশ বছরের নওজোয়ান?

মগনভাই বললেন, না। তা নয়! তবে কথা হচ্ছে সর্বসমক্ষে কবুল করার কথা উঠ্‌ছে কি না! 'মার্ডার চার্জ' বলে কথা!

— ব্যস্! বহুৎ খুব! আমার শেষ কথা বলেছি। এখন তোমরা যা ভাল বোঝ।

* * *

বৃদ্ধ মানুভাই দাভের এই আজব শর্তটার কথা দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ল সিধ্‌পুরে। মহল্লা থেকে মহল্লায়। জামাত উলেমার নেতার ঘোর আপত্তি ছিল ; কিন্তু স্থানীয় মুসলিম নেতৃবৃন্দ সে কথা শুনলেন না। বেলা দুটোর কিছু আগে শ্বেতাম্বরা বিধবাকে নিয়ে মানুভাই আর ভোগীলাল যখন মিউনিসিপ্যাল অফিসে এসে পৌঁছালেন তখন সেখানে লোকে লোকারণ্য। এস. ডি. পি. ও. কোথা থেকে খবর পেয়ে এক প্লেটুন পুলিশ নিয়ে এসে মিউনিসিপ্যালিটিটা ঘিরে ফেলেছেন। মাইক্রোফোন বসানো হয়েছে জনতা নিয়ন্ত্রণের জন্য।

লোকজনকে ভিতরে যেতে দেওয়া হয়নি তা বলে। সংলগ্ন ফুটবল মাঠটায় শুধু মানুষ মানুষ আর মানুষ। হিন্দু-মুসলমান। পৃথক পৃথক জমায়েত! মিউনিসিপ্যালটির চেয়ারম্যান-সাহেব এগিয়ে এসে ওঁদের তিনজনকে মিটিং রুমে নিয়ে গিয়ে বসালেন। শহরের জনাবিশেক বিশিষ্ট মানুষ সেখানে উপস্থিত। এ দলের এবং ও-দলের। তদুপরি এস. ডি. পি. ও., সভাধিপতি, বি. ডি. ও. এবং এস. ডি. ও.।

মাথায় আধো-ঘোমটা দিয়ে সদ্যোবিধবা মীরাবাঈ তার ভাশুরের পাশের সীটে এসে বসল। অ্যাডভোকেট মগনভাই এগিয়ে এসে বললেন, বহুমা! তোমাকে একটু কষ্ট করে আমার সঙ্গে আসতে হবে। এস।

মীরাবাঈ প্রশ্নটা পেশ করার আগেই মানুভাই জানতে চাইলেন : কোথায়? কেন?

— পাশের ঘরে একটি বোরখাপরা মুসলমান সদ্যবিবাহিতা বধূ বসে আছে। তার স্বামীই এসেছে কবুল খেতে। মীরা-মা রাজী হলে মেয়েটি মীরাকে জনান্তিকে কিছু

বলতে চায়! এ-ঘরে সর্বসমক্ষে সে আসতে পারে না।

মানুভাইয়ের সম্ভবত আপত্তি ছিল ; কিন্তু সেটা দাখিল করার আগেই প্রাক্তন স্কুল-টীচার সপ্রতিভভাবে মগনভাইকে বললে, চলুন!

মিনিটদশেক পরে মীরাবাঈ এঘরে ফিরে এল। বসল তার আসনে।

জামাত উলেমার এক বৃদ্ধ নেতা উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আস্‌সালামু আলাই কুম মানুভাই দাভেজী, ঔর ভোগীলাল দাভেজী ...

মানুভাই ধমকে ওঠেন : আপনি থামুন! আপনি সিধ্‌পুরের বাসিন্দা নন! হাজী-সাহেবের কিছু বক্তব্য আছে? তাহলে বলুন?

মস্‌জিদের বড়-ইমাম হাজী-সাহেব বলেন, জী! আপনি যা চেয়েছেন আমরা তাতে রাজী হয়েছি। অপরাধটা যে করেছে সে সর্বসমক্ষে কবুল খাবে। আপনার কাছে মার্জনা চাইবে। আপনি অনুমতি করলে তাকে এখানে হাজির করি।

মানুভাই বললেন, করুন। তবে, ওকে বলে দিন মাফিটা চাইতে হবে আমার বহুরানীমার কাছে। আমি তাকে মাফ করব এ-কথা তো বলিনি। বরং বলেছি আমি তার শাস্তির বিধান করব।

বড়া-ইমাম সাহেব গ্রীবাভঙ্গি করলেন এস. ডি. ও. সাহেবের দিকে ফিরে। তিনি ইঙ্গিত করলেন এস. ডি. পি. ও.-কে। একজন ইউনিফর্মধারী পুলিশ এগিয়ে এসে খুলে দিল পাশের একটা দরজা। কাঁপতে কাঁপতে তা-থেকে বার হয়ে এল একজন আতঙ্কতাড়িত মানুষ। শীর্ণ ও খর্বকায়। একমুখ খোঁচা-খোঁচা দাড়ি। পরনে কুর্তা-পায়জামা। পায়ে ছিন্ন চপ্পল! চোখে বাণবিদ্ধ হরিণের আর্তি। ওর ঠোঁট দুটো থরথর করে কাঁপছে। তার পিছনে একটি তরুণী। আপাদমস্তক বোরখায় ঢাকা।

বড়া-ইমাম বললেন, আল্লাহ্‌ কসম, বড়া ভাই। জলিল নেহী। ইয়ে কম্‌বক্তনে ...

লোকটা কাঁপতে কাঁপতে হঠাৎ বসে পড়ল। চেয়ারে নয়। মাটিতে। নতজানু ভঙ্গিতে। যুক্তকর বাড়িয়ে ধরল মানুভাই দাভের দিকে।

বড়া-ইমাম বললেন, বহ্‌ কমবক্তকা নাম ...

একটা হাত সামনের দিয়ে বাড়িয়ে মানুভাই তাঁকে থামতে বললেন। বড়া-ইমাম মধ্যপথেই থেমে গেলেন। হা-হা করে কেঁদে উঠ্‌ল নতজানু লোকটা! মাটিতে মাথা ঠেকালো!

মানুভাই তাঁর পাশে-বসা ভ্রাতৃবধূর দিকে ফিরে বললেন, ক্যা রে বহুমাঈ? তু নে ইস্‌কো ...

দু-হাতে মুখ ঢেকে মীরা হু-হু করে কেঁদে ফেলল : জী।

মানুভাই উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, বহুৎ খুব!

চুলের মুঠি ধরে টেনে তুললেন ভূলুণ্ঠিত মানুষটাকে। বললেন, কা রে? পড়ি-লিখি আদমি হ্যায় তু?

চোখের জলে ভাসতে ভাসতে লোকটা বললে, জী।

— মহাত্মাজী কো আত্মজীবনী পড়া হ্যয় তুনে?

দুদিকে মাথা নেড়ে লোকটা অস্বীকার করল।

— যা, ঘর যা! বহ্-কিতাব পড়না! যা — তুঝে মাফ কর দিয়া!

* * *

সিধ্‌পুরে মানুভাই দাভের পরিচয় আজ : 'বাপুজী'! কী হিন্দু, কী মুসলমান! এতবড় সম্মান কজন পায়? জলিলকে মিথ্যা মামলা থেকে রক্ষা করতে যে তহবিলটা গঠিত হয়েছিল তাতে হিন্দু-বর্ধিষ্ণু গ্রামবাসীরাও চাঁদা দিয়েছেন। একটা 'সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ট্রাস্ট' গড়ে উঠেছে। তার উদ্বোধন যিনি করতে এলেন তিনি না হিন্দু, না মুসলমান। তিনি বিখ্যাত সাংবাদিক খুশবন্ত্ সিং। 'ইন্ডিয়া টুডে'-র ঐ সংখ্যায় তাঁর ছবি ছাপা হয়েছে মানুভাইয়ের সঙ্গে।

সম্প্রীতি তহবিলের অর্থে মন্দির-মসজিদ দুটোই মেরামত করা হয়েছে। রঙ ফেরানো হয়েছে। যেসব হিন্দু-মুসলমান পরিবার দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল তাদের সাহায্য করা হয়েছে। একজোড়া দুঃখের কথা : বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও জামাত উলেমার স্থানীয় শাখার অফিস দুটি ঐ গ্রাম থেকে উঠে গেছে!

উদ্বোধনের দিন খুশবন্ত সিং খুশবন্ত হয়ে বলেছিলেন, "It has proved that Gandhiji's spirit is not really dead." [এটা প্রমাণ হল যে, গান্ধীজীর মূলনীতির অন্তিম সমাধি হয়নি]

অ্যাডভোকেট মগনভাই বারোত তাঁর ভাষণে বলেছিলেন, "One just can't believe that such a thing can happen in reality. It is just a miracle! And if only such incidents were to get replicated in many of our communally sensitive towns, the monster would indeed vanish." [বাস্তবে এমন ঘটনা যে ঘটতে পারে তা যেন বিশ্বাসই হতে চায় না। এ যেন আধিদৈবিক এক অলৌকিক কাণ্ড! আর এমন ঘটনা যদি আমাদের অন্যান্য সাম্প্রদায়িক স্পর্শকাতর শহরগুলিতে ক্রমান্বয়ে ঘটতে থাকে তাহলে ঐ দৈত্যটা হাওয়ায় মিলিয়ে যাবে।]

মানুভাইয়ের যুক্তি ছিল সারল্যে ভরা, "If attitudes are to undergo change then one has to set a precedent. If it is in the benefit of mankind, one has to make a beginning. In this particular case, I did it. Nothing more." [যদি দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়

তাহলে একটা উদাহরণ দিয়েই তো আরম্ভ করতে হবে। যদি সেই পরিবর্তনে গোটা মনুষ্যজাতির উপকার হয় তাহলে একজনকে সেটা শুরু করতে হবে। এ ক্ষেত্রে আমিই সেটা করেছি। এর চেয়ে বেশি কিছু নয়।]

* * *

আপনাদের প্রশ্নটা ভুলিনি : ভাগ্‌লপুরে যা ঘটেছে। এবং এবার তাতে যোগ দিতে হবে — সিধ্‌পুরে যা ঘটল — তা কি এই কল্লোলিনী কলকাতায় ঘটানো একেবারেই অসম্ভব? এখানকার কসবায়? বানতলায়? বিরাটিতে? কলাবাগান বস্তিতে কিংবা আলোয়-আলো সেই ফ্যান্সিমার্কেটের কালোবাজারী কালো গলিটায়, সেই যেখানে অনধিকার প্রবেশের দুঃসাহস দেখিয়েছিল একজন আনমোল অফিসার : বিনোদ মেহ্‌তা?

হ্যাঁ, সম্ভব!

আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি ওটাও জানি। আপনি প্রতিবাদে কী বলতে চান!

এখানে পাড়ায় পাড়ায় জোয়ান ছেলেগুলোকে রাজনীতি-ব্যবসায়ীর ছড়িদারেরা দাদন দিয়ে কিনে রেখেছে। লাল-নীল-নাতিলাল-সবুজ-গেরুয়া পার্টির ছড়িদারেরা। ছেলেগুলোর ক্লাবঘর টালি দিয়ে ছেয়ে দিয়েছে, ভলিবলের নেট কিনে দিয়েছে, 'সরস্‌সতি-বিস্‌স্‌কম্মা, কালী, গনেস্‌', পূজোর ধুয়ো তুলে দিবারাত্রি মাইকে হিন্দি ফিল্‌মি গানা বাজিয়ে সপ্তাহব্যাপী ডিস্‌কো নাচের ঢালাও পার্মিশান দিয়ে রেখেছে। ওরা সবাই আপনার-আমার অতি নিকট-আত্মীয়! অন্তত ছিল — বিবেক বিকিয়ে দেবার আগে। কারও ভাই, কারও সন্তান, কারো দাদা, কারও বাবা-কাকা। এখন আর ওরা আমাদের চিনতে পারে না। ওদের পরিচয় এখন : লাল-নীল-সবুজ-গেরুয়া পার্টির ক্যাডার। সমাজের প্রতিটি রন্ধ্রে রাজনীতি-ব্যবসায়ীদের ছড়িদারেরা নাক গলিয়ে বসে আছে। এই তো সেদিন, রাস্তায় চল্‌তে চল্‌তে চটিটা বেমক্কা ছিঁড়ে গেল। সেটা মেরামত করাচ্ছি ; এমন সময় কে যেন চিৎকার করতে করতে বলে গেল : ভাগো! ভাগো! হল্লা আ-গয়া।

'হল্লা' — অর্থাৎ পুলিশের স্পেশাল-ডিউটি ভ্যান। ফুটপাতের বেআইনি দোকান ভাঙতে। আমি ঐ চর্মব্যবসায়ীকে বলি, ঠিক আছে ভাই, চটিটা ফেরত দাও! ঐ শোন 'হল্লা' এসে গেছে —

লোকটা স্মিত হেসে আমাকে অভয় দিল, ডরিয়ে মৎ, বাবুজী! হল্লা হমাকে কুছু বোলিবে না! হমার পারমিট আছে!

বুঝুন! পার্টি ফান্ডে কিছু আর মস্তানের হাতে কিছু নগদ আদায় দিয়ে ফুটপাত-দখলের বেআইনি অনুমতি ও নিয়ে রেখেছে।

স্কুল-কলেজ-হাসপাতালে কাউকে ভর্তি করাতে হলে, মায় বাজারে একটা চটের

পাল বিছিয়ে ঝিঙে-উচ্ছে-পটল বেচতে চাইলে আপনাকে পার্টি ফান্ডে টাকা দিতে হবে। যখন যে-পার্টি গদিতে। অথবা হয়তো পাড়ার দখলদার : বিরোধীদলের চাঁই! কোথায় যাবেন?

মানছি। তবু 'এ দেশের কিস্‌সু হবে না' বলে অন্তিম ফতোয়া জারী করার আগে বুকে হাত দিয়ে একবার বলুন তো — আপনার প্রতিবেশীর সঙ্গে, সারা পৃথিবীর আর পাঁচটা উন্নতিশীল দেশের সঙ্গে আপনি নিজের দেশের অবস্থাটা কোনদিন তুলনা করে দেখেছেন?

আপনার পুবে তস্‌লিমা নাসরিন 'লজ্জা' পেয়েছেন। এজন্য তাঁর ছিন্ন মুণ্ডু দাবী করা হয়েছে। তিনি পালিয়ে বেঁচেছেন। সেখানেই শেষ নয়! সেখানকার আর একজন নারীবাদী আন্দোলনের প্রথম সারির নেত্রী 'বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট পার্টি'র সাংসদ ফরিদা রহমানের মুণ্ডু নিয়ে গেণ্ডুয়া খেলতে চান মৌলবাদীরা। সম্মিলিত সংগ্রাম পরিষদ জোট। ফরিদার অপরাধটা কী? প্রথম, তিনি সংসদে একটি বিল এনেছিলেন পুরুষদের বহুবিবাহ রোধ করার প্রস্তাব; দ্বিতীয়ত ইদানীং পৈতৃক সম্পত্তিতে মেয়েদের সমানাধিকার দাবি তুলেছেন। তার সঙ্গে তুলনা করুন ভারতের। এখানে শাহবানু সুপ্রীম কোর্টে মামলা জেতার অপরাধে কেউ তার মুণ্ডু নিয়ে গেণ্ডুয়া খেলতে চায়নি। প্রধানমন্ত্রী শুধু সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতার সুযোগে শাহবানুর জেতা মামলাটা হারিয়ে দিয়েছিলেন! ব্যস! নাথিং মোর!

আপনার পশ্চিমে দেখুন — পাকিস্তানে বা মধ্যপ্রাচ্যের মুসলমান-অধ্যুষিত রাষ্ট্রে — মস্‌জিদের ভিতর প্রার্থনারত সিয়াদের সুন্নিরা, সুন্নিদের সিয়ারা ক্রমাগত মেশিনগান চালিয়ে হত্যা করে চলেছে। নিশ্চয় জানেন, ভারতবর্ষ হচ্ছে এমন একটি রাষ্ট্র যেখানে মুসলমান ধর্মাবলম্বীর সংখ্যা পৃথিবীতে সর্বোচ্চ। কই এখানে তো সিয়া-সুন্নির বিরোধ সেভাবে দানা বেঁধে ওঠেনি? কোন মন্দিরে প্রার্থনারত বৈষ্ণবদের শাক্তরা অথবা শৈবদের গাণপতরা ওভাবে হত্যা করছে?

প্রতিটি উন্নতিশীল দেশের রাষ্ট্রনায়কেরা বিশ্বাস করেন — রাজ্যের বুদ্ধিজীবীর দল অশ্ব অথবা অশ্বতর জীব। তাই শিল্পীদের জন্য দুই-জাতির ব্যবস্থা রাখা আছে : গাজর অথবা চাবুক! 'আইদার ক্যারট অর হুইপ।' আপনার পুবে, আপনার পশ্চিমে দেখুন : গাজরের চাষ ওখানে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। চাবুক চালানোর চেয়ে মুণ্ডু নিয়ে গেণ্ডুয়া খেলতে তাঁরা ক্রমশ বেশি অভ্যস্ত হয়ে পড়ছেন। তুলনায় : ভারতে? বুদ্ধিজীবীদের মুণ্ডু নিয়ে গেণ্ডুয়া খেলার কোনও প্রশ্নই ওঠেনি (নক্‌শাল-আন্দোলন শুধুমাত্র বুদ্ধিজীবীদের নয়)। এখানে শুধুই গাজরের প্রদর্শনী। প্রায় প্রতিটি রাজ্যে, কেন্দ্রে তো বটেই এবং ঐ কেন্দ্র-রাজ্য সরকারকে গদিতে বসানোর জন্য যাঁরা মদত দিয়ে থাকেন

সেই শিল্পপতিরা, নানান জাতের রাঙামূলো ঝুলিয়ে রেখেছেন। মুষ্টিমেয় ব্যতিক্রমকে বাদ দিলে বাকি শিল্পীর দল *আবোলতাবোলে* চিত্রিত 'খুড়োর কলের' প্রতিযোগীর ভঙ্গিতে পাঁচঘণ্টার পথ আধঘণ্টায় অতিক্রম করে যাচ্ছেন।

ম্যাডাম এমার্জেন্সি ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গে 'গুঙ্গা' বলে লাফ দিয়ে উঠেছিলেন ভারতীয় চিত্রশিল্পে চাটুকারিতার ইতিহাসে সর্বকালীন শ্রেষ্ঠচাম্‌চা শিল্পী : মকবুল ফিদা হুসেন। দেশের যাবতীয় সংবাদপত্র, সংবাদ-মিডিয়া, শিল্পী, সাহিত্যিক ও সাধারণ মানুষ যখন স্বাধীন ভারতবাসীর বাকরুদ্ধ করায় বিক্ষুব্ধ — স্টেটস্‌ম্যান প্রতিদিন 'ব্ল্যাঙ্ক-এডিটোরিয়াল স্পেস' দিয়ে কাগজ ছাপছে, বন্ধুবর গৌর ঘোষ যখন 'আমাকে বল্‌তে দাও' বলার অপরাধে জেল খাটছে — তখন এই 'চরম চাটুকার চাম্‌চে'টি বসে গেছেন ইন্দিরাজীকে দশভুজা দুর্গায় রূপান্তরিত করে ছবি আঁকতে। সেই সুবাদে কংগ্রেস মহলে, কংগ্রেস-প্রসাদধন্য শিল্পগোষ্ঠী মহলে, এবং কিছু কিছু বুর্জোয়া শ্রেণীর সংবাদপত্র গোষ্ঠীর মূল্যায়নে ফিদা হুসেন আজও : ভারতের পিকাসো!

'ইন্দিরা ইজ ইন্ডিয়া'

কিন্তু মাপ করবেন, এ-কথা বলা যাবে না যে, সব শিল্পীই সে আঘাতে যোগভ্রষ্ট হয়েছিলেন। যাঁরা হননি তাঁরা যা ভাবছেন, শিল্পে তা তুলে ধরছেন। এবং সেই মুক্তচিন্তার আদর আছে এদেশে। মৌলবাদীরা এ দেশেও আছেন ; কিন্তু তাঁরা এত ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠেননি যে রাজ্য সরকার বা কেন্দ্রীয় সরকারকে বাধ্য করবেন ঐ সব মুক্তচিন্তার মানুষের গলা টিপে ধরতে। ভারতের মতো বাক-স্বাধীনতা আজ কোন্ উন্নতিশীল রাষ্ট্রে বর্তমান? এই তৃতীয় বিশ্বে? তাহলে এখনই হতাশ হচ্ছেন কেন?

ভারতের দূরদর্শনে — না সরকারী চ্যানেলে নয়, বেসরকারী প্রযোজনায়—আমরা 'আজ কি আদালত' দেখছি। 'চক্রব্যূহ' দেখছি। এ জাতীয় প্রোগ্রাম কোথায় হচ্ছে তৃতীয় বিশ্বে? এদেশের চলচ্চিত্র-পরিচালক যেসব রাজনীতি-ব্যবসায়ীর অপকীর্তির কথা নির্ভয়ে জনসমক্ষে উপস্থিত করছেন তা কি আমাদের প্রতিবেশী-রাজ্যে সম্ভব? 'মিরচ-মশলা'-র সেই পিশাচপ্রতিম দারোগা আর বশংবদ সরপঞ্চ, 'আদালত ও একটি মেয়ে'-র সেই অপদার্থ পুত্রের পিতা এবং সৎ পুলিশ অফিসার, তা কি অসামান্য নয়? 'প্রহার', 'অর্ধসত্য', বিশেষ করে 'আয়ুধ'-এর সেই অন্তিম দৃশ্যটি : যেখানে নানা পটেকর খুনী মুখ্যমন্ত্রীর জামার কলার ধরে হিঁচড়াতে হিঁচড়াতে প্রকাশ্য রাস্তায় নিয়ে আসছে, তাকে দিয়ে কবুল করাচ্ছে, তার পর মুখ্যমন্ত্রীকে পথকুক্কুরের মতো হত্যা করে আত্মঘাতী হচ্ছে! এ ছবি তো আপনি ভারতে বসেই দেখেছেন? দেখেননি?

স্বীকার করি : অধিকাংশ বুদ্ধিজীবীই রাঙামূলোর লোভে বেএক্তিয়ার। লাল-নীল-গেরুয়া-সবুজ পার্টির প্রসাদপুষ্ট পাদুকাবাহী! কেউ গদি আসীনের, কেউ গদি-লোভীর, অনেকে বড় বড় শিল্পপতি অথবা বণিকশ্রেণীর আশীর্বাদধন্য। এমন ক্ষেত্রে এতকাল যেসব সাংবাদিক ও সাহিত্যিক প্রতিবাদ জানিয়ে এসেছেন সেই — হরিশ মুখুজ্জে, বঙ্কিম, রামানন্দ, সুরেশচন্দ্র, মতিলালদের উত্তরপুরুষেরাও আজ — কী অপরিসীম দুঃখের-কথা : ঐ বণিকশ্রেণীর বিজ্ঞাপনের লোভে আদর্শভ্রষ্ট! তাঁরাও চাইছেন : যা চল্‌ছে তাই চলুক। টি. ভি.-তে ক্রমাগত ঢিসম্ ঢিসম্ মারদাঙ্গা এবং মিনিস্কার্টধন্যাদের নিতম্বান্দোলনসমৃদ্ধ ডিস্‌কো নাচ! পাড়ায়-পাড়ায় 'বিস্‌সকম্মা, সরস্‌সতি' কিংবা ইদানীং 'গণেস্' পূজায় সপ্তাহব্যাপী দিবারাত্র লাউডস্পীকারে : 'চোলিকা পিছে ক্যা হ্যয়?'

মানছি! তবু আজও বিশ্বাস করি : 'মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ।' স্বচক্ষে দেখছি তো ঐ দুঃসাহসিক চিত্র-পরিচালকদের, গ্রুপ-থিয়েটারের সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিবাদ, লিট্‌ল্ ম্যাগাজিনের আর্তি এবং ব্যতিক্রম লেখকগোষ্ঠীর দৃঢ় প্রতিবাদ। মৌলবাদের বিরুদ্ধে আজিজুল লিখছেন : '*মনু মহম্মদ হিটলার*'। সম্প্রতি পড়লাম : *বকুল* বিশ্বাসের দুঃসাহসিক সংগ্রামের ইতিকথা : '*বকুল*'!

তিনবছর আগে বানতলা-বিরাটী-তিলজলার অব্যবহিত পরে যখন রচনা করেছিলাম '*এমনটা তো হয়েই থাকে*' তখন মনে হয়েছিল এ নীরন্ধ্র অন্ধকারের ওপারে সূর্যোদয়ের সূচনা দেখে যাবার সৌভাগ্য এ জীবনে হয় তো হবে না। আজ মনে হচ্ছে : নিষ্প্রভাত রাত্রি হয় না। আর আমিও আপনাদের সঙ্গে রামকেলি গাইবার সুযোগ পাব!

ইতিপূর্বেই শুনিয়েছি, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বেধে যাবার কয়েক বছর আগে এক সাংবাদিক সম্মেলনে জবাওহরলালজী বলেছিলেন, "আমি বিশ্বাস করি পৃথিবীর সামনে আজ মাত্র

দুটি পথ খোলা আছে — হয় ফ্যাসিজম, নয় কম্যুনিজম।...এছাড়া দুনিয়ার সামনে আর কোন পথ নেই — একটিকে মেনে নিতেই হবে।"

এবার বলি : সুভাষচন্দ্র সে-কথা শুনে লিখেছিলেন, "The view expressed here is, according to the author, fundamentally wrong. Unless we are at the end of evolution, or unless we deny evolution altogether, there is no reason to hold that our choice is restricted to two alternatives....Considering everything, one is inclined to hold that the next phase in world history will produce a synthesis between Fascism and Communism. And will it be a surprise if the synthesis is produced in India ?"

অনুবাদে যা :

"বর্তমান লেখকের মতে উপরোক্ত অভিমতের মূলেই রয়ে গেছে প্রকাণ্ড একটা ভ্রান্তি। আমরা যদি ধরে না নিই যে, এতদিনে বিবর্তনের অন্তিম পর্যায়ে উপনীত হয়েছি, অথবা যদি বিবর্তনবাদের সত্যটা উড়িয়ে দিতে না পারি, তাহলে কিছুতেই মেনে নেওয়া চলে না যে, আমাদের সামনে শুধুমাত্র দুটি পথ খোলা আছে... সবদিক বিবেচনা করে আমার তো মনে হয়েছে, পৃথিবীর ইতিহাসের পরবর্তী পর্যায়ে আমরা দেখতে পাব ফ্যাসিজম্ আর কম্যুনিজম্-এর এক অভূতপূর্ব সংমিশ্রণ। আর এতে অবাক হবার কী আছে — যদি সেই মহামিলনের রঙ্গমঞ্চটা হয় এই ভারতবর্ষ?"

জাতির জনকের প্রিয় 'বেটা' যদি সশরীরে তাঁর বাহিনী নিয়ে দিল্লীতক্ পৌঁছাতে পারতেন তাহলে হয়তো ভারতবর্ষে আর এক কামাল আতাতুর্ক, আর এক অ্যাব্রাহাম লিংকনকে আমরা দেখতে পেতাম। ভারতেতিহাসের দুর্ভাগ্য, সেটা হয়নি। তাই কিছুটা দেরী হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে আপনাদের আরও স্মরণ করিয়ে দিই — সুভাষচন্দ্র যখন এটা লিখেছিলেন তখনো রবীন্দ্রনাথ লেখেননি :

"আশা করব, মহাপ্রলয়ের পরে বৈরাগ্যের মেঘমুক্ত আকাশে ইতিহাসের একটি নির্মল আত্মপ্রকাশ হয়তো আরম্ভ হবে এই পূর্বাচলের সূর্যোদয়ের দিগন্ত থেকে।"

তিন

'ম্লেচ্ছনিবহনিধনে কলয়সি করবালং
ধূমকেতুমিব কিমপি করালম্।'

কী বললেন? বাড়াবাড়ি? তা হয়তো কিছুটা করছি। কী আর করা যাবে? Superfluity is Art — প্রয়োজনাতিরিক্ত অতিশয়োক্তিই ক্ষেত্রবিশেষে শিল্পের পরিচায়ক!

তাছাড়া ওটা বোধহয় আমাদের রক্তে! 'আমরা' ঘরের ছেলের লীলায় 'বিশ্বভূপের ছায়া' দেখতে কিছুটা অভ্যস্ত। ঐ যাকে বলে : 'মানুষের ঠাকুরালি'!

অপিচ 'ধূমকেতু' রূপকটা আমি তৈরি করিনি। সেটা ওঁর সজ্ঞান আত্মবিঘোষণ : "Election Commissioners will come and go. T. N. Seshan is just a *Dhoomketu*. You know what a *Dhoomketu* is? It's a star with a long tail...By 12 December 1996 T. N. Seshan will comprehensively be *Ex*. Chief Election Commissioner. Unless God intervenes at an earlier occasion."

[ইলেকশান-কমিশনারেরা আসবেন আর যাবেন। টি. এন. শেষন একটা ধূমকেতু বই তো নয়! ধূমকেতু কাকে বলে জানেন তো? দীর্ঘলাঙ্গুলবিশিষ্ট একটি তারকাবিশেষ। ... 1996 সালের বারোই ডিসেম্বর সহজবোধ্য হেতুতেই টি. এন. শেষন হয়ে যাবে *প্রাক্তন*-চীফ ইলেকশান কমিশনার। যদি না অবশ্য তার আগেই ঈশ্বরেচ্ছায় ভালমন্দ কিছু ঘটে যায়।]

ফলে 'ধূমকেতু' শব্দ প্রয়োগের কৈফিয়ৎ নিষ্প্রয়োজন। সেটা ঐ আত্মসচেতন কল্কি-অবতারের স্বঘোষিত : অয়ম অহং ভো!

আমি বরং 'ম্লেচ্ছ' শব্দটার ব্যাখ্যা দাখিল করি। ওটাতে কিছুটা ভুল বোঝাবুঝির আশঙ্কা আছে। বিহার-রাজ্যে লালুবাবুকে রিগিং করতে না দেওয়ায় তাঁর দলের সহযোগী কর্তারা যেহেতু ঐ কল্কি অবতারের নামে লোকসভায় 'ইমপিচমেন্ট' আনার সিদ্ধান্ত আবার নিতে যাবেন বলে শাসাচ্ছেন তাই জানিয়ে রাখা ভাল : 'ম্লেচ্ছ' শব্দটার অর্থ 'বিধর্মী' ; কিন্তু ধর্মের অর্থ এখানে religion নয়! ধৃ ধাতু + ম (মন) ক =ধর্ম, যা লোকধারক, যা শ্রেয়ঃ, শুভাদৃষ্ট, পুণ্য। কাজী নজরুল ইসলাম বা সৈয়দ মুজতবা আলীর রচনা ম্লেচ্ছরচিত সাহিত্য নয়। মাদার টেরেসার গীর্জা এবং [illegible] আশ্রম

'ম্লেচ্ছ' সম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠান নয়। 'ম্লেচ্ছ' শব্দের ব্যাখ্যায় শুক্রনীতিসার যে সংজ্ঞা আরোপ করেছেন তাই এখানে গ্রাহ্য : "স্বধর্মাচরণহীন নির্দয় পরপীড়ক উগ্র সতত হিংসাশীল যথেচ্ছাচারী গণ"। বলা হল, 'ধর্মং যো বাধতে ধর্মো, ন স ধর্মঃ কুবর্ত্ম তৎ'। ধর্ম হচ্ছে তাই, যা ধারণ করে। মানুষকে যে কুপথে পরিচালিত করে না। ফলে গদী-আসীন অথবা গদী-লোভী 'নির্দয় পরপীড়ক উগ্র সতত-হিংসাশীল যথেচ্ছাচারী' রাজনীতি-ব্যবসায়ীরা নির্ভেজাল 'ম্লেচ্ছ'। সেই "ম্লেচ্ছাং মূর্ছয়তে" কেরালার পালঘাটে আবির্ভূত হয়েছেন এই কল্কি অবতার — মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদার্থবিদ্যায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হওয়ার পর চলে যান যুক্তরাষ্ট্রে। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'পাবলিক অ্যাডমিন্সট্রেশনে' মাস্টার্স ডিগ্রি নিয়ে ফিরে আসেন ভারতে। আই. এ. এস. পরীক্ষায় প্রথম হয়ে যোগদান করেন আই. এ. এস. চাকরিতে। ডিসেম্বর 1990-এ ছয় বছরের জন্য তিনি মুখ্য নির্বাচন কমিশনার পদে নিযুক্ত হয়েছেন।

ইতিপূর্বে প্রায় ত্রিশ বছর ধরে ঐ কাণ্ডটা হয়েছে : "Election Commissioners will come and go" [ইলেকশান কমিশনারেরা আসবেন আর যাবেন]। পদ্মবিভূষণ সুকুমার সেন আই. সি. এস. স্বাধীন ভারতের প্রথম চীফ ইলেকশন কমিশনার — ঐ যাঁর ভদ্রাসনে আমি অনিলকুমার চন্দের কাছে ভারতেতিহাসের একটি গূঢ়-অধ্যায়ের বর্ণনা শুনেছিলাম। তা সে যাই হোক, এই শেষ CEC শেষনের আবির্ভাবের পূর্বে আমরা কিন্তু জানতে পারিনি যে, এই দারিদ্র্যপীড়িত উপেক্ষিত অবজ্ঞাত যাবতীয় প্রাপ্তবয়স্ক ভারতীয়ের তূণীরে আছে এক-একটা একাঘ্নী ব্রহ্মাস্ত্র!

T. N. Seshan stands out as a colossus in his own right. As a crusader against corruption in elections, he represents a virtual one-man army. Despite several attempts by political bigwigs to cut Seshan down to size, he has emerged even taller than before, and a vast number of Indians regard him as a twentieth-century Hercules.

[আপন শৌর্যেই টি. এন. শেষন এ কুরুক্ষেত্রে ঘটোৎকচের মতো দণ্ডায়মান। এতাবৎকাল 'নির্বাচন-দ্রৌপদী'র বস্ত্রহরণে যারা পৈশাচিক উল্লাসে মত্ত ছিল সেই কুরুকুলের বিরুদ্ধে তিনি ধর্মযুদ্ধের একক সৈনিক! রাজনীতিবিদ মহারথীরা ঐ মহাগরুড়ের পক্ষশাতন করতে গিয়ে অনুভব করেছেন, শেষন উত্তরোত্তর হিমালয়ান্তিক উচ্চতায় মহিমামণ্ডিত হয়ে উঠ্ছেন। অসংখ্য ভারতবাসী আজ তাঁকে বিংশশতাব্দীর পরশুরামরূপে চিহ্নিত করে — প্রয়োজনে আবার তিনি ভারতকে দ্বাবিংশতিতমবার নির্ম্লেচ্ছ করে ছাড়বেন।]

একদল কুচক্রী শিক্ষিত মানুষ দীর্ঘ পাঁচ দশক ধরে ভারতবর্ষকে শাসনের নামে

শোষণ করে আসছে। নানান রাজনৈতিক দল গঠন করে : লাল, নীল, আধালাল, আধানীল, গেরুয়া, সবুজ। এদের নৈতিক আদর্শগত পার্থক্য সামান্যই। লক্ষ্য একটিই : শাসনদণ্ড লাভ করা। যেন-তেন-প্রকারেণ গদীতে উঠে বসা। শেষনের ভাষায়, "এককালে হিন্দু-ভারতে চতুর্বেদের চর্চা ছিল। এখন রাজনীতি-ব্যবসায়ীরা একটিমাত্র বেদাশ্রয়ী — প্রথম বেদ " Rig বেদ।" চাকুরিরত একজন আই. এ. এস. অফিসারের দুঃসাহসটা দেখুন। বলছেন, "Today, elections in India — and I've said this throughout the length and breadth of the country — are based on cash, criminality and corruption." [ভারতে নির্বাচন আজ তিনটি স্তম্ভের উপর দণ্ডায়মান — আর সে-কথা আমি আসমুদ্র-হিমাচলে ঘোষণা করে চলেছি : অর্থকৌলিন্য, অপরাধপ্রবণতা এবং ভ্রষ্টাচার।] বলছেন, "Cash requires corruption before, during and after. And corruption requires criminality. The criminals first served other people and then they said, "Why should I serve you ? I'll do it myself. I myself will go to the Assembly or Parliament." The result is before you." [অর্থকৌলিন্যের সঙ্গে অনিবার্যভাবে সম্পৃক্ত : ভ্রষ্টাচার। নির্বাচনের আগে, নির্বাচন কালে, এবং ক্ষমতালাভের পরে। আর ভ্রষ্টাচারের অনুষঙ্গ অপরাধপ্রবণতা! অপরাধজীবীরা অর্থলোভে প্রথম প্রথম ভ্রষ্টাচারীদের মদৎ দিতে এগিয়ে এসেছিল। তারপর তারা বলতে শুরু করল, "আমি কেন তোমার হুকুম মতো চলব? তুমি যেটা অ্যাদ্দিন করছিলে সেটা আমিই করব এবার। আমি নিজেই গিয়ে বসব বিধানসভায় অথবা লোকসভায়। তার ফলটা কী হয়েছে তা আপনারা অস্থিতে অস্থিতে অনুভব করছেন।]"

* * *

বিরানব্বই সালের ফেব্রুয়ারি মাসে প্রধানমন্ত্রী শেষনকে অনুরোধ করেন, আগামী নির্বাচনগুলি যাতে দুর্নীতিমুক্ত থাকে তার যথাযথ ব্যবস্থা করতে। শেষন সেই মাসেই একটি তালিকায় তাঁর যাবতীয় 'সাজেস্‌শান' কেন্দ্রীয় সরকারকে দাখিল করেন। তাতে তিনি প্রসঙ্গত লিখেছিলেন : জাল ভোট প্রদান এবং রিগিং ঠেকাবার জন্য প্রত্যেকটি ভোটারকে একটি করে স-ফটো আইডেন্টিটি কার্ড দিতে হবে।

ভারতে এখন ভোটারের সংখ্যা পঞ্চান্ন কোটি! তার মানে পঞ্চান্ন কোটি ফটো? পঞ্চান্ন কোটি আইডেন্টিটি কার্ড! অধিকাংশ রাজনীতি-ব্যবসায়ী বললেন, লোকটা বদ্ধ উন্মাদ! 'পাগলা কুকুর'ও বলেছিলেন কোনো এক 'শিক্ষিত' মুখ্যমন্ত্রী। আঠারোমাসে সরকারী বছর! তা নির্বাচন কমিশনার আঠারো মাসই অপেক্ষা করলেন। "Finally in August '93, I got into action since I have the powers to issue

the order." [অবশেষে তিরানব্বই সালের আগস্ট মাসে আমি ফতোয়া জারী করলাম — যা করার অধিকার আমার ছিল।] যে রাজ্যে আইডেন্টিটি কার্ড তৈরি হবে না, সে-রাজ্যে ইলেকশানও হবে না! তা হলে কে রাজ্যটা শাসন করবে? তা আমি কী-জানি? 'সংবিধান' জানে। সম্ভবত রাষ্ট্রপতির শাসন চালু হবে!

সারা ভারতের রাজনীতি-ব্যবসায়ীরা এবার নড়েচড়ে বসলেন। জীববিশেষের মতো কুঁই-কুঁই করতে করতে পোলিং বুথে ফটো তোলাতে এলেন। কারণ ঐ তথাকথিত 'পাগলাকুকুরের' নির্দেশ ছিল : রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীও যদি ভোটার হতে চান, তবে তাঁকে ফটো তোলাতে জনগণের সমতলে নেমে আসতে হবে। ফটোগ্রাফার মুখ্যমন্ত্রীর বাতানুকূল-করা কক্ষে যাবে না!

এতদিনে 'সাম্য' শব্দটার অর্থ বোঝা গেল : "আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে!" আইডেন্টিটি কার্ডের ক্রম-সংখ্যা অনুযায়ী কোন মুখ্যমন্ত্রীর পূর্ববর্তী ভোটার হয়তো বস্তিবাসী রিক্‌শাআলা, যে তার রিকশা টেনে-টেনে দিন গুজরান করে ; পরবর্তী ভোটার হয়তো হাড়কাটা লেনের অধিবাসিনী, যে তার দুর্ভাগ্যকে টেনে টেনে রাত গুজরান করে!

আনন্দ-এ ন্যাশনাল ডেয়ারি ডেভেলপমেন্ট বোর্ড আয়োজিত সভায় শেষন বলেছিলেন, (7.3.1994) : "As far as I am concerned I am Bhishma lying on a bed of arrows. I will go when *Uttarayana* comes. And my Uttarayana comes when there are enough of you making noise. I will give you one assurance which you can quote : if I am not able to wake up the people of this country, in the next few months, I'll get up and quit. I give you an absolute assurance that I will not quit out of fear." [আমার কথা যদি জিজ্ঞেস করেন তবে বলব : আমি তো ভীষ্মের শরশয্যায় উত্তরায়ণের প্রতীক্ষায় শায়িত। আর আমার উত্তরায়ণ তখনি আসবে যখন আপনারা যথেষ্ট সংখ্যায় প্রতিবাদী-কণ্ঠে মুখর হয়ে উঠ্‌বেন। একটা কথা দিয়ে যাচ্ছি, লিখে রাখুন : কয়েক মাসের মধ্যে ভারতবর্ষের জনগণকে যদি জাগরিত করতে না পারি, তবে আমি নিজে বিদায় নিয়ে চলে যাব! তবে এটাও আমার ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা : ভয় দেখিয়ে কেউ আমাকে তাড়াতে পারবে না।]

আনন্দ্‌-বক্তৃতার দু-মাস পরে (9.5.94) লক্ষ্ণৌ শহরে 'লইয়ার্স ফোরাম' আয়োজিত সভায় শেষন যা বললেন তার বঙ্গানুবাদ "আমি আপনাদের মুখের সামনে একটা আয়না তুলে ধরতে চাই। তাতে যদি আপনাদের মুখের কুৎসিত কিছু ক্ষতচিহ্ন ফুটে ওঠে তাহলে যেন বলবেন না : শেষন লোকটা অভদ্র। সে একটা *খলনায়ক*। আমি কি লক্ষ্ণৌ শহরের ঐতিহ্যমণ্ডিত আইনজীবীদের এই সংস্থাকে জিজ্ঞাসা করতে পারি

— গত পাঁচ বছরে কয়টা ভাল 'কেস' আপনারা লড়েছেন? আদর্শগত কারণে? আপনারা কয়বার পরস্পরকে বলেছেন, 'পরিণতি যাই হোক, সত্য চিরকালই সত্য?' কয়বার আপনাদের সংস্থা এই সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছে — 'এই অফিসারটি একজন সৎ প্রশাসক। ওঁকে সৎপথে থাকার 'অপরাধে' অযথা হেনস্থা করা হচ্ছে। আসুন, আমরা সবাই মিলে ওঁকে সাহায্য করি।' আমার বলতে সঙ্কোচ হচ্ছে, কিন্তু এ-কথা তো ধ্রুব সত্য যে, প্রশাসকদের মেরুদণ্ড আজ ভেঙে গেছে — কখনো লোভে, কখনো ভয়ে, কখনও বা নির্যাতনে।

"আপনারা কি জানেন, ইতালিতে অতি সম্প্রতি বিচারক আর আইনজীবীরা একটা যৌথ সিদ্ধান্তে এসেছিলেন? দেশকে বাঁচাতে তাঁরা খুঁজে খুঁজে মাফিয়াদের চিহ্নিত করেছিলেন? তাদের একে একে নির্মূল অথবা বিতাড়িত করতে সক্ষম হয়েছিলেন? আপনারা আমাকে অনুগ্রহ করে জানাবেন কি : লক্ষ্ণৌ আইনজীবীদের এই সংস্থা এ পর্যন্ত এ শহরকে মাফিয়ামুক্ত করতে কী কী করেছেন? আপনারা কি একজনমাত্র প্রশাসককেও খুঁজে বার করতে পেরেছেন, যিনি তাঁর সততার জন্যই নিগৃহীত? আপনারা কি একযোগে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন তাঁকে সাহায্য করতে? অপরপক্ষে আপনারা কি অন্তত একজন অপদার্থ, অসৎ প্রশাসককে চিহ্নিত করতে পেরেছেন, যাকে পৃথিবীর শেষপ্রান্ত পর্যন্ত তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া উচিত? আমি যদি তর্জনীসঙ্কেতে সে ব্যর্থতার জন্য আপনাদেরই দায়ী করি তাহলে আমার অপরাধ নেবেন না। বলবেন না যেন : শেষন লোকটা আতিথেয়তার মর্যাদা দিতে জানে না। স্বীকার করি : সে বদনাম আমার আছেই। আচ্ছা না হয় এ সভার শেষে আমি গলা ভেজাতে এককাপ চা-ও আপনাদের কাছে চাইব না। হল তো? এবার বলুন : এখন কি আমি জিগ্যেস করতে পারি? আমি কি অনুরোধ জানাতে পারি? আমি কি ভিক্ষা চাইতে পারি — এ বিষয়ে আপনারা তৎপর হন? শুধু আপনাদের দ্বারেই কেন এসেছি জানেন? যেহেতু আপনারাই পারেন পেঁয়াজ-পয়জার দু-রকম দাওয়াই দিতে। মাননীয় বিচারকদের পক্ষে তা সম্ভবপর নয় — কারণ ওঁরা আইনের অন্ধসেবক। 'কেস' তো আপনারাই গড়ে তোলেন। তাই নয়? আমারও হাত-পা বাধা, কারণ আইনটা আমিও জানি না।"

এ-কথা এই 'কৈফিয়ৎ'-লেখকও বলতে পারে : আইনটা আমিও জানি না। তবে এ-কথা জানি : ইস্টার্ন বাইপাসে স্ত্রীর কাঁধে মাথা রাখার অপরাধে এ রাজ্যে পুলিশ বে-আইনী উপার্জন করে থাকে এবং প্রশাসন তাকে আড়ালে রাখতে সাহায্য করে। এ-কথা জানি : মুন্সিগঞ্জের পতিতাপল্লীতে মত্ত অবস্থায় হাঙ্গামা বাধানোর জন্য যে এ. এস. আই. সাসপেন্ডেড হয়েছেন সেই অনন্তকুমার পাহাড়ির নাম পুলিশ পদকের জন্য ইতিপূর্বেই সুপারিশ করা হয়েছিল! যিনি করেছিলেন — সশস্ত্রবাহিনীর সিনিয়ার

ডেপুটি কমিশনার মহম্মদ নিজাম — তাঁর দেহরক্ষীও ছিল ঐ মাতলামি-পার্টিতে — বর্তমানে ফেরার। একথাও মানছি : ইটভাটার ঝুপড়িতে ওঁরাও মহিলাদের গণধর্ষণ করার পর ডাকাতি করতে গিয়ে যারা ধরা পড়েছে তারা কোন্ রাজনৈতিক দলের মস্‌তান, এটা স্থির করতে লাল, নাতিলাল, নীল পার্টির বিধায়করা বিধানসভার ভিতর পরস্পরকে আক্রমণ করেন। কেউ কেউ আহত হয়ে হাসপাতালেও গেছেন। এই তো সেদিন! এমনজাতের বিধায়ক এ দেশেই পয়দা হয়! না, আমরা পয়দা করি। মান্‌ছি। কিন্তু আপনাকেও মানতে হবে : চাকা কিন্তু ঘুরছে! ঘুরেছে!

ইতালির মাফিয়া-বিতাড়নের পদাঙ্ক-অনুসরণে কি না জানি না, কিন্তু এখানেও আদালতে এমন এমন রায় বার হচ্ছে যা আগে কখনো হতে দেখিনি। তিন বছর আগে '*এমনটা তো হয়েই থাকে*'র কৈফিয়তে ফুলবাগান-থানায় কর্তব্যরত পুলিশ শ্রীনীলকমল ঘোষ মশায়ের কীর্তি-কাহিনীর বর্ণনা দিয়েছিলাম। পথপ্রান্তের একটি ঝুপড়ির বাসিন্দা একজন যুবতীকে চার-পাঁচজন পুলিশ উঠিয়ে নিয়ে যায়। থানার ভিতরেই গণধর্ষণ করে। সেই মামলার রায় সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। বিচারক আসামী নীলকমল ঘোষকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন এবং লাল পার্টির পুলিশ অ্যাসোসিয়েশন আপীলের খরচ দিতে স্বীকৃত হয়নি। ফলে নীলকমল ঘোষমশাই পুলিশের পোশাক ছেড়ে, ডোরাকাটা হাফ্‌প্যান্ট পরে, গলায় নম্বরী তক্তি ঝুলিয়ে, পাথর ভাঙতে গেছেন।

একই গ্রন্থে তিন বছর আগে 29.8.91 তারিখের আর একটি মর্মন্তুদ নারীনিগ্রহের কথা লিখেছিলাম : মেদিনীপুর জেলার কন্টাই শহরের ঘটনা। সুযোগ পেয়ে হোটেলের ঘরে পরপর পাঁচজন পিশাচ একটি নাবালিকার উপর পাশবিক অত্যাচার করে। সংবাদে বলা হয়েছিল : 'টীন-এজার'। ঐ পাঁচজনের ভিতর একজন ছিলেন ঐ এলাকার পুলিশের কর্তব্যরত এ. এস. আই.। পরদিন এই ঘটনা নিয়ে কাঁথি শহর তোলপাড় হয়ে ওঠে। থানা ইনচার্জ চারজনকে গ্রেপ্‌তার করেন। যদিও মেয়েটি ঐ এ. এস. আই.-কে সনাক্ত করেছিল তবু তাকে গ্রেপ্তার করা যায়নি। দুর্জনে বলে তার একটি বিশেষ হেতু ছিল। খুঁটির জোরে মেড়া লড়ে! এ. এস. আই.-টি নাকি ছিল স্থানীয় নন্-গেজেটেড পুলিশ কর্মচারী সমিতির একজন সক্রিয় সদস্য। আর ঐ সমিতি স্থানীয় লাল-পার্টির অনুগ্রহভাজক। সাব-ডিভিশনাল পুলিশ অফিসার (SDPO) ও কথায় কান না দিয়ে স্বয়ং সেই এ. এস. আই.-কে গ্রেপ্তার করতে উদ্যোগী হন এবং ঐ N.G.P.K.S. কর্মীদের হাতে লাঞ্ছিত হন। [সংবাদে অবশ্য বলা হয়নি যে, S.D.P.O.র নাম বকুল বিশ্বাস ছিল কি না]

তিন বছর পরে এই 'কৈফিয়ৎ' লেখার সময় একটি সংযোজন লিপিবদ্ধ করতে

পারছি : ইতিমধ্যে বিচারক এই কেস-এ রায় দিয়েছেন। পাঁচজনকেই — আজ্ঞে হ্যাঁ, ঐ এ. এস. আই. সহ পাঁচজনকেই — যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিয়েছেন। যতদূর জানি — আইন-অনুযায়ী এটাই সর্বোচ্চ শাস্তি। এবারও লাল-পার্টি সমর্থিত পুলিশ-অ্যাসোসিয়েশন আপিলের খরচ দিতে রাজি হয়নি।

সমকালে দুটি পৃথক আদালতের দুটি পৃথক রায় কি কোনও পরিবর্তনের ইঙ্গিতবাহী? ইতালীর সঙ্গে তুলনীয়? জানি না। তবে এটুকু জানি যে, রাজনীতি-ব্যবসায়ীদের ছত্রছায়ায় দুর্নীতিপরায়ণ পুলিশ যেটাকে স্বতঃসিদ্ধ বলে মেনে নিতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল, এখন দেখছে সেটা ভ্রান্ত! অর্থাৎ মাকড় মারলে ধোকড় যে হবেই এটা 'অ্যাক্সিয়ম্' নয় — তাতে যাবজ্জীবনও হতে পারে!

* * *

বোম্বাইতে Citizens for National Consensus আয়োজিত সভায় (20.12.93) শেষন বলেছিলেন, "One of the gravest disasters in Indian polity is the full-time professional politician who has no other way of living. [ভারতীয় সংবিধানের সর্বনাশের যে কয়টি চরমতম হেতু তার মধ্যে পড়েন একদল সর্বক্ষণের পেশাদারী রাজনীতি-ব্যবসায়ী, যাঁদের সংসারযাত্রা নির্বাহের আর কোনও পথ খোলা নেই।] এই রাজনীতি-ব্যবসায়ীর দল ধীরে ধীরে প্রশাসন ও পুলিশকে কব্জা করে দুর্নীতির সর্বগ্রাসী বাতাবরণ সৃষ্টি করেছে কয়েক দশক ধরে।

"Today each Indian civil servant, from the Chief Secretary down to the thanedar, if he wants to be honest, his back is broken repeatedly...

Who broke them ? I want to point an accusing finger at you and say : 'You broke them!"

[আজকে প্রতিটি সরকারী কর্মচারী — চীফ সেক্রেটারি থেকে শুরু করে থানার দারোগা পর্যন্ত — যে কেউ যদি বলে, আমি সৎপথে থেকে চাকরি করব, অমনি তার মেরুদণ্ডটি ভেঙে দেওয়া হয়। একবার নয়, বার বার! কে ভাঙে? আমাকে প্রশ্ন করলে আমি আপনাদের দিকে আঙুল তুলে বলব : আপনারা!]

আপনারা, বলবেন 'সে কি কথা, মশাই? ওদের মেরুদণ্ড তো স্বয়ং মন্ত্রীমশাই ভেঙে দিলেন!' আমি জবাবে বলব, 'আজ্ঞে না! ষড়যন্ত্রীমশাই যখন একজন সৎ সরকারী কর্মচারীকে ঠেঙিয়ে ঠেঙিয়ে অষ্টাবক্রমুনি বানিয়ে তুলছিলেন তখন আপনি চুপচাপ বসে তা দেখেছেন। উঠে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ তো করেননি!...আপনারা হয়তো এবার বলবেন, "Sir! Will you honestly tell me that when you were in the civil service for 36 years, were you also not a polished call girl ? [স্যার,

আপনি সত্যি করে একটা কথা বলবেন? আপনি নিজেই তো ছত্রিশ বছর ধরে আই. এ. এস. ছিলেন, আপনি নিজেও কি মার্জিত 'কলগার্লের' ভূমিকায় অবতীর্ণ হননি?] জবাবে আমি বলব, হ্যাঁ, কলগার্ল হতে হয়েছিল আমাকেও ; তবে মার্জিত নয়, অমার্জিত!...সে যাই হোক, আপনারা কি সবাই মিলে উঠে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ করতে পারেন না? একজন সৎ সরকারী কর্মচারীকে যখন মন্ত্রীমশায়ের নির্দেশে হেনস্থা করা হচ্ছে তখন আপনারা সবাই মিলে... আজ্ঞে হ্যাঁ, এই কথাটাই বলতে চেয়েছিলেন বুদ্ধদেব গুহ তাঁর "ঋভু"-র দ্বিতীয় পর্যায়ে "যাঁদের আপনারা বিধানসভাতে বা লোকসভাতে ভোট দিয়ে পাঠান তাঁরা প্রত্যেকেই আপনার সেবক।...নিজেদের অভিযোগ ও অসুবিধার কথা সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে জানান।... নেতাদের দায়িত্ববান করে তুলুন।"

যাঁরা রাজনীতি করেই সংসারযাত্রা নির্বাহ করে থাকেন (বা সুইসব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট খোলেন) সেই পেশাদারী রাজনীতিক নেতাদের কথা হচ্ছে না। কিন্তু নেতৃত্ব বদল তো আপনার-আমার হাতেই! নির্বাচন-মাধ্যমে। ওটাও আপাতসত্য — অনস্বীকার্য পরিস্থিতি: কাকে ভোট দেবেন? জলের কুমির না ডাঙার বাঘ? ফুটন্ত ডেকচি না প্রজ্বলিত আগ — কোনটা আপনার পছন্দ? কিন্তু এটাই তো কয়েক সহস্রাব্দীব্যাপী শত্রুর-সঙ্গে-পাঞ্জা-কষে-টিকে-থাকা ভারতীয় সংস্কৃতির শেষ কথা হতে পারে না। আজ আমরা কুমিরের বদলে বাঘ, বাঘের বদলে কুমিরকে গদিতে বসাচ্ছি। কারণ সৎপ্রার্থী নেই। তাই পাওয়ারের বদলে বাল থ্যাকারে! কিন্তু অপশাসকদের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াবার শক্তি আমরা নিশ্চয় খুঁজে পাব। এই 'শোষক-শাসক' সম্প্রদায়কে বিতাড়ন করতে পারলেই। তার উদ্যোগপর্বও তো শুরু হয়ে গেছে।

* * *

আমি বিশ্বাস করি, এবং এটাও বিশ্বাস করি যে, আপনারাও বিশ্বাস করেন : সংখ্যাগরিষ্ঠ ভারতবাসী — কী হিন্দু, কী মুসলমান, কী শিখ, কী খ্রীস্টান, — সৎ, অসাম্প্রদায়িক এবং শান্তিকামী! হিটলারের আমলে যেমন সংখ্যাগরিষ্ঠ জার্মান বিশ্বাস করত ইহুদিদের ধ্বংস করার পথে নর্ডিক জার্মানীর সর্বাঙ্গীণ-উন্নতি হবে না। কিন্তু হিটলারের নীতির বিরুদ্ধে তারা রুখে দাঁড়াতে পারেনি, আজ তেমনি মহারাষ্ট্রের কোন অসাম্প্রদায়িক শান্তিকামী সাধারণ মানুষ বাল থ্যাকারেকে বলতে পারছে না : মশাই! আপনি তো বলছেন শরণার্থী বাঙালী ও পাকিস্তানী মুসলমানকে মহারাষ্ট্র থেকে ঠেঙিয়ে বিদায় করবেন। কিন্তু তার বদ্‌লা নিতে ঐ বাঙলা দেশ আর পাকিস্তানে আপনার কাউন্টার-পার্ট যখন 'হেঁদু'দের ঠেঙিয়ে ভারতে পাঠাবে তখন তাদের কোথায় ঠাঁই দেওয়া হবে? মহারাষ্ট্র-ব্যতিরেকে ভারতের যে কোনও রাজ্যে? কেন? যেহেতু

আপনার গেস্টাপো-বাহিনী তৈয়ার? শিবসেনা?

আমি বিশ্বাস করি : জনগণের প্রচণ্ড কৌতুকে সাম্প্রদায়িক বিভেদ নীতির ধ্বজাধারীদেরও একদিন বিতাড়ন করা যাবে, অন্তত তাঁদের মৌলবাদী নীতিটাকে মুছে ফেলা যাবে। যেভাবে শারদ পাওয়ারকে মুখ্যমন্ত্রীর কঠিন দায়িত্ব থেকে নিষ্কৃতি দিয়েছে মহারাষ্ট্রের মানুষ। যেভাবে বিজু পট্টনায়ককে পরবর্তী জন্মদিনে কোটি-টাকা বাজেটের উৎসব-আয়োজন করার কঠিন দায়িত্ব থেকে মুক্তি দিয়েছে উড়িষ্যার মানুষ! অথচ কী অপরিসীম বিস্ময়ের কথা দেখুন, উড়িষ্যা-নির্বাচনের একপক্ষকাল আগেও আনন্দবাজার পত্রিকার 'নির্বাচন-বিশেষজ্ঞ' সাংবাদিক কলিঙ্গ-পরিক্রমা সমাপ্ত করে রিপোর্ট ছাপিয়েছিলেন : "পুরীর মন্দির থেকে জগন্নাথের মূর্তি এবং উড়িষ্যার গদি থেকে বিজু পট্টনায়কের অপসারণ একই রকম অসম্ভব ব্যাপার। কারণ গোটা উড়িষ্যায় বিজুবাবুর নাম 'কালিয়া' — অর্থাৎ প্রভু জগন্নাথ!

তারপর রথের রশিতে টান পড়ল। নির্বাচন শেষ হল। দেখলাম চাকা ঘুরে গেছে!

আমি সাংবাদিক নই। সংবাদপত্রের কারও সঙ্গে ঘনিষ্ঠতাও নেই। নিতান্ত একান্তচারী অন্তেবাসী কথাসাহিত্যিক। তবু সামান্য আয়াসেই এ পর্যন্ত পঞ্চাশোর্ধ সরকারী কর্মচারীর সন্ধান পেয়েছি — শেষনের ভাষায় 'চীফ সেক্রেটারি থেকে থানেদার' — যাঁরা বলতে চান 'আমি সৎপথে থেকে চাকরি করব'। তাঁরা দুর্নীতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছেন। উপরওয়ালার — এমনকি খোদ মন্ত্রীমশায়ের — অন্যায় নির্দেশ অমান্য করে নির্যাতন সয়েছেন। তাঁদের শাস্তিমূলক 'স্টেশনে' বদলি করা হয়েছে। সাজানো কেসে ফাঁসিয়ে সাস্‌পেন্ড করা হয়েছে, বরখাস্ত করা হয়েছে। রাস্তার মাঝখানে গাড়ি আটকে ঠেঙানো হয়েছে। গুলি করা হয়েছে। একটি বিশেষ ক্ষেত্রে রিটায়ার্ড আই. এ. এস. — ডিভিশনাল কমিশনারকে গাড়ি থেকে নামিয়ে উলঙ্গ করে প্রকাশ্য রাস্তায় হাঁটতে বাধ্য করা হয়েছে। আর একটি ক্ষেত্রে সুন্দরী আই. এ. এস. অফিসারের মুখে অ্যাসিড বাল্‌ব ছুঁড়ে তাঁকে চিরদিনের মতো ক্ষতলাঞ্ছিত করা হয়েছে। বিহারে একাধিক এক্সিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ারকে খুন করা হয়েছে — তাঁরা নিম্নতম টেন্ডার গ্রহণ করেছিলেন, পার্টির নির্দেশে ঠিকাদার নিযুক্ত করেননি এই অপরাধে। একজন ডি. এম.-কে খুন করা হয়েছে। অনেকে পদত্যাগ করে সসম্মানে সরে দাঁড়িয়েছেন।

কী দুঃখের কথা! কী অসীম দুঃখের কথা! তাঁদের অধিকাংশের কথাই আমরা জানি না, জানতে পারি না। কারণ ধনিক-বণিক ও রাজনীতি-ব্যবসায়ীদের স্বার্থে সংবাদপত্রে তাঁদের কথা কদাচিৎ প্রকাশিত হয়। এটা ঘটনা!

একটি উদাহরণ দিই :

এই 'কৈফিয়ৎ' যখন আধাআধি লেখা হয়েছে তখন (12.3.95) একটি প্রবন্ধ রবিবাসরীয় আনন্দবাজারে দেখতে পেয়ে উৎসাহের সঙ্গে পড়ে ফেললাম। ঐ রবিবাসরীয়ের এটাই 'প্রধান প্রতিবেদন'। 'সানন্দা'র একটি এককোণের বিজ্ঞাপনকে উপেক্ষা করলে পুরো পৃষ্ঠার আট কলাম-ব্যাপী বিরাট নিবন্ধ। প্রবন্ধের নাম **"নেতারা যখন খলনায়ক"**। লিখেছেন গৌতম ভট্টাচার্য। সঙ্গে অনুপ রায়ের একটি অনবদ্য ছবি: গদিতে ঠেশ দিয়ে গলায় মালা, মাথায় গান্ধীটুপি, খলনায়ক তাঁর বশংবদ অনুগামীদের উপদেশ দিচ্ছেন। একালীন নেতার পিছনে পাঁচজন সেকালীন জাতীয় নেতার বাঁধানো ছবি : মহাত্মা গান্ধী, চিত্তরঞ্জন, শ্রীঅরবিন্দ, নেতাজী ও জবাহরলাল। ক্যাডারদের পিছনে টাকার বাণ্ডিল, বোমা, পিস্তল-বন্দুক।

এই পুরো পাতা জোড়া প্রবন্ধে প্রথম খলনায়কের নাম : ইন্দিরা গান্ধী — পঁচাত্তরের জরুরী অবস্থার ঘোষক। এ ছাড়া কয়েকজন কেন্দ্রীয় সরকার থেকে ইতিপূর্বেই বিতাড়িত নেতা, যাঁরা আনন্দবাজার পড়বেন না বলে আশা করা যায় : চন্দ্রশেখর, কল্পনাথ রাই, বিহারের মাফিয়ানেতা মাতঙ্গ সিংহ এবং তাঁর অভিষেকের কর্তা নরসিংহ রাও। অপিচ ভোপালে কোটি টাকার মার্বেল প্যালেসের মালিক অর্জুন সিংহ। তারপর লেখক বললেন, "এই কলকাতাতেই পেন্সন পাচ্ছেন এমন এক সাংসদের ষোলজন কাজের লোক, আর চারটি গাড়ি। জনৈক বিধায়কের উত্তর-চব্বিশ পরগণায় বিশাল বাগানবাড়ি, পাঁচটা ফ্ল্যাট। এক জঙ্গী কংগ্রেস নেতার দক্ষিণ কলকাতার বুকে আড়াই হাজার স্কোয়ার ফুটের বিশাল ফ্ল্যাট।"

লক্ষ্য করে দেখুন, এবার কিন্তু সাংসদ ও বিধায়কের নামগুলো অনুল্লেখিত। বাঙালী পাঠককে জানানো যেতে পারে ভূপালে কোটি টাকার মার্বেল প্যালেসটা কে বানিয়েছেন ; কিন্তু বলা যাবে না, দক্ষিণ কলকাতার বুকে আড়াই হাজার স্কোয়ার ফুটের বিশাল ফ্ল্যাটটা কে বানিয়েছেন। পেনশনভোগী প্রাক্তন সাংসদের সেবকদের মাথা গুণে লেখক দেখেছেন সংখ্যাটা : ষোলো ; গ্যারেজে ঢুকে গাড়ির বনেট গুণে দেখেছেন সংখ্যাটা চার ; কিন্তু বাড়ির নেমপ্লেটটা লক্ষ্য করেননি, কেন? আনন্দবাজারের অফিসে ভাঙচুর হতে পারে আশঙ্কায়? যেমন এককালে হয়েছিল কুণ্ডু স্পেশালের অফিসে?

অবশ্য অবাঙালী হলে নাম প্রকাশে বাধা নেই। তাঁরা আনন্দবাজার পড়বেন না। তাই লেখকের অভিমত অনুসারে আরও দুটি অবাঙালী খলনায়কের নাম ছাপাতে অসুবিধা হয়নি : শেষন ও খেরনার!

> অধুনা কোনও কোনও আমলা অবশ্য জেগেছেন। এবং এই অবক্ষয়ের পরিবেশে তাঁদের নড়েচড়ে বসাতেই চতুর্দিক কৃতার্থ। উদাহরণ টি. এন. শেষন। এই মাস-দেড়েক আগে মিডলটন রো-র অভিজাত-লনে সামিয়ানা টাঙিয়ে এক

সম্পদশালী গৃহকর্ত্রী শেষনকে হাজির করেছিলেন, বিশিষ্ট অতিথিদের সামনে। শেষন যথারীতি রাজনীতিকদের বিরুদ্ধে হাতে-গরম কিছু ছাড়লেন। হাততালিতে লনের ঘাস উঠে যাবার জোগাড়।

শেষন গত পাঁচবছরে অন্তত একশটি বক্তৃতা দিয়েছেন আসমুদ্র হিমাচলে, তার যে-কোনটির শিরোনাম হতে পারত "নেতা যখন খলনায়ক"। ঐ লনের ঘাস উঠে যাবার হাতে-গরম বক্তৃতার ইঙ্গিত ব্যতিরেকে লেখক শেষনের কোনও বক্তব্য উদ্ধৃত করেননি। শুধু বলা হয়েছে যে, এডিএমকে-দলের গুণ্ডার ভয়ে — ঐ যারা চন্দ্রলেখার মুখে অ্যাসিড বাল্‌ব ছুঁড়েছিল — তাদের ভয়ে, শেষন একবার তাঁর মাদ্রাজ সফর বাতিল করেছিলেন। শেষন সম্বন্ধে লেখকের শেষ কথা : চন্দ্রস্বামী ও সাঁইবাবার সঙ্গে শেষনের যোগাযোগ আছে। শেষন চ্যাপ্টার খতম!

> "শেষনের পর জি. আর. খেরনার। বোম্বাই পুরসভার অখ্যাত ডেপুটি কমিশনার খেরনার। দাউদ ইব্রাহিম আর শারদ পাওয়ারের মতো হেভিওয়েটদের সামনে প্রতিরোধের পতাকা তুলে রাতারাতি হেডলাইনে চলে-আসা খেরনার। তা, এঁর সম্বন্ধে বোম্বাই প্রেস ক্লাবে যদি যান, জানবেন — কাগজে বেরোয় না, বেরোবে না, এমন কত কিছু। প্রচার চেয়ে কীভাবে খেরনার 'মিডিয়া ম্যানুপুলেট' করেন, সেই সব গল্প। শুনলে অবাক লাগবে। তার চেয়েও বেশি হবে দুঃখ।"

রবিবাসরীয় আনন্দবাজারে প্রকাশিত না হলে এই 'অখ্যাত' প্রাবন্ধিকের রচনার উপর এত দীর্ঘ আলোচনা আমি আদৌ করতাম না। করছি ঐ কারণেই — রচনাটি পত্রিকার রবিবাসরীয় সম্পাদকের অনুমোদিত হবার পর প্রকাশিত। শেষন এবং খেরনারের গায়ে কাদাটা লেখক একাই ছোঁড়েননি। তাই স্বীকার করব, অবাক হইনি, তবে দুঃখিত হয়েছি। দুঃখটা বোম্বাইয়ের 'অখ্যাত' ডেপুটি কমিশনারের জন্য নয়। তিনি তো শারদ পাওয়ারের মতো হেভিওয়েটদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার সাহস দেখিয়েছেন — প্রবন্ধকার নিজেই সেকথা স্বীকার করেছেন ; দুঃখটা এজন্য যে, দক্ষিণ কলকাতায় আড়াই হাজার স্কোয়ার ফুটের বিশাল ফ্ল্যাট বানিয়েছেন যে ফেদারওয়েট বিধায়ক, 'বিখ্যাত' আনন্দবাজার পত্রিকা তাঁর নামটা ছাপতে সাহস পেল না! কিমাশ্চর্যমতঃপরম?

শেষনের কোন উদ্ধৃতি না দিলেও লেখক একজন সৎ ও সরল মন্ত্রীর সুসমাচার পাঠককে উপহার দিয়েছেন — পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষিবিপণন মন্ত্রী মাননীয় কলিমুদ্দীন সামস-সাহেবের :

> "রাজনীতিতে দুর্নীতি হতে পারে এটা আমি বিশ্বাস করি না। কাগজে

সিনেমায় টিভিতে যা সব লেখালেখি আর দেখানো হচ্ছে সব ধাপ্পাবাজি। মূল লক্ষ্য হচ্ছে জনসাধারণকে নেতাদের থেকে দূরে সরিয়ে আনা। গণতান্ত্রিক কাঠামো যাতে ভেঙে চুরমার করে দেওয়া যায়।"

আট কলামব্যাপী সুদীর্ঘ ধানাই-পানাই-এর পর একটি ছোট্ট প্যারাগ্রাফে এক নিশ্বাসে লেখক উচ্চারণ করলেন পাঁচটি নাম। এ যেন ত্রিভুবন পরিক্রমায় বেরিয়ে গণেশজীর শিবদুর্গা প্রদক্ষিণান্তে উচ্চারণ : ওঁ শিবায় নমঃ!

"ব্যারাকপুরের তেজি পুলিশ অফিসার সঞ্জয় মুখার্জি, জামনগরের নির্ভীক পুলিশপ্রধান পি. কে. ঝা, পশ্চিমবঙ্গের ল-অফিসার বিশ্বজিত মুখার্জি, পাটনার প্রাক্তন স্বাস্থ্য অধিকর্তা শ্রীনিবাস রামানুজম, পঞ্জাব সরকারের অ্যাডিশনাল সেক্রেটারি স্মরণ সিংহ!"

লেখক উল্লিখিত এই পঞ্চপাণ্ডব কে, কে এঁদের স্মরণ করা হল, এঁরা নায়ক না খলনায়ক, কোন কথাই লেখক জানালেন না। ভাবখানা : এসব কথা তো তোমরা জানই!

ব্যস! খেল খতম! কাগজের পয়সা হজম!

* * *

অথচ দেখুন : এই আনন্দবাজারেই ফটো সমেত ছাপা হয়েছে *'বকুল'* উপন্যাসের লেখক, নিষ্ঠাবান, দুঃসাহসী, পুলিশ অফিসার নজরুল ইস্‌লাম-এর 'একলা চল রে' সংগ্রাম। প্রকাশিত হয়েছে, পাসপোর্ট অফিসের সৎ আই. এ. এস. অফিসার অসিতকুমার ভট্টাচার্যের জেহাদ — ব্রাবোর্ন-রোডের পাসপোর্ট অফিসের পাপচক্রকে নিশ্চিহ্ন করে তোলার ইতিকথা। প্রকাশিত হয়েছে কী কারণে অভিজ্ঞ আই. এ. এস. অফিসার, 'আনমোল' অর্কপ্রভ দেব, তাঁর বর্তমান দপ্তরের সচিবপদ থেকে সরে যেতে চাইছেন। বাঁকুড়া আর মেদিনীপুরের সৎ আই. এ. এস. অফিসারের সংগ্রামের কথা।

স্বতই মনে প্রশ্ন জাগে : কেন সংবাদপত্রের এই দ্বৈত ভূমিকা?

আমাদের আন্দাজ : দুই দলকেই খুশি রাখার প্রচেষ্টায়।

একদল হচ্ছে, ক্রেতা পাঠক। সে জানতে চায় এই সব সৎ, নিষ্ঠাবান, সরকারী বা বেসরকারী মানুষের কীর্তিকলাপ। প্রতিযোগী সংবাদপত্রে যদি তা প্রকাশিত হয় আর আমি যদি তা চেপে যাই, তবে আমার কাগজ বাজারে কাটবে না। আর বিক্রি কমে যাওয়া মানেই বিজ্ঞাপন কমে যাওয়া। ঐ বিজ্ঞাপনই তো মা লক্ষ্মী! যারা দেয়, তারাই হচ্ছে দ্বিতীয় দল : মাল্‌টিন্যাশনাল বড় বড় কোম্পানি — যারা পাতা-জোড়া বিজ্ঞাপন দিয়ে এই দুর্মূল্যের বাজারেও সংবাদপত্র প্রকাশনাকে লাভজনক ব্যবসা করে রেখেছে।

ঐ দ্বিতীয় দল : কোটি কোটি টাকার শেয়ার যাঁরা বাজারে ছাড়ছেন, ক্রমাগত

'কনসিউমার গুড্‌স্'-এর পাতা-জোড়া রঙিন বিজ্ঞাপন ছাপাতে পাঠাচ্ছেন, তাঁরা রাজনীতি-ব্যবসায়ীদের ছত্রছায়াতেই তো ফলাও কারবারটা চালাচ্ছেন! শেষন তো তাদের শত্রু! খেরনার তো বটেই! 'অখ্যাত' লোকটা পাওয়ারের অনুগ্রহভাজন শিল্পপতিদের বানানো বেআইনি বাড়ি একের পর একটা ভেঙেছে — বোম্বাই শহরে। তার মুখে চুনকালি মাখানো তো পত্রিকার কর্তব্য!

এই কারণেই সংবাদপত্র মাঝে-মাঝে আদর্শচ্যুত হয়ে পড়ে। সাধারণ পাঠক এই দ্বিমুখী-নীতিটার হেতু বুঝে উঠতে পারে না। তারা ঐ আনন্দবাজারের প্রথম পাতাতেই দেখেছে ছবি — শেষন গ্রেট-ইস্টার্ন হোটেলে এসে উঠেছেন বলে ট্রামরাস্তায় কী প্রচণ্ড ভীড় হয়েছে। ক্যাপশানে বলা হয়েছিল — অমিতাভ বচ্চন বা বোম্বাইয়ের কোনও স্টার-নায়িকা নয়, শেষনকে দেখার জন্য এই জনারণ্য। সেই শেষনকে ঐ আনন্দবাজারই কেন বলা হচ্ছে তিনি শুধু লনের ঘাস জ্বালানো হাতেগরম বক্তৃতা ছাড়া আর কিছু দিতে জানেন না!

ধরুন ঐ আনন্দবাজারেরই 22 জানুয়ারি '95-এর রবিবাসরীয়ের প্রধান প্রতিবেদন "**গুরুবাবা পার করে গা!**"

"গুরু ও বাবাজিরা জাঁকিয়ে ধর্মের ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছেন বিংশ শতাব্দীর এই শেষ পর্বেও। ধনী, দরিদ্র, শিক্ষিত, অজ্ঞ, এমনকি মন্ত্রী-আমলা-কোটিপতিদের মধ্যে অনেকেই এঁদের মোহজালে বন্দি।.. লিখেছেন সুপ্রতিম সরকার।"

এবারও আট কলামব্যাপী দীর্ঘ প্রবন্ধ। নিচে পাঁচটি আলোকচিত্র : (1) বালক ব্রহ্মচারীর সঙ্গে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু ও ক্রীড়ামন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তী, (2) সদাচারী ও অটলবিহারী বাজপেয়ী (3) সাঁইবাবা ও প্রধানমন্ত্রী নরসিংহ রাও (4) চন্দ্রস্বামী ও দেবীলাল (5) সাঁইবাবা ও এস. বি. চহ্বান।

আনন্দবাজারের প্রেস-ফটোগ্রাফার কিন্তু ঐ গ্রুপে অভীক সরকার বা অরূপ সরকারের সঙ্গে কোন গুরুবাবার ছবি ছাপেননি। কেন? তাঁরাও তো কোটিপতি! এবং গুরুবাবায় বিশ্বাসী! না হলে কেন প্রতিদিন আনন্দবাজারে ছাপা হচ্ছে : 'আপনার আজকের দিনটি...?' কেন প্রতিদিন দুই-নম্বর পাতায় বশীকরণসিদ্ধ বাবা এবং মা-দের ফটো দিয়ে ছাপা হয় তিন কলাম ব্যাপী : "**জ্যোতিষবাবা পার করে গা**"-র বিজ্ঞাপন:

> বাক্‌সিদ্ধ অর্কজ্যোতিঃ / গুয়াহাটিতে মহাজ্যোতিষ নক্ষত্রবৃন্দ / আদিশ্রীভৃগু / তান্ত্রিক জ্যোতিষ / রাজ-জ্যোতিষী ত্রিক্-পদ্ধতিতে বিদ্যা কর্ম, রোগ, বিবাহ, সন্তান, ব্যবসা, অর্থোপার্জন, মামলা, এমন বিষয়ে অভ্রান্ত গণনা ও প্রতিকার / প্রেম, বিবাহ, বিদ্যায় উন্নতি, পরীক্ষা পাস, বশীকরণে সিদ্ধহস্ত!

ঐ সামান্য কয়েকটি বিজ্ঞাপন না ছাপালে পত্রিকা উঠে যাবে এমন আশঙ্কা বিজ্ঞাপন সম্পাদকেরও নেই, মালিকেরও নেই। তাহলে যে রবিবাসরীয় সংখ্যায় 'গুরুবাবা পার করে গা' জাতীয় প্রবন্ধ ছাপা হচ্ছে অন্তত সেই সংখ্যায় কি এ জাতীয় বিজ্ঞাপন বন্ধ রাখা যেত না? আসল ব্যাপারটা হচ্ছে অন্যরকম : দৈববিশ্বাসী অসহায় মানুষের মাথায় পনস-বিদীর্ণ করে ক্ষুন্নিবৃত্তির ব্যবসা ফেঁদেছেন যেসব গুরুবাবা, তাঁদের উচ্ছিষ্ট ভক্ষণেই উদরপূর্তি করছেন চেলার দল! গুরুবাবাদের সংখ্যা সামান্য — হাতের আঙুলে গোনা যায়, কিন্তু ঐ উচ্ছিষ্টভোগী চেলার দল অগুণতি। আর তার ভিতর আছেন কোটিপতি স্বর্ণকার থেকে কোটিপতি সংবাদপত্রের মালিক! সুপ্রতিম সরকার মশাই একটু ধীর-স্থির ভাবে চিন্তা করলেই বুঝতে পারবেন : বিলাতের ব্যারিস্টার জ্যোতি বসু যে কারণে বালক ব্রহ্মচারীকে সহ্য করেছেন, ঠিক সেই কারণেই সুশিক্ষিত অভীক সরকার সহ্য করছেন ঐ 'বাক্‌সিদ্ধ বশীকরণের ত্রিক্‌-পদ্ধতি'! জ্যোতি বসু চান : ভোটার — তারা দৈববিশ্বাসী ; অভীকবাবু চান : ক্রেতা পাঠক — তারাও দৈববিশ্বাসী। তাই নিজে বিশ্বাস করুন বা না করুন 'সব্যসাচী'-কে দিয়ে প্রতিদিন তাঁকে লেখাতে হয় : "আপনার আজকের দিনটি : তট্‌-তট্‌-তট্‌ তোটয়... ঘুন্‌ ঘুন্‌ ঘুন, ঘুনাপয়!"

আমাকে ভুল বুঝবেন না। একাধিক সংবাদপত্র ক্রয়ের অর্থ ও পাঠের সময় আমার নেই। তাই আনন্দবাজারই কিনি, ঐটাই চিনি। মনে হয়, অন্যান্য সংবাদপত্রেরও একই অবস্থা : আজকাল, বর্তমান, প্রতিদিন, গণশক্তি ইত্যাদি প্রভৃতি। গোটা মিডিয়ার এই হাল — ক্রেতাপাঠককে খুশি রাখতে হবে আবার বড় বড় শিল্পপতিদেরও চটানো চলবে না। শ্যাম ও কুল দুটোকেই কব্জা করা চাই!

* * *

সমাজবিজ্ঞানী আশিস নন্দী 'ইন্ডিয়া টুডে' (15.10.94)-র সাংবাদিকের কাছে এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন :

> আমলারা আজ বুঝতে পারছেন, নেতাদের মাত্রাতিরিক্ত সমীহ করার কোন প্রয়োজন নেই। কোনও একটা ইসুতে যদি তাঁরা খোলাখুলি বিদ্রোহের সাহস দেখাতে পারেন তাহলে জনগণকে সঙ্গে পাবেন। রাজনৈতিক নেতারা জনচেতনায় অবলুপ্তির পথে। মধ্যবিত্ত থেকে শুরু করে মিডিয়ার লোকজন সবাই এখন অরাজনৈতিক কোনও গোষ্ঠীর উদ্ভাবনের জন্য অধীর অপেক্ষায় প্রহর গণছেন। উদার-অর্থনীতির এই জমানায় সাহসী আমলারাই সরবরাহ করতে পারেন সেই বিকল্প। নব্বই কোটির এই দেশে আপাতত খেলা আর সিনেমা বাদ দিয়ে তাঁরাই একমাত্র খোঁজ দিতে পারেন রোল মডেলের।

অত্যন্ত খাঁটি কথা। আমরা সকলে এখন অরাজনৈতিক একদল নিঃস্বার্থ, সৎ,

তীক্ষ্ণবুদ্ধি নেতার প্রতীক্ষায় অধীর আগ্রহে প্রহর গণছি।

রিজাইন দিয়ে-বেরিয়ে আসা এইসব তিতিবিরক্ত বিদ্রোহী অফিসার ঐ জাতীয় একটা সর্বভারতীয় দল কি গঠন করতে পারেন না? সেই গোষ্ঠীপতিদের প্রথম এবং একমাত্র শর্ত : তাঁরা সমাজসেবায় আত্মনিয়োগ করবেন **কিন্তু কোনদিন নির্বাচনে প্রার্থী হবেন না**। কী বিধানসভায়, কী সংসদে! কী মিউনিসিপ্যাল ইলেকশানে, কী পঞ্চায়েতী-চুনাওয়ে। প্রতিটি রাজ্যে পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত এমন এক-একটি সংগঠন গড়ে তুলতে চাই — যার পরিচালন-দায়িত্বে থাকবেন ঐসব 'বিদ্রোহী আমলা', যাঁরা সরকারী দুর্নীতিতে বিরক্ত হয়ে বেরিয়ে এসেছেন। তাঁরা আইনজ্ঞ, অতি-উচ্চশিক্ষিত, পরীক্ষায়-ফার্স্ট-হওয়া, ধুরন্ধর এবং 'আনমোল মোতি'। আমরা তাঁদের মাথায় তুলে রাখব। ভাগলপুরে যেমন হয়েছে, তেমনি বড় বড় শহরে — দিল্লী, পাটনা, বোম্বাই, কলকাতার প্রতিটি মহল্লায় গড়ে উঠবে এক একটি প্রতিরক্ষা-কমিটি। অরাজনৈতিক নেতা আমাদের রাতের পাহারার ডিউটি ভাগ করে দেবেন। যাতে চুরি-ডাকাতি ঠেকানো যায়। আমরাও আগ্নেয়াস্ত্রের জন্য লাইসেন্স চাইব। হয়তো পাব না। যে রাজনীতি-ব্যবসায়ীর ছত্রচ্ছায়ায় ঐ মস্তানেরা চুরি-ডাকাতি-ছিনতাই করার গোপন অনুমতি পেয়েছে তাঁদের কলকাঠি নাড়ানোতে। তা হোক। আমরা তিনটি বিষয়ে ওদের উপরে। এক : আমাদের নৈতিক সাহস আছে, যা নেই ওদের। দুই : আমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। তিন : আমরা *দেবী চৌধুরানী* পড়েছি, *পথের দাবী, ভবানীমন্দির* পড়েছি এবং পড়েছি মার্কিন বৈজ্ঞানিক মারী ক্লেয়ার কিং-এর কৈফিয়ৎ (আর্জেন্টিনার শিশু-অপহারক গুণ্ডাদলের বিরুদ্ধে মারণাস্ত্র-ব্যবহারের কৈফিয়ৎ হিসাবে) "It is useless to question the motives of bastards. They just do what they do, and it is our duty to stop them." — ঐ পার্টি মস্তানরা তা পড়েনি!

আমাদের 'প্রতিরক্ষা কমিটি' লক্ষ্য রাখবে পাড়ার চৌহদ্দিতে কারা সাম্প্রদায়িক বিষ ছড়ানোর মন্ত্রণা দিচ্ছে। তাদের পাড়ায় ঢোকা আমরা বন্ধ করে দেব — কী হিন্দু, কী মুসলমান। নির্বাচনের আগে প্রতিটি দলের প্রার্থীকে আমরা জানিয়ে দেব : যে প্রার্থী দেওয়াল নোংরা করবে তাকে আমরা ভোট দেব না। তা সত্ত্বেও যদি পার্টি-ক্যাডাররা দেয়াল নোংরা করতে আসে, তাহলে আমরাও চুনের বালতি নিয়ে সে লেখা মুছতে মুছতে যাব। পার্টির পাদুকাবাহী ক্যাডারদল হয়তো ঘুরে দাঁড়াবে, আমাদের মারধোর করবে। আপনি — আমাদের অরাজনৈতিক দলনেতা — আমাদের নিয়ে থানায় যাবেন। এতদিন ওরা আমাদের এফ. আই. আর. লিখতে দিত না, যতক্ষণ এলাকার এম. এল. এ. দাদা অনুমতি না দেন। আপনার বেলা ঘটনা অন্য রকম হবে। ও. সি. চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াবে। বলবে, স্যার! আপনি?

বল্‌বেই। কারণ দুদিন আগে সে আপনাকে গার্ড অব অনার দিয়েছিল। আর তাছাড়া

দুদিন পরেই তাকে যে কৈফিয়ৎ দিতে হবে ঐ 'পাগলা কুকুরের' স্থানীয় পর্যবেক্ষকের কাছে। জমানা বদলে যাচ্ছে তো?

আপনার হুকুমে পাড়ার সার্বজনীন পূজার ঠাকুর নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে বিসর্জন দিতে হবে। রাত দশটার পর মাইকে 'ফিল্‌মি গানা' বাজিয়ে দুর্গা-কালী বা 'স্‌রস্‌স্‌তি' মাঈকে প্রীত করতে দেওয়া হবে না। রাস্তার নোংরা ফেলা চলবে না, ইভ-টীজিং যারা করে তাদের আমরা কানে ধরে ওঠবোস করাবো। ক্লেদকল্লোলিনী কলকাতাকে আমরা সিঙাপুর করে ছাড়ব!

কে খরচ দেবে? বাঃ! মস্‌তান পার্টিকে বাধ্য হয়ে চাঁদা দিতাম, আপনাকে খুশি হয়ে দেব না? নিশ্চয় দেব — যেমন দিয়েছিল সিধ্‌পুরের হিন্দু-মুসলমান। না! কোন শিল্পপতির কাছে আমরা চাঁদা চাইব না। ওরা আগ বাড়িয়ে দিতে এলেও প্রত্যাখ্যান করব। বরং আমরা ভিক্ষার-ঝুলি বাড়িয়ে দেব সাগরপারে। কেন? শুনুন বলি :

দীন-দুখিনী ভারতজননী তাঁর শ্রেষ্ঠ সন্তানদের আঁচলের খুঁটে বেঁধে রাখতে পারেননি। বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরা ছাত্রছাত্রীর দল — আই. আই. টি., শিবপুর, যাদবপুর, মেডিকেল কলেজ থেকে ফার্স্ট-সেকেন্ড হয়ে ওরা দেশান্তরী হয়ে গেছে। এই রাজনীতি-ব্যবসায়ীর দল নিজের পকেট আর পার্টি নিয়ে চার-পাঁচ দশক ধরে এত ব্যস্ত ছিল যে, এই 'ব্রেনড্রেনের' বিরুদ্ধে বাঁধ দেওয়ার কোনও চেষ্টাই হয়নি। যত ভূষিমাল অলঙ্কৃত করেছে আমাদের বিধানসভা আর সংসদ। আপনি জানেন, আপনারা জানেন, কারণ আপনারই ভাইবোন, ভাইপো, ভাগ্নে, জামাই, সন্তানেরা আজ ছড়িয়ে আছে — আমেরিকায়, ব্রিটেনে, জার্মানিতে, জাপানে, অস্ট্রেলিয়ায়। তারা সবাই 'দিওয়ানা' হয়ে গেছে, কেউ বা 'খোরানা'।

ওরা ভারতবর্ষে কোনদিন ফিরে আসতে পারবে না, কিন্তু দেশের জন্য ওদের প্রাণ কাঁদে। কাঁদবেই! ওরা যদি জানতে পারে আমরা এদেশ থেকে স্বজনপোষণ, উৎকোচ, গুণ্ডামি, আর মস্তানিকে তাড়িয়ে দেবার ব্যবস্থা করছি তাহলে... হ্যাঁ — প্রথমটা ওরা বিশ্বাস করবে না। মনে করবে, এ আমাদের এক নতুন ফন্দি। কিন্তু সেটা প্রথম প্রথম। তারপর যখন দেখবে, ঐ স্বার্থসর্বস্ব হোলটাইম প্রফেশনাল রাজনীতিজীবীদের আমরা বিদায় করছি, করেছি, তখন তারাই এগিয়ে আসবে সাহায্য করতে। টাকা দিয়ে নয়, ডলার দিয়ে, পাউন্ড দিয়ে, ডয়েশমার্ক দিয়ে। আমরা গরিব, কিন্তু এই বৃদ্ধ দধীচিদের প্রবাসী বুকের পাঁজরাগুলো তো গরিব নয়, না আর্থিক বিচারে, না দেশপ্রেমে, মুক্তহস্ততায়, কিংবা বজ্রশক্তিতে!

হে অনাগত অরাজনৈতিক নেতা! অর্থের কথা আপনি চিন্তা করবেন না। শুধু একটি বিষয়ে আমাদের আপনি আশ্বস্ত করুন : একটা অন্যায় দাবী কোনদিন করে বসবেন না।

ভোট **চেয়ে বসবেন না যেন!** কারণ আমরা জানি, একবার কোনক্রমে বিধানসভায় ঢুকে পড়লেই আপনি আদ্যন্ত বদলে যাবেন। গাধার মতো হাঁক্কো হাঁক্কো ডাকবেন, কুকুরের মতো পরস্পরের ঠ্যাঙ কামড়ে দেবেন, মহিলা বিধায়ককে পায়ের চটি খুলে দেখাবেন, এবং তলে তলে দক্ষিণ কলকাতায় আড়াই হাজার স্কোয়ার ফুটের বাড়ি বানিয়ে মিডিয়াকে ম্যানেজ করবেন, যাতে নামটা প্রকাশ না পায়।

আর সাংসদ হলে?

সুইস ব্যাঙ্কে একটা নম্বরী অ্যাকাউন্ট হবে তখন আপনার ধ্যান-জ্ঞান-নিদিধ্যাসন!

শুধু একটি বিষয়ে — মাপ করবেন আশিস নন্দী মশাই — আপনার সঙ্গে আমি একমত হতে পারিনি। নিরন্ন, অদ্যভক্ষ্য, শ্রমজীবী, নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত এমনকি উচ্চমধ্যবিত্তকেও আমরা দলে পাব, কিন্তু পাব না সংবাদপত্র-মিডিয়ার অধিকাংশ উচ্চপদে আসীন সাংবাদিককে। তাঁরা এখনো এজন্য প্রস্তুত নন। তাঁদের বৃকোদরভাগ আজও পরের পয়সায় প্রেস ক্লাবে 'বিলাইতি'র পাত্র হাতে ঐ 'অখ্যাত' খেরনার, 'পাগলা কুকুর' শেষন, 'বুড়বক' অর্কপ্রভ অথবা 'পিগ্‌হেডেড লেডী' চন্দ্রলেখার কিস্‌সা সংগ্রহে আগ্রহী। কিন্তু আপনি যাঁদের ঐ 'বিদ্রোহী আমলা' বলেছেন তাঁদের কথা তো পঞ্চান্ন কোটি ভোটারের কাছে পৌঁছে দিতে হবে! কে দেবে? মিডিয়া যদি বিলাইতি-বিভোর হয় অথবা দু নৌকায় পা দিয়ে চলতে চায়?

আচ্ছা, আমরা কি দায়িত্বটা আপাতত ঐ লিট্‌ল ম্যাগাজিনকে দিতে পারি না? তারা তো মাল্‌টিপারপাস্‌ কোম্পানির বিজ্ঞাপনের তোয়াক্কা রাখে না! স্বগৃহে ক্ষুন্নিবৃত্তি করে বন্যমহিষ বিতারণে তারা ব্রতী। তাদের পত্রিকার বিক্রি কম, কিন্তু তারা সংখ্যায় বেশি। তাদের নিষ্ঠা, দেশপ্রেম এবং আন্তরিকতা অতুলনীয়! যে সংবাদ মিডিয়া ছাপে না, অথবা একলাইনে দায়সারা করে ছাপে — "জামনগরের সি .কে .ঝা, পশ্চিমবঙ্গের বিশ্বজিৎ মুখার্জি, পাটনার শ্রীনিবাস রামানুজ, পঞ্জাবের স্মরণ সিংহ" তাদের ওঁরা তুলে ধরতে পারেন। যদি এঁদের এক-একজনকে নিয়ে এক-একটি কভার স্টোরি লেখা যায় লিট্‌ল্‌-ম্যাগাজিনে, আমাদের বিশ্বাস তাহলে পাঠক হুমড়ি খেয়ে পড়বে তা কিনে পড়তে। কারণ এ যে তাদেরই ইচ্ছাপূরণের কাহিনী — 'রোজ কতকি ঘটে যাহা তাহা/এমন কেন সত্যি হয় না, আহা।' সুতরাং আপাতত ঐ অগণিত লিট্‌ল্‌-ম্যাগাজিনের সম্পাদক আর লেখক — ঐ যাঁরা চারমিনার ছেড়ে বিড়ি ধরেছেন, এক বইমেলা থেকে আর এক বইমেলায় পত্রিকাটিকে বাঁচিয়ে রাখতে — তাঁদের কাছেই আমাদের অনুরোধ : পঞ্চান্ন কোটি ভোটারকে, নব্বই কোটি বঞ্চিত দেশবাসীকে আপনারা জানিয়ে দিন : রথের রশিতে টান পড়েছে। চাকা ঘুরতে শুরু করেছে!

একটা ভুল হল। পঞ্চান্ন কোটি ভোটার সাক্ষর নয়। দাদারা পার্টিফান্ড আর

পকেটফান্ড নিয়ে বিগত আটচল্লিশ বছর এত ব্যস্ত ছিলেন যে, দেশের অধিকাংশ মানুষই নিরক্ষর। আপনারা সহযোগিতা করলে আমরা আরও কয়েক রকম ব্যবস্থা করতে পারি। প্রতি বছর দুর্গাপূজায়, কালীপূজায় তো আমরা মূর্তির আবরণ উন্মোচন করতে, সম্বর্ধনা জানাতে ষড়যন্ত্রী মশাইদের ডেকে আনি, অথবা পাড়ার বিধায়ক, বা সাংসদকে। কিংবা কোন লেখক, সঙ্গীতজ্ঞ বা ফুটবল প্লেয়ারকে? 'ফর এ চেঞ্জ' — এ বছর ঐ জাতীয় কিছু সৎ সরকারী কর্মীকে ডেকে আনুন না? তেইশপল্লীর মূর্তির আবরণ উন্মোচন করুন হোমগার্ড রবি ভট্টাচার্য — যিনি মস্তানপার্টির হাত থেকে ছয়লক্ষ টাকার থলিটা ছিনিয়ে নিয়েছিলেন! কিন্তু আত্মসাৎ করেননি! বাঁকুড়ার সার্বজনীন দুর্গাপূজায় রীণা বেঙ্কটরমণকে একটি শাড়ি-নারকেল-গাঁদা ফুলের মালা দিয়ে সম্বর্ধনা জানানো যায় না? এবং মেদিনীপুরে : সুরেশ কুমারকে! মুখে মুখে তাহলে প্রচার হবে এঁদের কীর্তি কথা! আমরা যে ঐ সব সৎ, বিদ্রোহী সরকারী সেবকদের প্রতি কৃতজ্ঞ এটা প্রমাণিত হবে।

তবে হ্যাঁ, আমরা বিশ্বাস করি : 'মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ।' তাই আশা করব : মিডিয়ার একটি আদর্শবান অংশ আমাদের সংগ্রামে সামিল হবেন। ঐ যাঁরা ইতিপূর্বেই সংবাদ সংগ্রহ করে জানিয়েছেন : সঞ্জয় মুখার্জি, নজরুল ইসলাম, অর্কপ্রভ দেব, বিশ্বনাথ মুখার্জিদের নির্ভীক সংগ্রামের কথা। এই সরকারী আমলারা কেউই পদত্যাগ করেননি। কিন্তু এঁদের সততায় আজ রাজনীতি-ব্যবসায়ীর দল থরহরি কম্পমান। ঐ সব বেয়াড়া অফিসারের বিরুদ্ধে ইদানীং শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভবপর হচ্ছে না। নির্বাচন আসন্ন। জনগণ সচেতন। বিজুবাবু, শারদ পাওয়ার কর্পূর হয়ে গেছেন! আর শোনা যাচ্ছে, ভূতেরা এবার ভোট দিতে পারবে না, ফটোর অভাবে। নির্বাচন যজ্ঞটা তাছাড়া হবে অন্য কোনও মন্ত্রে! 'পাগলা কুকুর'টা শোনা যাচ্ছে চার্বাকপন্থী : Rig-বেদ মানে না!

* * *

স্বাধীনতার পর প্রথম কয়েক বছর মন্ত্রী আর আমলাদের মধ্যে কোনও তীব্র বিরোধ ছিল না। অন্যান্য রাজ্যের কথা জানি না। বলছি পশ্চিমবঙ্গ ও কেন্দ্রীয় সরকারের কথা। তার অনেকগুলি হেতু। দু'জায়গাতেই আদিসুরি দুজন বিশ্ববিশ্রুত পণ্ডিত। যেমন তাঁদের ব্যক্তিত্ব তেমনি নিঃস্বার্থ দেশপ্রেম, কেন্দ্রে জওয়াহরলাল ও পশ্চিমবঙ্গে বিধানচন্দ্র। দ্বিতীয়ত, তখন প্রশাসনের উপরতলায় ছিলেন ব্রিটিশ আমলের ধুরন্ধর কিছু আই. সি. এস.। তাঁরা শিক্ষিত, সুশাসক, ন্যায়নিষ্ঠ এবং সুপণ্ডিত। তাছাড়া 'চামচে' সম্প্রদায় তখনো গড়ে ওঠেনি।

চল্লিশের দশকের শেষ পর্যায়ে কোন কোন ঘটনায় মন্ত্রী-আমলা বিরোধের ইঙ্গিত

বাণিজ্যমন্ত্রী ক্ষিতীশচন্দ্র এবং তাঁর আমলাকুল

ছিল। কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রী ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী প্রধানমন্ত্রীর কাছে অভিযোগ করেছিলেন যে, তাঁর সচিব এবং পদস্থ আমলারা তাঁকে উপেক্ষা করে সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন! জওয়াহরলাল এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবার পূর্বেই ঘটে গেল আর একটা যুগান্তকারী ঘটনা, পূর্ব-পাকিস্তান থেকে ক্রমাগত উদ্বাস্তু আসায় পশ্চিমবাঙলার অর্থনৈতিক কাঠামো ভেঙে পড়ার উপক্রম করল। ডঃ রায় নেহেরুকে কঠোর কিছু ব্যবস্থা নিতে বললেন। নেহেরুর-আমন্ত্রণে পাকিস্তান থেকে লিয়াকৎ আলী এলেন আলোচনা করতে। আলোচনা শেষে দুই প্রধানমন্ত্রী স্বাক্ষর করলেন নেহরু-লিয়াকৎ চুক্তিতে। পঞ্চাশ সালে, এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে।

নেহরুজীর আমন্ত্রণে সস্ত্রীক লিয়াকৎ
ভারতে এলেন 'হিন্দু সমস্যার' সমাধানে

এই অবাস্তব এবং পশ্চিমবাংলা তথা ভারতের ক্ষতিকর চুক্তি স্বাক্ষরের প্রতিবাদ করলেন শ্যামাপ্রসাদ। নেহেরু কর্ণপাত না করায় সরবরাহ মন্ত্রী ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ এবং বাণিজ্যমন্ত্রী কে. সি. নিয়োগী কেন্দ্রীয় মন্ত্রীত্ব থেকে পদত্যাগ করলেন। মাত্র একমাসের মধ্যে একই হেতুতে পদত্যাগ করলেন অর্থমন্ত্রী ডাঃ জন মাথাই। নেহেরু নির্বিকার। ভারতবাসী বিক্ষোভ করেনি।

তার তিনমাস পরে কুসংস্কারাচ্ছন্ন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডাঃ কে. এম. মুন্সি কোথা থেকে জোগাড় করে আনলেন এক 'পানিবাবা'-কে। ঐ পানি মহারাজের পরামর্শ-মতো ইরিগেশান টিউবওয়েল খননের আয়োজন হল। জলসরবরাহের বিশেষজ্ঞ এঞ্জিনিয়াররা

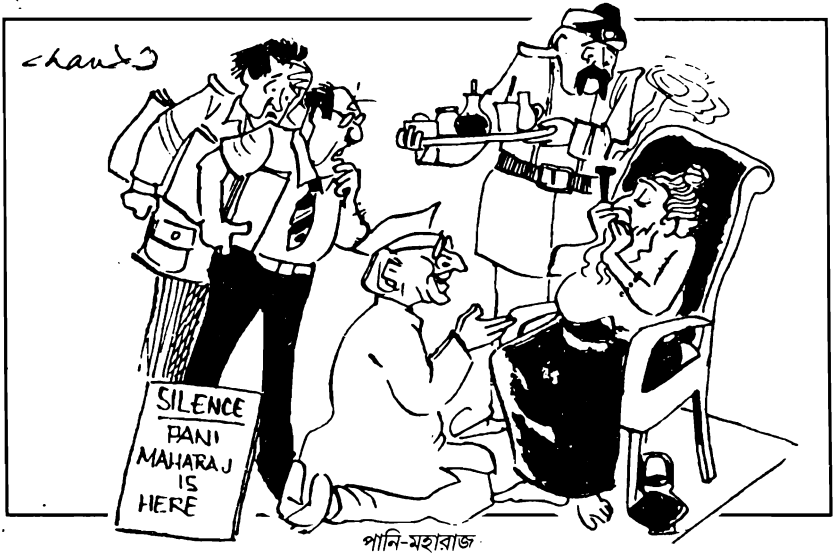

পানি-মহারাজ

ক্ষুব্ধ হলেন। মন্ত্রীর গাজুরি হুকুমে এই মারাত্মক কুসংস্কার সরকারী স্বীকৃতি পাওয়ায় স্বতই একদল বিজ্ঞানমনস্ক এঞ্জিনিয়ার, বিজ্ঞানী, ও আমলা মন্ত্রীর সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠেন। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী এ বিষয়ে কোনও ব্যবস্থা নেননি। পানি-মহারাজের ব্যর্থতাতেই এ বুজরুকির অবসান হল।

ঐ সময়কার একটি মন্ত্রী-আমলা দ্বৈরথ সমরের কাহিনী আমি জানতে পেরেছিলাম নিতান্ত ভাগ্যক্রমে। বোধকরি সেটাই স্বাধীন ভারতে প্রথম বিরোধ : গোলিয়াথ ভার্সেস ডেভিড। কাহিনীটি শুনেছিলাম এক্কেরে ফার্স্টহ্যান্ড প্রত্যক্ষদর্শীর মাধ্যমে ; আমার বাল্যবন্ধু সুকুমার মুখার্জির মুখ থেকে। সুকুমার বছর পাঁচেক হল স্বর্গে গেছে ; কিন্তু

তার কাছে শোনা ঘটনাটা ভুলিনি।

নেহরু-লিয়াকৎ চুক্তির ভিতর একটি শর্ত ছিল : উত্তরবঙ্গের বেরুবাড়ি গ্রামের আধখানা নেহরুর প্রতিশ্রুতিমতো দিয়ে দিতে হবে পূর্ব পাকিস্তানকে। কীভাবে ভাগটা হবে? চুক্তির শর্ত এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট, প্রাঞ্জল : "এত নম্বর মৌজার অন্তর্গত বেরুবাড়ি গ্রামের যে সেট্‌ল্‌মেন্ট-ম্যাপ আছে, তার এত-নম্বর খতিয়ান বর্ণিত ১৩০৫ নম্বর দাগে যে প্লট, তার উত্তর-পূর্ব কোণ স্পর্শ করে পূর্ব-পশ্চিমে-টানা একটি 'হরিজেন্টাল' (আনুভূমিক, দিগন্তের সঙ্গে সমান্তরাল) সরলরেখার উত্তরাংশ পূর্ব পাকিস্তানের, দক্ষিণাংশ ভারতের।"

সুকুমার করিৎকর্মা, ধুরন্ধর। সে ছিল সেট্‌ল্‌মেন্টের ইন্সপেক্টার, তার বড়কর্তা — নামটা একটু পরিবর্তন করে লিখছি : রঘুনাথ চট্টোপাধ্যায় আই. এ. এস.। তাঁর খানদানি চেহারার বর্ণনা আমি দেব না। কালিদাসের 'রঘুবংশ' পড়ে নেবেন। এটুকু বলি : উচ্চতায় তিনি তাঁর মুখ্যমন্ত্রীর মতো। স্বাস্থ্যও উচ্চতার মানানসই। জনশ্রুতি : তাঁর হুকুমে শার্দুল ও বলিবর্দ তাদের জোরা রেফ-এর কথা ভুলে একঘাটে জল খায়।

ডাক্তার রায়ের হুকুমে রঘু চাটুজ্জে বেরুবাড়ি ঘুরে এলেন। ফিরে এসে সুকুমারকে ডেকে বললেন, শোন মুখুজ্জে! আমি সব দেখেশুনে এসেছি, তোমরা তোমাদের পুব-পাকিস্তানের কাউন্টার-পার্টের সঙ্গে ইমিডিয়েটলি যোগাযোগ কর। চিঠি নয়, সব বার্তা আর্জেন্ট টেলিগ্রাম। সব চিঠিতেই যেন ছাপা থাকে 'টপ-প্রায়োরিটি।' তোমরা গ্রামটা যৌথভাবে জরিপ কর। ওখানে গোটাতিনেক ডব্‌ল্‌-ফ্লাই তাঁবু-খাটাও। আমি মাসে একবার করে যাব, থাকব! টিউবওয়েল বসাও। দরকার হলে কাঁটাতার দিয়ে ঘিরে ফেল। ক্যাম্প অফিসে বড় করে সাইন-বোর্ড টাঙাও! ইন ফ্যাক্ট, তুমিই ইনচার্জ। তোমাকে আমি সব রকম অধিকার দিয়ে রাখছি। খরচ করতে পেছপাও হয়ো না। তোমাকে প্লেনিপ্যটেনশরি পাওয়ার দিয়ে রাখলাম। 'Plenipotentiary power' বোঝ?

সুকুমার সেন্ট জেভিয়ার্সের গ্র্যাজুয়েট। মাথা নেড়ে বলে, হ্যাঁ, স্যার। 'পূর্ণক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি'।

: করেক্ট। শুধু একটা কাজ করে বসো না, বাবা। একটি বিষয়ে তোমার 'পূর্বপ্রদত্ত ক্ষমতা' নেই, এটা মনে রেখ। দেখ, আমি রিটায়ার করার আগে বেরুবাড়ি গাঁয়ের আধখানা যেন পাকিস্তানে চলে না যায়!

সুকুমার তো হাঁ। বলে, মানে? বেরুবাড়ি হস্তান্তর হবে না?

: অন্তত রঘু চাটুজ্জে বেঁচে থাকতে নয়!

পরে সুযোগ মতো রঘু চাটুজ্জে মশাই তার হেতুটা সুকুমারকে জানিয়েছিলেন। বেরুবাড়ি হস্তান্তরের পিছনে — ওঁর মতে — হাত ছিল একজন উচ্চপর্যায়ের মৌলবাদী মুসলমান নেতার। তাঁর বাড়ি বেরুবাড়ির উত্তরাংশে। তাঁর বিরুদ্ধে অনেকগুলি ফৌজদারী মামলা। তাঁরই ইচ্ছায় এই বেরুবাড়ি বিভাগের আয়োজন। মামলা তাহলে কলকাতা থেকে ঢাকায় চলে যাবে।

সুকুমার হাত কচলে বলেছিল, কিন্তু স্যার, নেহেরু-লিয়াকৎ দুজনেই যখন ...

ওকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে রঘু চাটুজ্জে সিংহগর্জনে জানতে চেয়েছিলেন, বছরের শেষে তোমার সি. সি. আর.-টা কে লিখবেন? নেহেরু? না লিয়াকৎ আলি?

সুকুমার কথা বাড়ায়নি। 'সি. সি. আর.' মানে কনফিডেনশিয়াল ক্যারেকটার রোল। যার মার্কিঙে নির্ভর করবে ওর প্রমোশন।

তারপর তিন-তিনটে বছর কেটে গেছে। তিপ্পান্ন সালের মে মাসের ছয় তারিখে বিনা পারমিটে ভারতভুক্ত কাশ্মীরে পদার্পণের অপরাধে প্রাক্তনমন্ত্রী শ্যামাপ্রসাদকে গ্রেপ্তার করা হল। তেইশে জুন সুস্থ সবল মানুষটি কাশ্মীরের জেলে রহস্যজনকভাবে 'মারা' গেলেন। নেহেরু বোধকরি বলেছিলেন, 'এমনটা তো হয়েই থাকে'। অথচ শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যুর দুই মাসের মধ্যেই স্নেহভাজন আবদুল্লাকে সরিয়ে নেহেরু বক্‌সি গোলাম মহম্মদকে কাশ্মীরের প্রধানমন্ত্রী করে দিলেন। বহু প্রশাসক-কর্তা বিরক্ত হয়েছিলেন। প্রতিবাদ করেননি।

ইতিমধ্যে বেরুবাড়িতে দু-তরফেই তাঁবু গাড়া হয়েছে। নলকূপ বসানো হয়েছে। কাঁটা তারের বেড়া দেওয়া হয়েছে। জোর-কদম জরীপ হচ্ছে — চেন, প্লেন-টেব্‌ল্‌, ম্যাগ্‌নেটিক্‌ কম্পাস্‌, থিয়োডোলাইট। পাক্কা তিনবছরেও কিন্তু জরীপ শেষ করে বিভাজন-নির্দেশক একখানা ম্যাপ বানানো যায়নি। পাকিস্তান থেকে তাগাদার পর তাগাদা পেয়েছেন নেহরু। সঙ্গে সঙ্গে তাগাদা দিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের চীফ সেক্রেটারিকে; তিনি তাগাদা দিয়েছেন রঘু চাটুজ্জেকে। রঘু একের পর এক টেলিগ্রাম পাঠিয়েছেন বেরুবাড়ির ক্যাম্প অফিসে। সুকুমার সার্ভেয়ারদের 'ন ভূতো ন ভবিষ্যতি' গালমন্দ করেছে।

ম্যাপ হয়নি!

অবশেষে নেহেরু স্বয়ং এলেন কলকাতায়। আরও পাঁচটা কাজ ছিল। অ্যাজেন্ডার সাত নম্বর আইটেম : "বেরুবাড়ি ইসু। সাতদিনের মধ্যে হস্তান্তর করা চাই।"

আলোচনাটা হচ্ছে রাজভবনে। মাঝখানে মধ্যমণি হরেন্দ্রকুমার — থেলো হুঁকা হাতে। এপাশে জওয়াহরলাল। কুর্তা পাজামা, পকেটে টুক্‌টুকে লাল গোলাপ। ওপাশে অকৃতদার ধন্বন্তরি। এছাড়া কেন্দ্রীয় সরকারের ক্যাবিনেট সচিব আর পশ্চিমবঙ্গ

সরকারের মুখ্যসচিব। বেরুবাড়ি আইটেম পৌঁছানো মাত্র বিধান রায় বললেন, হ্যাঁ, ওটার প্রগ্রেস ভাল, জরীপ প্রায় শেষ হয়ে গেছে। পরের সপ্তাহেই...

বাধা দিয়ে জওয়াহরলাল বললেন, এক্সকিউজ মি, ডক্টর রয়। আমি সেই দীর্ঘদেহী অফিসারটির সঙ্গে সরাসরি কথা বলতে চাই। সেই যে ছোকরা আমাকে দু-বছর আগে 'এক সপ্তাহ' শুনিয়েছিল, গত বছরও 'এক সপ্তাহে'র হিসেব দিয়েছিল।

বিধানচন্দ্র তাঁর মুখ্য সচিবের দিকে তাকাতেই তিনি বললেন, ফাইলপত্র নিয়ে মিস্টার চ্যাটার্জি পাশের ঘরে অপেক্ষা করছেন।

বিধান নিদান হাঁকলেন, রঘুকে ডাক। যা বলার সেই ওঁকে এসে বলুক।

রঘু এলেন। পিছন পিছন সুকুমার। ফাইলপত্র হাতে। সেই প্রত্যক্ষদর্শীর কাছেই এই অনবদ্য আলাপচারীটা শুনেছিলাম আমি।

দীর্ঘদেহী মানুষটিকে দেখামাত্র চিনতে পারলেন নেহেরুজী। ইংরেজিতে বললেন, গত বছর আপনি দিল্লীতে যখন আমার সঙ্গে দেখা করেন তারপর কি এক সপ্তাহ অতিক্রান্ত হয়নি? সাতটা দিন?

রঘু চাটুজ্জে একটা ম্যাজিশিয়ানী 'বাও' করে বলেছিলেন, য়োর এক্সেলেন্সি! আপনার সঙ্গে আলোচনা করার পরে আমরা একটা অলঙ্ঘনীয় বাধার সম্মুখীন হয়েছি। হস্তান্তরযোগ্য ম্যাপটা কিছুতেই বানানো যাচ্ছে না!

: কী বাধা? আমাকে অনুগ্রহ করে একটু বুঝিয়ে বলবেন?

: অফকোর্স, য়োর এক্সেলেন্সি! চুক্তির বয়ানে একটা ম্যাথামেটিক্যাল অ্যাব্‌সার্ডিটি রয়ে গেছে। তাই ওটা কার্যকরী করা যাচ্ছে না।

জওয়াহরলাল কী বলবেন ভেবে পান্‌নি। রঘু চাটুজ্জে চুক্তির একটা ফটো-কপি মেলে ধরে বলেন, এই দেখুন, য়োর এক্সেলেন্সি! চুক্তিতে বলা হয়েছে 1305 নম্বর দাগের উত্তরপূর্ব কোণ স্পর্শ করে পূর্ব-পশ্চিম বরাবর একটি হরিজন্টাল রেখার উত্তরাংশ পূর্ব-পাকিস্তানের, দক্ষিণাংশ ভারতের। এই হচ্ছে বেরুবাড়ির ম্যাপ, এইটে 1305 দাগ নম্বর, আর এইটে তার উত্তরপূর্ব কোণ। কিন্তু এখান দিয়ে পূর্ব-পশ্চিম লম্বা কোনও হরিজন্টাল রেখা তো টানা যাবে না! প্রথম কথা, ম্যাপে 'হরিজন্টাল-রেখা' বলে কিছু থাকে না। ম্যাপে হোরাইজন কোথায়? দ্বিতীয় কথা, কোনটা পুব, কোনটা পশ্চিম?

জওয়াহরলালের মুখ তাঁর পকেটের গোলাপের বর্ণ ধারণ করল। বললেন, আপনি বলতে চান পুবদিক চেনেন না? যেদিকে সূর্য ওঠে সেটাকে তাহলে কী বলেন আপনি?

রঘু চাটুজ্জে সবিনয়ে বলেন, সূর্য প্রতিদিন দিগন্তরেখার একই বিন্দুতে উদয় হয় না, য়োর এক্সেলেন্সি! একই বিন্দুতে অস্তও যায় না!

বিধানচন্দ্র ডাক্তার। তাঁর হয়তো আশঙ্কা হল প্রধানমন্ত্রীর হার্ট-অ্যাটাক হতে

পারে। তাই বাধা দিয়ে বলে ওঠেন, কী আশ্চর্য ; 'ডিউ নর্থ' বলে তো একটা ব্যাপার আছে? না কী? তার থেকে নব্বই ডিগ্রি এদিকে পুব, ও-দিকে পশ্চিম। সোজা হিসাব!

রঘু চাটুজ্জে তৎক্ষণাৎ সবিনয় প্রতিবাদ করেন, নো! য়োর এক্সেলেন্সি। সেটা বছরের দু-দিনের জন্য পুব আর পশ্চিম। ইকুইনক্সের দিনে। চুক্তিটা স্বাক্ষরিত হয়েছে আটই এপ্রিল। সেদিন ইকুইনক্স ছিল না। আমরা কি চুক্তির দিনের পূর্ব-পশ্চিম ধরব, না জিওডেসিক পুব-পশ্চিম?

এতক্ষণে হুঁকো থেকে মুখ সরিয়ে হরেন্দ্রকুমার বললেন, ছোকরা যা বলছে, তা যুক্তিপূর্ণ কিন্তু। চুক্তির তারিখে যেটা পুব-পশ্চিম ছিল, সেটা ভৌগোলিক পুব-পশ্চিম নয়।

জওয়াহরলাল সে-কথায় কান না দিয়ে রঘু চাটুজ্জের দিকে ফিরে বললেন, তার মানে আপনাকে বদলি না করা পর্যন্ত বেরুবাড়ি হস্তান্তরিত হবে না, এই কথাটাই কি এতক্ষণ ধরে বোঝাতে চাইছেন?

বিনয়ে বিগলিত হয়ে রঘু বলেন, নো য়োর এক্সেলেন্সি! আমি বদলি হলেও কোনও সুরাহা হবে না। কারণ আমি আমার সাক্সেসারকে নোট দিয়ে যাব, এই ডিফেক্টিভ এগ্রিমেন্ট অনুযায়ী বেরুবাড়ি ভাগ করতে গেলে গ্রামবাসীরা আদালতে যাবে এবং সহজেই স্টে-অর্ডার পাবে। দেশের প্রধানমন্ত্রী বেইজ্জত হবেন। আদালত শো-কজ করবে : কেন ভ্রান্তচুক্তি কার্যকরী করতে গিয়ে লোকের হয়রানি করা হচ্ছে!

বিধানচন্দ্র সবাইকে তুমি সম্বোধন করতেন। বললেন, দেখ রঘু! কীভাবে বাগড়া দেওয়া যায় সেটা আমরা তোমার কাছে জানতে চাইনি। আমি জানি, সে বিষয়ে তোমার অসীম পারদর্শিতা। কীভাবে ওটা কার্যকরী করা যায় সেটা বলতে পার?

— সেটা সহজেই হতে পারে, য়োর এক্সলেন্সি! ঐ 'সরলরেখা' শব্দটার বিশেষণ 'হরিজন্টাল' কেটে 'ল্যাটিচুডিনাল' লিখে দিলেই ল্যাটা চুকে যায়। অর্থাৎ নিরক্ষরেখার সমান্তরাল একটি সরলরেখা। তাতে পুব-পশ্চিমের বখেড়া নেই। কিন্তু মুশ্‌কিল এই, সেই সংশোধন তো প্রাইম মিনিস্টার অব ইন্ডিয়া একা করলে হবে না। ওঁর কাউন্টারপার্ট হিজ্ এক্সলেন্সি প্রাইম মিনিস্টার অব পাকিস্তান... কিন্তু তিনি তো...

বাক্যটা রঘু চাটুজ্জে শেষ করতে পারেননি। তার পূর্বেই জওয়াহরলাল বলে উঠেছিলেন : য়ু মে প্লীজ লীভ আস্ অ্যালোন!

সসম্মানে অভিনন্দন জানিয়ে রঘু চাটুজ্জে আই. এ. এস. কক্ষত্যাগ করেছিলেন।

পিছন-পিছন আমার বাল্যবন্ধু সুকুমার মুখার্জি!

আমার জ্ঞানমতে স্বাধীন ভারতে এটাই সর্বপ্রথম দ্বৈরথসমর। মন্ত্রী ভার্সেস আমলা। এবং সেবার সেই অসম-যুদ্ধে মহামহিম গোলিয়াথ ভূতলশায়ী হয়েছিলেন সামান্য

ডেভিডের গুল্‌তি-বাঁটুলে!

বেরুবাড়ি রাঘবজমানায় হস্তান্তরিত হয়নি।

তিনি অবসর নেবার পরে হয়েছিল কিনা সেটা এ কাহিনীতে অবান্তর।

* * *

জবাহরলাল দীর্ঘ সতের বছর প্রধানমন্ত্রীত্ব করেছেন। তার ভিতর এমন অনেক কিছু ঘটেছে যার জন্য সাধারণ মানুষ বা আমলারা বিক্ষুব্ধ হতে পারতেন। হননি। শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যু, কেরলে সাধারণ নির্বাচনে জয়ী ই. এম. এস্‌. নাম্বুদ্রিপাদের সরকারকে বাতিল করে রাষ্ট্রপতির শাসন জারী করা, চীনযুদ্ধে চরম পরাজয়ের কালিমা প্রতিরক্ষামন্ত্রী কৃষ্ণ মেননের স্কন্ধে চাপিয়ে নিজের গদী বাঁচানো, ইত্যাদি।

তুলনায় অকৃতদার বিধানচন্দ্র পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন চৌদ্দ বছর। তাঁর একটা বাড়তি সুবিধা ছিল। তাঁর কোলে কোন সঞ্জয়-কান্তিভাই-চন্দন চড়ে বসার সুযোগ পায়নি। স্বাধীনতালাভের পর পশ্চিমবঙ্গের রূপায়ণে তাই তাঁর ব্যক্তিত্ব সর্বতোভাবে কার্যকরী হয়। উদ্বাস্তু সমস্যার মোকাবিলা, শহরের পরিবহন ব্যবস্থা, কল্যাণী উপনগরী, চিত্তরঞ্জন রেল-কারখানা, দুর্গাপুরের ইস্পাত-কারখানা, হরিণঘাটার দুগ্ধ প্রকল্প প্রভৃতি প্রতিটি বিষয়ে তিনি বিস্ময়কর সাফল্যলাভ করেন। মাঝে মাঝে বামপন্থী আয়োজিত ধর্মঘটের হুম্‌কি ছাড়া তাঁর শাসনকালে উল্লেখযোগ্য প্রতিবাদ কোথাও দেখা যায়নি। একবার সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় অবশ্য বিধানসভাতেই মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধাচরণ করে সংবাদের শিরোনামায় চলে এসেছিলেন। সেই প্রসঙ্গে বন্ধুবর দীপ্তেন সান্যাল তার 'অচলপত্রে' লিখেছিল : "বিভীষণ ধর্মাত্মা ছিলেন কি না ঠিক জানি না, কিন্তু তাঁকে বাঙালী চেনে 'ঘরশত্রু'র উপমান হিসাবে।"

'ভারতরত্ন' বিধানচন্দ্র ব্যবসায়ী হিসাবেও প্রতিভার ছাপ রেখেছেন। তিনি ছিলেন শিলং হাইড্রো ইলেকট্রিক কোম্পানির অন্যতম ডিরেক্টর। জাহাজ, বিমান ও ইন্সিওরেন্স ব্যবসায়ের সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল। সমকালীন ভারতের শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক হিসাবেও প্রচুর উপার্জন করেছেন। পাটনায় মাতা অঘোরকামিনীর নামে একটি বৃহৎ শিক্ষামন্দিরের প্রতিষ্ঠা করেন। মৃত্যুর পূর্বে মুখ্যমন্ত্রী থাকা কালে তিনি প্রতিদিন বিনা-পয়সায় একশটি করে রুগী দেখতেন। সকালবেলা রাইটার্সে যাওয়ার আগে। সে-কালে দুর্নীতিমুক্ত মুখ্যমন্ত্রীদের কমান্ডো-ঘেরাটোপের ভিতরে থাকতে হত না। মৃত্যুর পর তাঁর ইচ্ছানুসারে তাঁর ওয়েলিংটন-স্কোয়ারের বিরাট বাসস্থানে একটি রোগ-নির্ণয়-গবেষণাকেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে!

এমন নিঃস্বার্থ কর্মযোগীর বিরুদ্ধে স্বার্থসন্ধানী কিছু রাজনৈতিক দলের মানুষ ছাড়া কেউই বিক্ষোভ দেখায়নি। না সাধারণ মানুষ, না সরকারী আমলা-কর্মচারী।

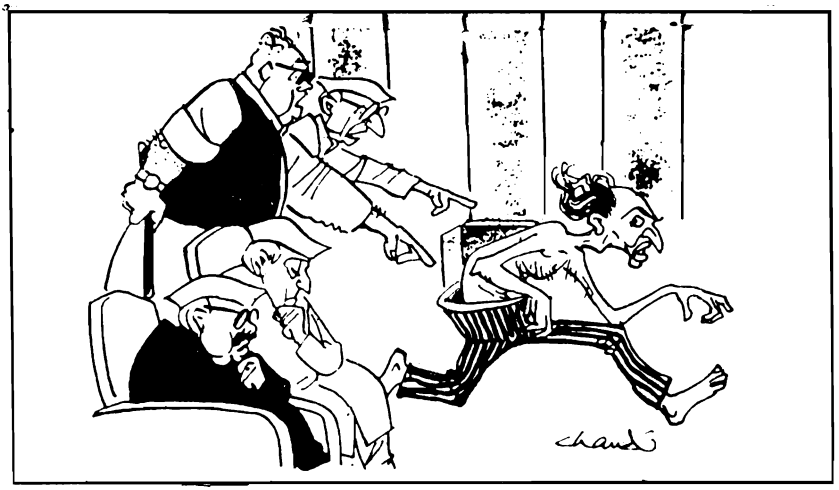

প্রতিরক্ষামন্ত্রী কৃষ্ণমেননের বহিষ্কার

সকল বিষয়ে সাফল্যলাভ করলেও তাঁর একটি পরিকল্পনা কিন্তু বাস্তবায়িত হয়নি। বিধানচন্দ্র পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারকে সংযুক্ত করে ভারতের পূর্বাঞ্চলে একটি শক্তিশালী রাজ্য গড়তে চেয়েছিলেন। পারেননি। বিধানচন্দ্র ব্যর্থ হলেও ঐ বিষয়ে সার্থক হয়েছিলেন এক ব্যঙ্গ-চিত্রশিল্পী। তাঁর কয়েক হাজার অনবদ্য কার্টুন আছে ; কিন্তু বাছতে গেলে এটিকে বাদ দেওয়া যাবে না : অকৃতদার বিধানচন্দ্র প্রতিবেশিনীর মনোহরণ করতে উদ্যোগী!!

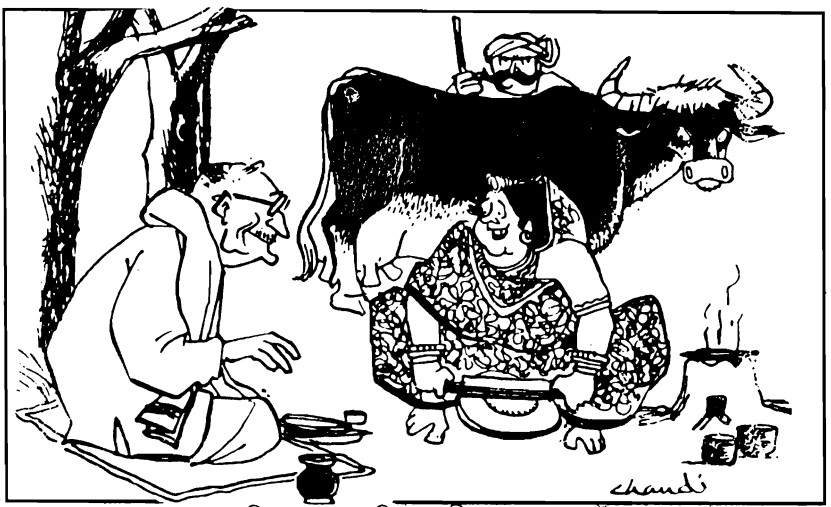

বিধানচন্দ্রের বঙ্গ-বিহার একীকরণের প্রস্তাব

কেন্দ্রে জওয়াহরলালের প্রয়াণে গুলজারিলালের ঝাঁকি দর্শন। তারপর লালবাহাদুরের বছর-দেড়েকের ভারত শাসন। শের শাহ্-শূর মাত্র পাঁচ বছর ছিলেন দিল্লীর সিংহাসনে। তার ভিতর তৈরি করে গিয়েছিলেন সোনার গাঁ — থেকে — লাহোর পর্যন্ত বিস্তৃত বাদশাহী সড়ক। লালবাহাদুর সিংহাসনে বসেছিলেন তার তিনভাগের একভাগ সময়। এটুকু সময়ে তিনি তিন-তিনটি অনবদ্য কীর্তির স্বাক্ষর রেখে গেলেন। এক : তাঁর আমলেই প্রথম হল 'বাম্পার-ক্রপ'। সবুজ বিপ্লব। খাদ্যের ঘাটতি মিটিয়ে ভারত ঐ বছর খাদ্য রপ্তানির কথা প্রথম ভাবতে শুরু করল। দুই : নেহেরুর প্রয়াণ একটা মস্ত সুযোগ মনে করে আয়ুব গোপনে কাশ্মীরে ব্যাপকভাবে হানাদারদের অনুপ্রবেশ ঘটালেন (5 অগাস্ট '65) ; এবং অগাস্টের চতুর্থ সপ্তাহে পাকিস্তান প্রকাশ্যে ভারত আক্রমণ করে বসল। সাড়ে-চার মাসে ভারতীয় সৈন্যদল পাকিস্তানকে চূড়ান্তভাবে হারিয়ে দিল। আয়ুব আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকদের সম্মুখে তাসখন্দে

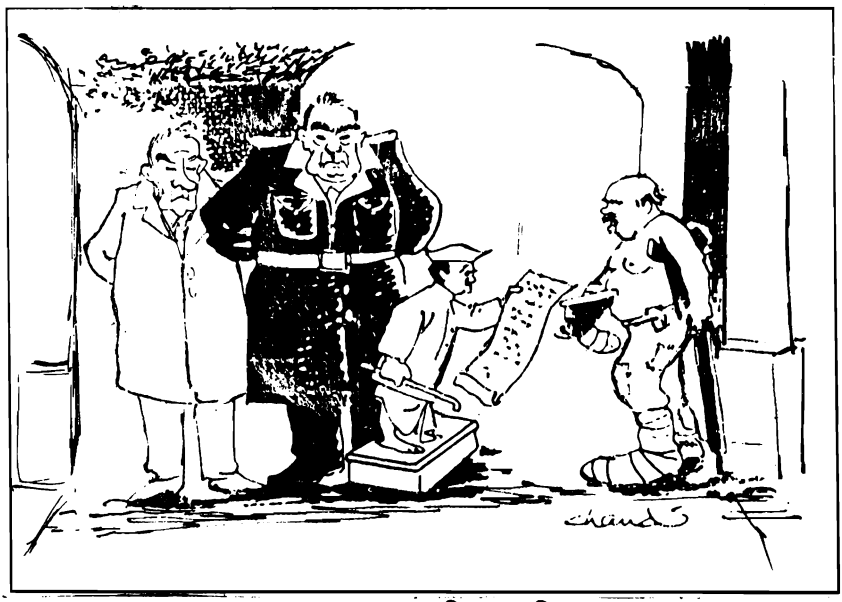

তাসখন্দে আয়ুবের সন্ধিপত্রস্বাক্ষরিত

সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করতে বাধ্য হলেন (11.1.66)। পরদিনই ঐ তাসখন্দেই লালবাহাদুর রহস্যজনকভাবে 'মারা' যান। ওঁর তৃতীয় কীর্তি : পার্সোনাল ইন্টিগ্রিটি! ব্যক্তিগত, পরিবারগত, গোষ্ঠীগত কোনও রকম সুযোগ-সুবিধা তিনি ভারতশাসনকালে গ্রহণ করেননি। সজ্ঞানে কোনও সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অন্যায় কোন আদেশ দেননি। স্বাধীনতার পর এই পাঁচ দশক অতিক্রান্ত হবার পরে ও-কথা আর কোনও প্রধান বা মুখ্যমন্ত্রী সম্বন্ধে

উচ্চারণ করা চলে কি না সেটা আপনাদের বিচার্য! ব্যক্তিগত সততার দিক থেকে সর্বকালের আদর্শ এই ক্ষুদ্রদেহী-বিশালহৃদয় ক্ষণস্থায়ী প্রধানমন্ত্রীকে ভারত কোনদিন ভুলবে না।

* * *

দিল্লী ডেভল্‌পমেন্ট অথরিটির প্রাক্তন ভাইসচেয়্যারম্যান এম. এন. বুচ্‌-এর হিসাবমতো, "Things began to change rapidly after 1967, a year which witnessed the emergence of Indira Gandhi — and her way of engineering defections — on the national political scene. The elected representatives began to realise that their value is encashable. But, for that, they need to subvert the system, for which a pliant bureaucracy was a must" [1967 সাল, অর্থাৎ ইন্দিরা গান্ধী ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার এক বছরের মধ্যে কিছু বৈপ্লবিক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হল। তার মূল হেতু : নবাগতা জাতীয় রাজনৈতিক পটভূমিতে একটা নতুন ভাবনার আমদানি করলেন ; দলত্যাগ করে মুনাফা লোটার। নির্বাচিত সাংসদ ও বিধায়কেরা রাতারাতি সমঝে নিলেন তাঁদের আসনটি নগদ টাকায় কেনাবেচার উপযুক্ত! কিন্তু তা করতে হলে সাংবিধানিক কাঠামোটিকে সবার আগে ভিতর থেকে ধ্বংস করার প্রয়োজন। আর তার জন্য প্রয়োজন একদল বশংবদ আমলা

নেতাদের পুতুলনাচ পরিকল্পনা

যাদের মেরুদণ্ড নমনীয় ধাতুতে গড়া। অল্প আঁচেই যারা গলে যাবে।]

দোষ একা ইন্দিরা গান্ধীর নয়। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ইন্দিরা গান্ধীকে নির্বাচন করে ভেবেছিলেন যে, ওঁদের ইচ্ছা মতো ইন্দিরা পুতুলনাচ নাচবেন। অর্থাৎ কলকাঠি নাড়বেন অতুল্য ঘোষ, কামরাজ, মোরারজি ইত্যাদি আর স্টেজের উপর নাচতে থাকবেন ইন্দিরা। দুর্ভাগ্য ঐসব ধুরন্ধর রাজনীতিকের, ইন্দিরা ওঁদের পাত্তা দিলেন না।

কংগ্রেস দু-টুকরো হয়ে গেল। যায় যাক। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে বিবেক ভোটের ব্যবস্থা করলেও ইন্দিরার ইচ্ছাই জয়যুক্ত হল। অর্থাৎ ভি. ভি. গিরি রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হলেন। ভাগ্যক্রমে ঐ সময় — কিছু পরে পাকিস্তানে পরাজিত আইয়ুবের কাছ থেকে ইয়াহিয়া খান রাষ্ট্রক্ষমতা কেড়ে নিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে খান সেনাদের পাঠিয়ে দেয় নৃশংস অত্যাচার করতে। এটা মার্চ 69-এর ঘটনা। ইন্দিরা সহানুভূতি দেখালেন মুজিবকে। ফলে একাত্তর সালের ডিসেম্বর মাসে পাকিস্তান আবার আক্রমণ করে বসল ভারতকে। মুজিব তখন নির্বাচন-জেতার অপরাধে পাক-কারাগারে বন্দী। খান-সেনারা অকথ্য অত্যাচার চালাচ্ছে পূর্ব পাকিস্তানে। ইন্দিরার নির্দেশে জেনারেল মানেকশ সরকারীভাবে সাহায্য করলেন কর্নেল উসমানকে। ইয়াহিয়ার প্রায় লাখখানেক সেনা আত্মসমর্পণ করে বাঁচল। পাকিস্তান ছিল চীনের বন্ধু। মার্কিন প্রেসিডেন্ট রাতারাতি চীনের সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে তোলার আগ্রহে ইন্দিরাকে ভয় দেখাতে তাঁর সপ্তম নৌবহরকে পাঠিয়ে দিলেন বঙ্গোপসাগরে। ইন্দিরা তাতে বিন্দুমাত্র ভীত হলেন না। ওদিকে ইয়াহিয়ার চূড়ান্ত পরাজয় ঘটল। ইয়াহিয়া ভুট্টোকে ডেকে দেশের শাসনভার তাঁর হাতে তুলে দিলেন।

সদ্যজাত বাংলাদেশের শৈশব

মুজিবকে দিলেন নাটকীয় মুক্তি। সিমলায় এসে পাকিস্তানের বড়কর্তা আবার শান্তিচুক্তিতে স্বাক্ষর দিয়ে গেলেন। এদিকে মুজিব কলকাতার ময়দানে বিপুল সম্মান পেলেন, ইন্দিরা গেলেন নবগঠিত স্বাধীন 'বাঙলাদেশের' রাজধানী ঢাকায়। এইসব কারণে ইন্দিরা জনপ্রিয়তার সর্বোচ্চশিখরে উঠে গেলেন। নেপথ্যে তখন আবার ধ্বনিত হচ্ছিল সেই সর্বকালের সাবধানবাণী "Power tends to corrupt, but absolute power corrupts absolutely." ক্যাবিনেটের বিভিন্ন মন্ত্রীকে ম্যাডাম জানিয়ে দিলেন কোন গুরুত্বপূর্ণ বিভাগীয় সিদ্ধান্ত নেবার আগে যেন তাঁকে জানানো হয়। ক্যাবিনেট মন্ত্রীরা তার অর্থ করলেন : প্রতিটি সিদ্ধান্তে যেন মাতাজীর অনুমোদন থাকে।

এই সময়েই ইন্দিরা তাঁর উত্তরাধিকারী নির্বাচন করে ফেললেন : সঞ্জয় গান্ধী। সঞ্জয় সংবিধান-বহির্ভূত ক্ষমতা ভোগ করতে থাকেন প্রধানমন্ত্রীর পুত্র হবার সুবাদে। দৈব এবং অলৌকিকত্বে বিশ্বাসী মাতাপুত্র হাজির করলেন এক 'রাসপুটিন'কে! তাঁর অপর্ণা-

রাসপুটিনের আশীর্বাদপ্রার্থী মাতাপুত্র

আশ্রমে যোগাভ্যাস, ধ্যান, যাগযজ্ঞের অন্তরালে শিষ্যশিষ্যাদের বাৎস্যায়নচর্চা এবং অস্ত্রশস্ত্রের সমাবেশ একসঙ্গেই চলতে থাকে। এইবার ব্যভিচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেন জয়প্রকাশ নারায়ণ। গড়ে তুললেন তাঁর 'নবনির্মাণ সমিতি'। জয়প্রকাশ পুলিশ ও প্রশাসনকে অনুরোধ করলেন বিবেক-বিরুদ্ধ অন্যায়-সরকারী আদেশ অমান্য করতে। আমলা-মন্ত্রী বিরোধের সে এক নয়া পর্যায়। জয়প্রকাশ অবশ্য আমলা নন — আজন্ম-বিপ্লবী।

* * *

ভারতের তৃতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধে — যে যুদ্ধ শেষ হয়েছিল 1947 সালে — তার প্রথম শহীদ চাপেকার ব্রাদার্স : বোম্বাই প্লেগের (1898-99) আমলে। সে হিসাবে ভারতের এই চতুর্থ স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রথম শহীদ পাটনার একজন অফিসার : *পি. কে. সিন্‌হা*। জয়প্রকাশের মন্ত্রশিষ্য। কথাটা তাঁর মনে ধরল : 'বস'-এর ঘোষিত আদেশের চেয়ে অনেক বড়-কথা 'বিবেকের নির্দেশ'।

বিহার অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিসের এই আদর্শনিষ্ঠ অফিসারটিকে সদ্য মফঃস্বল এলাকা থেকে নিয়ে আসা হয়েছে পাটনায়। সেটা 1974-এর ঘটনা। উনি পোস্টিং পেলেন পাটনা মিউনিসিপ্যালিটির বিল্ডিং অ্যান্ড রোডস্ বিভাগের ডেপুটি অ্যাডমিনিস্ট্রেটর পদে। এসেই তিনি লক্ষ্য করলেন সরকারী জমিতে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠেছে নানান জাতির বে-আইনি বাড়ি—ঝোপড়ি, কাঁচা-দোকান, পাকা-ইমারত, মায় তিন-চারতলার অট্টালিকা। এসেই ভাঙতে শুরু করলেন সেসব।

সহকর্মীরা হাঁ-হাঁ করে বাধা দিতে এলেন : এ কী কাণ্ড করছেন স্যার? এ দোকানের মালিক তো অমুক মন্ত্রীর দামাদ, ঐ ঝোপড়িগুলোয় বাস করে অমুক মন্ত্রীর পেটোয়া মাস্‌লম্যানের পরিবার। আর বাজারের সামনে মাকরানা-মার্বেলের চারতলা বাড়িটা তো বেনামে আমাদের রানীজি মানে, ইয়ে, মুখ্যমন্ত্রীর ঘরওয়ালীর নামে।

সিন্‌হা জানতে চান : ওঁরা সরকারী জমি কিনেছিলেন? 'সেলডিডস্' দেখান। বাড়িগুলোর স্যাংসনড্ প্ল্যান আছে? দেখান?

সহকর্মী ঘাড় চুলকে বললে, ক্যা মজাক উড়াতে হেঁ আপ....

—না, রসিকতা নয়। প্রত্যেককে এক মাসের নোটিস ধরিয়ে দাও। তার মধ্যে বাড়ি খালি না হলে আমি পুলিশ দিয়ে লোকজনদের সরিয়ে দেব। ফার্নিচার রাস্তায় নামিয়ে দেব। তারপর বুলডোজার চালাব।

আপনারা যা আন্দাজ করছেন তাই হল। ডাক পড়ল মুখ্যমন্ত্রীর খাস কামরায়। সিংহশিশু সিন্‌হা জয়প্রকাশের শিষ্য। অন্যায়ের সঙ্গে আপোস করতে স্বীকৃত হলেন না। সরাসরি অগ্রাহ্য করলেন মুখ্যমন্ত্রীর আদেশ। আমার জ্ঞানমতে স্বাধীন ভারতে এটাই প্রথম!

বাড়ির মালিকেরা দলবেঁধে আদালতে গেলেন। আদালত কিন্তু সমর্থন জানালেন সৎ কর্মচারীকে। স্টে-অর্ডার হল না! বাড়ির বাসিন্দাদের বাড়ি খালি করে দেবার নোটিস পূর্ববৎ বহাল রইল।

কিন্তু সংবিধান শাসকের হাতে দিয়ে রেখেছে মারাত্মক অস্ত্র। মুখ্যমন্ত্রী বেগতিক দেখে সেই ব্রহ্মাস্ত্রটি ছাড়লেন সিংহকে লক্ষ্য করে। আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে চার্জ বুঝিয়ে

দিতে হল ডেপুটি অ্যাডমিনিস্ট্রেটারকে। কিন্তু আদেশনামায় বলা হয়নি তিনি কোথায় জয়েন করবেন। বাধ্য হয়ে ছুটির দরখাস্ত করলেন সিংহ। ওঁর সাক্‌সেসার গদীতে বসেই একখণ্ড কাগজে সই করলেন। ইতিপূর্বে সরকারী জমির বেআইনি দখলদাররা যেসব নোটিস পেয়েছিলেন তা প্রত্যাহত হল। 'যে বাড়িতে যিনি আছেন তিনি তা ভোগ করতে পারেন'—যাবৎচন্দ্রার্কমেদিনী—অর্থাৎ পরবর্তী চুনাও-তক তো বটেই।

কিন্তু ছুটি শেষে সিন্‌হা কোথাও জয়েন করতে পারলেন না। তাঁকে পোস্টিং অর্ডার দেওয়া হয়নি। কোনও বিভাগীয় সচিবই এমন 'খ্যাপা কুকুরকে' নিজ বিভাগে নিতে চাইল না। স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীর আদেশ যে অমান্য করতে পারে তাকে কে নেবে? ফলে ঘরে বসেই থাকতে হল ওঁকে। কিন্তু ঘরে বসে থাকার এক ঝামেলা—মাসান্তে মাহিনা পাওয়া যায় না। সিন্‌হাও পেলেন না। বাধ্য হয়ে আদালতে যেতে হল তাঁকে। মুখ্যমন্ত্রীর পদলেহীরা বললে, যাও! দেখি তোমার দৌড় কদ্দুর।

আদালতে 'ডেট'-এর পর 'ডেট' পড়ে ; হিয়ারিং হয় না। মাসের পর মাস কাটল। স্ত্রীকে শাঁখা-সিঁদুর-সর্বস্ব করে লড়ে চলেছেন সিন্‌হা, নিজের ঘড়ি আংটি বন্ধক দিয়ে। কিছুতেই আদালতে শুনানীর দিন পড়ে না।

ইতিমধ্যে এক কাণ্ড হল : বিনোবা ভাবের পৌনার আশ্রম থেকে পদযাত্রা করে জয়প্রকাশজী উপনীত হলেন বিহারে। 'নবনির্মাণ' জোয়ারে বিহারের দুর্নীতিপরায়ণ মুখ্যমন্ত্রী আবদুলি গফুর ডিগ্‌বাজি খেলেন। অনাস্থা ভোটে বিতাড়িত হলেন গদী থেকে। এল বিহারে রাষ্ট্রপতির শাসন। সিন্‌হা তৎক্ষণাৎ তাঁর কাগজপত্র নিয়ে হাজির হলেন রাজ্যপালের কাছে। একদিনের মধ্যে ফয়সালা হল। সহজ কেস। রাজ্যপাল আদেশ দিলেন সিনহাকে পুনর্বহাল করতে হবে। অবিলম্বে। সেটা 1979 সাল।

সিন্‌হা এ-দপ্তর থেকে সে-দপ্তরে ছোটাছুটি করেন পোস্টিং অর্ডারটা পেতে। ইতিমধ্যে আবার রাজনীতির পটভূমি বদল হল। জয়প্রকাশ প্রয়াত হলেন। মোরারজী ততদিনে গদিতে। বিহারে যেসব বিধায়ক মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাবে ভোট দিয়েছিলেন তাদের ম্যানেজ করা গেছে। মোটা টাকার উৎকোচে! রাষ্ট্রপতির শাসন উঠে গেল। অর্থাৎ সিনহা যে তিমিরে ছিলেন, পড়ে রইলেন সেই তিমিরেই। প্রশাসন বললে, এ তো বড় আজব অর্ডার! মহামহিম রাজ্যপাল অর্ডার দিয়েছিলেন আপনাকে 'পুনর্বহাল' করতে। কিন্তু তার আগে আপনি দেখান যে, আপনাকে বরখাস্ত করা হয়েছে! আপনাকে বরখাস্ত করা হলেই না পুনর্বহালের প্রশ্নটা উঠ্‌বে?

সিন্‌হা বলেন, 'বরখাস্ত' যদি না হয়ে থাকি তাহলে আমাকে পোস্টিং দিন!

এঁরা বলেন, সেটা আলাদা কথা। সে-কথা তো রাজ্যপাল বলেননি। বলেছেন 'পুনর্বহাল' করতে। কিন্তু 'পুনর্বহাল' তখনই সম্ভব যখন কাউকে বরখাস্ত করা হয়।

সিন্‌হা পদত্যাগপত্র পাঠিয়ে দিলেন। পদত্যাগের হেতু হিসাবে জানালেন—যেহেতু বিহার সরকারের আদ্যোপান্ত দুর্নীতিপূর্ণ, তাই তিনি এ সরকারের অধীনে চাকরি করতে অনিচ্ছুক।

কী বিচিত্র এ দেশ! সেই পদত্যাগপত্রটি 1980 থেকে 1994—চৌদ্দ বছর পড়ে আছে P. U. D. মার্কা নিয়ে—'পেপার আন্ডার ডিস্‌পোজাল'। অর্থাৎ বিবেচনাধীন অবস্থায়। সিন্‌হার পদত্যাগপত্র গ্রহণ করা যাচ্ছে না—তাহলে তাঁর অভিযোগটা মেনে নিতে হয়। পদত্যাগপত্রটা প্রত্যাখ্যানও করা যাচ্ছে না—তাহলে তাঁকে পোস্টিং দিতে হয়। তাই ঐ পদত্যাগ পত্রখানির মাথায় পার্মানেন্ট ছাপা : P. U. D.—যাবৎ চন্দ্রার্কমেদিনী।

1995-এ তাঁর রিটায়ারমেন্ট হবার কথা। বোধকরি তখন কাগজটা টেবিল থেকে নেমে ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে যাবে। পেনশন? গ্র্যাচুইটি? যারা কাজ করছে তারাই এখন মাইনে পাচ্ছে না—পুলিশ না হলে—তা অবসরপ্রাপ্ত বুড়োকে কে পেন্‌শন দেবে?

* * *

চিরবিপ্লবী এবং ক্ষমতা-নিরাসক্ত চিরসেবাব্রতী জয়প্রকাশ নারায়ণ নতুন করে ভারত পরিক্রমা শুরু করেন — প্রণিধান করেন, এক শ্রেণীর রাজনীতি-ব্যবসায়ী এবং শিল্পপতি কোটিপতি থেকে অর্বুদপতি হচ্ছেন — কিন্তু দেশব্যাপী সাধারণ মানুষ আধপেটা থেকে নিরন্ন হয়ে যাচ্ছে। তিনি 'নব-নির্মাণ' আন্দোলনে নামলেন। ইন্দিরা গান্ধীর কনিষ্ঠপুত্র তখন তাঁর মারুতি গাড়ির কারখানা নিয়ে ব্যস্ত। অন্যায়ভাবে মন্ত্রীপুত্রকে নানা জাতের সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হচ্ছে। সরকারী খরচে ঐ প্রাইভেট কোম্পানিতে অনেক কিছু নির্মিত হয়। সরকারী প্রচারযন্ত্র সঞ্জয়ের সাফল্যে দিশেহারা।

মারুতী পয়দা হচ্ছে

ওদিকে জয়প্রকাশ নারায়ণজীর 'নবনির্মাণ সমিতির' প্রতি দেশের মানুষ ক্রমে আগ্রহী হয়ে পড়ছে। ইন্দিরাজী আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েন। আর এই মাহেন্দ্রক্ষণেই এলাহাবাদ হাইকোর্ট বিধান দিলেন প্রধানমন্ত্রী সরকারী কর্মচারী যশপাল কাপুরকে

অন্যায়ভাবে নির্বাচনের কাজে লাগিয়েছেন। তাঁর নির্বাচন-জয় অবৈধ!

ইন্দিরাজী তৎক্ষণাৎ সুপ্রীম কোর্টে গেলেন। বারো দিন পরে স্টে-অর্ডার পেলেন। কিন্তু জে. এম. এল. সিন্‌হার ঐ একটি রায়েই ইন্দিরাজীর ভাগ্যরেখা দিক পরিবর্তন করল। তাঁর শাড়ির আঁচলে ঐ কালো দাগটা চিরস্থায়ী হয়ে গেল — ঐ যাকে বলে, যাবৎচন্দ্রার্কমেদিনী!

নির্বাচন আসন্ন হওয়ায় ইন্দিরা এমার্জেন্সি ঘোষণা করলেন। চালু হল সামরিক ডিকটেটারি শাসন। যেসব এক্সপ্রেস-মেল ট্রেন দশ-বারো ঘণ্টার কম লেট করলে লোকে এতদিন বর্তে যেত, এখন তা ঘড়ি ধরে চলতে থাকে। যে চিঠি দিল্লী থেকে কলকাতা আসতে আগে সাতদিন লাগত এখন তা পর দিন পৌঁছে যায়। কোন সরকারী কর্মচারী হাতে-হাতে 'ইয়ে' নেয় না। নেয় টেবিলের তলা দিয়ে।

তবু ইন্দিরা গান্ধী মানুষের মন পেলেন না। লোক মন খুলে পথে-ঘাটে কথা বলতে সাহস পেত না। 'দ্য স্টেটসম্যান' পত্রিকার সম্পাদকীয় কলম শাদা রেখে ছাপা হতে থাকে। এমার্জেন্সির বিরুদ্ধে কথা বলায় অনেক শিল্পী সাহিত্যিক কারান্তরালে চলে গেলেন। বন্ধুবর গৌর ঘোষ দেশজননীর মৃত্যুতে মস্তক মুণ্ডন করলেন — লিখেছিলেন : 'আমাকে বলতে দাও!'

শৌভনিক মুক্ত অঙ্গনে "এক-দুই-তিন..."-এর অভিনয় বন্ধ করে দিলেন।

নির্বাচনের ফলাফল ঘোষিত হল। ইন্দিরাজী পরাজিত!

প্রমাণ হল, মানুষ বাকস্বাধীনতাকে, মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে, ডেমোক্রেসিকে কী ভালই না বাসে!

* * *

বর্তমানে বাঙলাভাষার ঐ অত্যন্ত জনপ্রিয় লেখক বুদ্ধদেব গুহের সেই বিশেষ প্রশ্নটার জবাব মুল্‌তুবি আছে : "সোনিয়া গান্ধী অথবা প্রিয়াঙ্কা গান্ধীরাই কি অনাদিকাল চোর বা চাকর মনোবৃত্তির আমাদের মালিক বা মালকিন বনে থাকবেন? চিরটাকাল? ভেবে দেখবেন পাঠক!"

ভেবে আমরা দেখেছি, লেখক! এবার আপনার ঐ মুলতুবি প্রশ্নটার জবাব দিই :

একবার, বিশ্বাস করুন, আমরা সবাই মিলে ঐ সোনিয়ার শাশুড়ি তথা প্রিয়াঙ্কার দিদাকে বিতাড়িত করেছিলাম। স্বাধিকারপ্রমত্ততার অপরাধে। পরিবর্তে গদিতে বসিয়েছিলাম একদল সাচ্চা দেশসেবককে। নীট ফল কী হল শুনবেন?

- স্বাস্থ্যমন্ত্রী রাজনারায়ণ সংসদে ঘোষণা করেছিলেন, "I seriously believe that Ayurveda can cure all ailments and the allopath practitioners are just killers" [আমি আন্তরিকতার সঙ্গে ঘোষণা করছি

জনতা-সরকারের স্বাস্থ্যমন্ত্রী বললেন, অ্যালোপ্যাথ-ডাক্তারেরা সব খুনী! তিনি নতুন কোন হাসপাতাল গড়েননি।

রেলমন্ত্রী জর্জ ফার্নান্ডেজ এক ইঞ্চি রেলপথের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি করেননি। তবে উচ্চকোটির মানুষকে 'কোকা-কোলা'র বিকল্প উপহার দিলেন : 77!

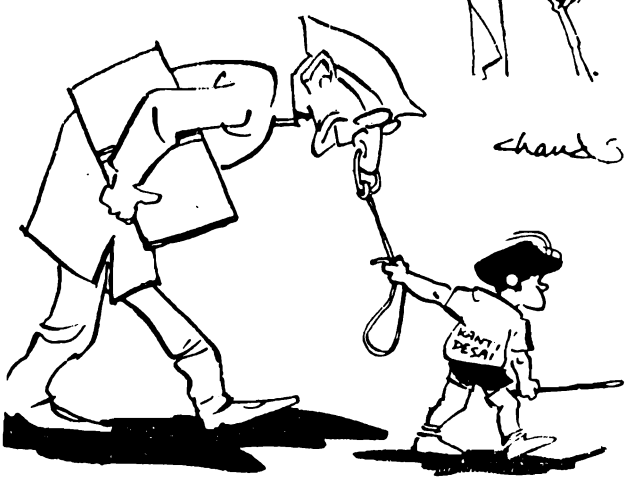

মোরারজীর পুত্র কান্তিভাই সঞ্জয় গান্ধীর রেকর্ড ভেঙে দিলেন!

আয়ুর্বেদচিকিৎসায় সবরকম অসুখের চিকিৎসা সম্ভব; দেশব্যাপী ঐ অ্যালোপ্যাথ ডাক্তারগুলো শুধু মানুষ মারার কল।] আজ্ঞে হ্যাঁ। এই আশী কোটি জনগণের রোগপীড়াগ্রস্ত দেশের স্বাস্থ্যমন্ত্রী এ কথা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন। তাঁর আমলে তাই একটিও হাসপাতাল তৈরি হয়নি; একটিও চিকিৎসা-বিজ্ঞানাগারের ভিত-প্রস্তর গাড়া হয়নি।

- রেলমন্ত্রী জর্জ ফার্নান্ডেজ ছিলেন ভাল বক্তা! তাঁর আমলে সারা ভারতের রেল লাইন এক-বিঘৎ পরিমাণও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়নি। তবে উচ্চকোটির মানুষকে কোকা-কোলার বিকল্প এক 'ঠাণ্ডাই' তিনি উপহার দিতে পেরেছিলেন : '77' — রেলমন্ত্রীর অসামান্য কৃতিত্ব! কী বলেন?
- এবার খোদ প্রধানমন্ত্রীর প্রসঙ্গে আসি। সোনিয়ার শাশুড়ি, মানে ঐ প্রিয়াঙ্কার দিদার, অন্তত একটি গুণ রপ্ত করেছিলেন মোরারজী দেশাই। শুধু রপ্ত নয়, ইন্দিরাজীর পুত্রপ্রেমকে ইনিংস-ডিফিটে হারিয়ে দিতে পেরেছিলেন তিনি। সঞ্জয় ইন্দিরাজীর নাকে দড়ি পরিয়েছেন এমন উদ্ভট পরিকল্পনা স্বয়ং চণ্ডী লাহিড়ীও করতে পারেননি!
- উটের পিঠে শেষ বোঝাটি হল প্রধানমন্ত্রীর জলসরবরাহ ব্যবস্থা : শিবাম্বু!

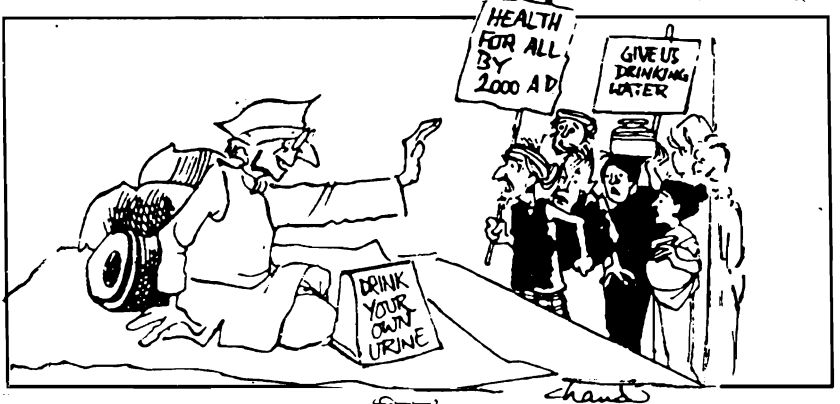

'শিবাম্বু'

বিশ্বাস করুন, লেখক — আমরা চরণ সিং, চন্দ্রশেখরকেও বাজিয়ে দেখেছিলাম। সব অপদার্থ! সব ভূষিমাল! আজ্ঞে না, কান্তিভাইয়ের বাবাকে তাড়িয়ে আমরা ওম প্রকাশ চৌতালার পরমপূজ্য পিতৃদেব স্বর্ণমুকুটশোভিত দেবীলালকে ডেকে আনিনি। সেটা যদি আমাদের অপরাধ হয়ে থাকে, তাহলে আমরা নাচার। নিতান্ত নিরুপায় হয়েই আমরা আবার ডেকে এনেছিলাম নেহরু-ডাইনাস্টির সেই দুঃসাহসী মহিলাকে—যিনি পুব-পাকিস্তানকে মুক্ত করেছিলেন খান সেনাদের অত্যাচার থেকে, বাংলাদেশ ও বাঙলা

ভাষাকে উর্দুর অত্যাচার থেকে, এবং স্বর্ণমন্দির-তথা-ভিন্দ্রেনওয়াল সমস্যার জন্য তাঁকে যতই দায়ী করুন, তিনি সাম্প্রদায়িক কারণে দেহরক্ষীকে বাতিল করেননি। তাই জাতির জনকের পদচিহ্ন-রেখা ধরে শত অপরাধ সত্ত্বেও তিনি সেকুলার ভারতে 'শহীদ' রূপেই স্মরণীয়া।

* * *

1983 সাল। ইন্দিরার প্রত্যাবর্তনের তিন বছর পরের কথা। মুসৌরিতে লালবাহাদুর শাস্ত্রীজীর নামে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে : 'ন্যাশনাল অ্যাকাডেমি অব এডুকেশন'। আই. এ. এস. প্রবেশনারদের শিক্ষাকেন্দ্র। আই. এ. এস. পরীক্ষায় নির্বাচিত হলে পোস্টিং-এর আগে এখানে শিক্ষানবিশী করতে হয়। শিক্ষার্থী ছাত্র ও ছাত্রীদের পৃথক আবাস। সংযুক্ত লেকচার হল, ক্লাসরুম। প্রতিষ্ঠানের ডিরেক্টার একজন সিনিয়ার শিক্ষাবিদ আই. এ. এস. : ডক্টর পি. এস. আপ্পু।

আপ্পুজী ছেলে-মেয়েদের নিয়ে একটা সংযুক্ত পর্বতারোহণের আয়োজন করেছিলেন। নিজেও ছিলেন দলের সঙ্গে। সেখানে জনৈক শিক্ষার্থী মাত্রাতিরিক্ত মদ্যপানের প্রভাবে হঠাৎ বেএক্তিয়ার হয়ে পড়ে। দ্যাখ-দ্যাখ, ধর-ধর করতে করতেই সে কোমরবন্দ্ থেকে একটি পিস্তল বার করে সবাইকে ভয় দেখায়। সহপাঠীরা ভয় পেয়ে পালিয়ে বাঁচে। মদ্যপ তাতে মজা পেয়ে পাহাড়ের পাকদণ্ডী পথে পিস্তল-হাতে মহিলা প্রবেশনারদের তাড়া করে। বেশ কয়েকবার গুলিও ছোঁড়ে। মেয়েরা পড়ে যায়, পাথরে হাত-পা ছড়ে যায়, জামাকাপড় ছিঁড়ে যায় বা তাদের অবস্থা অশালীন হয়ে পড়ে। পরে সুযোগমতো ওর বন্ধু-বান্ধবেরা মদ্যপটাকে জড়িয়ে ধরে। ভাগ্যক্রমে কেউ হতাহত হয়নি।

পি. এস. আপ্পু মহিলা শিক্ষার্থীদের অভিযোগ শুনলেন। ঘটনা ঘটেছে বহু প্রত্যক্ষদর্শীর সম্মুখে। সকলে একই কথা বলছে। ডিরেকটার ছেলেটিকে সাসপেন্ড করলেন। তার পিস্তল কেড়ে নেওয়া হল। এবং ঐ প্রবেশনারটিকে বরখাস্ত করার সুপারিশপত্র উনি পাঠিয়ে দিলেন দিল্লীতে।

কিন্তু দিল্লী থেকে উল্টোটাচাপ আসতে শুরু করল। হোম মিনিস্ট্রি থেকে। আপ্পুকে বলা হল, আদেশটা প্রত্যাহার করে নিতে। উনি রাজি হলেন না। শেষে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকে কর্মরত ওঁর এক বন্ধু — আন্ডার-সেক্রেটারি পর্যায়ের বন্ধু, আপ্পুর একই ব্যাচের— ওঁকে টেলিফোন করে জানালেন ঐ প্রবেশনার স্বয়ং হোম মিনিস্টারের রিস্তেদারের দামাদ!

: আয়াম দেন রিয়্যালি সরি ফর দ্যাট আনফরচুনেট রিলেটিভ অব দ্য হোম-মিনিস্টার। দামাদ নির্বাচনে তাঁর ভুল হয়েছে, যেমন আমাদেরও হয়েছে রিক্রুট করার

সময়। এমন 'ট্রিগার-হ্যাপি' মাতালকে দায়িত্বপূর্ণ চাকরিতে বসানো যাবে না। আই অ্যাম সরি!

তার দিন-কয়েক পরে আপ্পু - সাহেব টেলিফোন পেলেন স্বয়ং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর। এল আদেশ প্রত্যাহারের — না, অনুরোধ নয়, এবার আদেশ!

আপ্পুর কিন্তু ভদ্রলোকের এক কথা! I.A.S. আই অ্যাম সরি!

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নাকি টেলিফোনে বলেছিলেন, সে ক্ষেত্রে, বাই স্পেশাল মেসেঞ্জার, আপনার বদলির অর্ডার যাচ্ছে, উইথ নো জয়েনিং টাইম! চিঠি পেলেই চার্জ বুঝিয়ে দিয়ে দিল্লীতে ফিরে আসবেন। নেক্সট পোস্টিং কোথায় হবে আমার অফিস থেকে জানিয়ে দেওয়া হবে।

জবাবে একই কথার পুনরুক্তি করেছিলেন সেই আই. এ. এস. — 'আই অ্যাম সরি! মুসৌরিটা ভাল লেগেছে। ছেড়ে যেতে পারব না। তবে হ্যাঁ, আপনার স্পেশাল মেসেঞ্জারের হাতেই পাঠিয়ে দেব আমার জবাব : পদত্যাগপত্র!'

তাই দিয়েছিলেন। দীর্ঘদিনের চাকরি। প্রৌঢ় অফিসারটি পেনশনের কথা ভাবেননি, রিটায়ারিং গ্র্যাচুইটির কথা চিন্তা করেননি। ভদ্রলোকের এক কথা : আই অ্যাম সরি! ভাল কথা মনে পড়ল। হোম মিনিস্টারের নামটা এখনো জানানো হয়নি। সেটা আন্দাজ করতে পারেন? একটা 'ক্লু' দিই বরং। যিনি সগর্বে ঘোষণা করেছিলেন : কোট — Mrs. Gandhi is my Rehuma. I will even sweep the floor if she asked me to do so (15.7.82)— আনকোট! আজ্ঞে হ্যাঁ, তাঁরই মহাপ্রস্থানে আমরা সম্প্রতি সাতদিন জাতীয় শোক পালন করেছি — 'জ্ঞানী' জৈল সিং!

'ইন্ডিয়া টুডে'তে (15.10.94) শেফালী রেখী আর অর্ণব সেনগুপ্ত লিখেছিলেন, "Appu resigned in protest, sending shock waves through the bureaucracy and striking a chord of sympathy nationwide. Seldom before had a govt. officer registered his protest in so forthright a manner." [আপ্পুজী প্রতিবাদে পদত্যাগ করলেন। সারা দেশের আমলাতন্ত্র সহানুভূতির তরঙ্গাঘাতে উর্মিমুখর হয়ে উঠল। অন্যায়ের বিরুদ্ধে কোন সরকারী অফিসার ইতিপূর্বে এমন সোচ্চারভঙ্গিতে প্রতিবাদ করেছেন কি না সন্দেহ।]

আপ্পু স্বয়ং সাংবাদিকদের বলেছিলেন, "This is a revolt against all that is wrong, but it is not enough. What we need is a mass movement to ensure radical political reforms" [এটাতো অন্যায়ের বিরুদ্ধে একটা খণ্ড-বিদ্রোহ মাত্র। কিন্তু এটাই যথেষ্ট নয়। আমাদের যা এখন প্রয়োজন তা হচ্ছে রাজনীতিবিদদের শুদ্ধিকরণের জন্য একটা ব্যাপক গণ আন্দোলন।]

সেটা তখন হয়নি। উত্তরবঙ্গের নকশালবাড়িতে উদ্ভূত এক শুদ্ধিকরণ-প্রচেষ্টা নানা

কারণে ব্যর্থ হয়ে গিয়েছিল। সাচ্চা বিপ্লবীদের মধ্যে কিছু বেনোজল ঢুকে পড়ায় এবং অমানুষিক দমননীতির ফলে। তাই সেই মুলতুবি শুদ্ধিকরণটা এখনো হয়নি। কিন্তু বিহারে পি. কে. সিনহার লাঞ্ছনা যেভাবে চাপা দেওয়া গিয়েছিল, আপ্পুর ক্ষেত্রে তা হল না। বিভিন্ন রাজ্যের আই. এ. এস. অ্যাসোসিয়েশান এ নিয়ে মিটিং করলেন, আলোচনা করলেন। কর্তৃপক্ষের কাছে ডেপুটেশান দিলেন : 1964 সালের 'সিভিল সার্ভিস কন্ডাক্ট রুল্‌স' পরিবর্তিত হওয়ার সময় হয়েছে। এ যেন 'বন্ডেড লেবার'দের বন্ধন :

- No govt. servant shall make any statement of fact or opinion which amounts to adverse criticism of the Central or State Govts. [কোন সরকারী চাকুরীরত কর্মী এমন কোনও সত্য ঘটনা বা তার সম্বন্ধে কোন মতামত প্রকাশ করতে পারবেন না, যাতে কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকার কোনও সমালোচনার সম্মুখীন হয়।]

কেন মশাই? ঘটনা যদি 'সত্য' হয়, fact হয়, তবে তা কেন বলতে পারব না? কী কারণে? সরকারী মন্ত্রীরা তো জনগণের নির্বাচন মাধ্যমে গদীতে বসেছেন ; কোনও divine right of kings-এর অধিকারবলে নয়! সরকার অন্যায় করলেও তার সমালোচনা করা যাবে না? সরকারী মন্ত্রীরা কি সবাই সীজারের পত্নী? আর তাছাড়া 'সত্যমেব জয়তে' মন্ত্রটা তাহলে আছে কেন স্বাধীনতা প্রতীকে?

- Barring judicial enquiries and those ordered by the govt. or Parliament, no person shall give evidence, except with the prior sanction of the Govt. [বিচার বিভাগের তদন্ত অথবা সংসদ কর্তৃক আদিষ্ট না হলে কোন কর্মচারী সরকারের অনুমতি ছাড়া কোনও জবানবন্দি দিতে পারবেন না]

বুঝুন! অর্থাৎ চোখের সামনে পার্টিমস্তান কাউকে খুন করেছে এটা স্বচক্ষে দেখলেও তা তদন্তকারী পুলিশ অফিসারকে জানাতে পারব না। যদি আমি সরকারী চাকুরে হই এবং — আমার বিভাগীয় সেক্রেটারি যাবৎ কিঞ্চিন্নভাষতে। 'আঙ্কল টম্‌স্ কেবিন' পড়েছেন? প্রাক-লিঙ্কন্ জমানায় প্ল্যান্টার্সদের কী জাতের আইন ছিল পড়ে দেখেছেন?

- While giving such evidence, he shall not criticise any policy or action of the Govt. [জবানবন্দি দিতে বাধ্য হলে সরকারী কর্মচারীর ভাষায় যেন সরকারের কোন (অপ) কর্মের সমালোচনা করা না হয়।] যাবৎ গদি-আসীন তাবৎ সমালোচনার ঊর্ধ্বে!
- Quotations by a govt. servant from any official document is unauthorised [কর্তা ফাইলে যে আদেশ লিখিত ভাবে দিয়েছেন তা কোথাও উদ্ধৃত করা চলবে না।] বটেই তো! আদেশগুলি তো দেশের স্বার্থে

নয়, পার্টির স্বার্থে, পরিবারের স্বার্থে, নিজের পকেটের স্বার্থে!

প্রায় দুটি বছর লেগেছিল এই জগদ্দল পাথরটাকে কিঞ্চিৎ মাত্র নড়াতে। সেটা 1985 সাল। সঞ্জয় ইতিপূর্বেই প্রয়াত। ইন্দিরাজী নিহত। রাজীব এসে বসেছেন গদীতে। দেরাদুন স্কুলের কিছু সহপাঠী আই. এ. এস. তখন রাজীবের চতুর্দিকে। তাঁরাই ওঁর ফ্রেন্ডস্-ফিলজফার্স-গাইডস। তাঁরাই একদিন চেপে ধরলেন রাজীবকে। চাপাচাপিতে ঝুলি থেকে বেড়ালটা বেরিয়ে এল। আজ্ঞে হ্যাঁ, বেড়াল : Central Administrative Tribunal : CAT : অর্থাৎ কোনও সরকারী চাকুরীরত কর্মীকে যদি অন্যায়ভাবে বদলি, বরখাস্ত বা বিভাগীয় শাস্তি দেওয়া হয় তবে তিনি ঐ সেন্ট্রাল অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ট্রাইবুনালের কাছে আবেদন করতে পারেন। শোনা যায়, রাজীবজী প্রথমে এই ট্রাইবুনালের স্বীকৃতি দিতে অস্বীকার করেন। তিনি এর ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। সেই সময় ওঁর দুন-স্কুলের এক সহপাঠী নাকি একটি মারাত্মক যুক্তি পেশ করেন।

রাজীবের সহপাঠী নাকি বলেছিলেন : "য়োর এক্সেলেন্সি! জনতা পার্টির স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেছিলেন অ্যালোপ্যাথিক ডাক্তারেরা মানুষমারার কল। তাই অ্যালোপ্যাথিক হাসপাতালের শয্যাবৃদ্ধি করা হবে না। আমরা, আই. এ. এস.-রা, সে সরকারী আদেশ মেনে নিয়েছিলাম। কিন্তু সে সময়ের প্রধানমন্ত্রী যদি বলতেন : সরকারী অফিসের সব ইউরিনাল অপসারিত করা হোক, পানীয় জলের টাঁকিই অতঃপর ইউরিনালের কাজ করবে — তাও কি আমরা অপ্রতিবাদে মেনে নিলে দেশসেবার কাজ করতাম? যেহেতু আমরা চাকুরে আর তিনি নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী?"

দুন স্কুলের ছাত্রটি নাকি একথার জবাব খুঁজে পাননি। মেনে নিলেন ঐ বেড়ালটিকে : CAT. এখন কোন সরকারী আমলা নিগৃহীত হলে ঐ CAT-এর কাছে দরবার করতে পারেন। আদালতে তাঁরা যেতে পারেন না— বন্ডেড লেবারদের জন্য সার্ভিস রুলের দাসখত বর্তমান; কিন্তু মিডিয়ার মাধ্যমে জনগণের কাছে নিশ্চয় আসতে পারেন। CAT-এর দরবারে আমলারা শরণ নিচ্ছেন ক্রমবর্ধিত সংখ্যায়। 1989-এ সংখ্যাটা ছিল 18,602 ; 1991-এ বৃদ্ধি পেয়ে 21,623 এবং 1993-এ আরও বৃদ্ধি পেয়ে 27,067 ; এ তথ্য ঐ 'ইন্ডিয়া টুডে' থেকে সংকলিত। অবশ্য কত শতাংশ সুবিচার পেয়েছেন, বা আদৌ বিচার পেয়েছেন, তা জানি না। কিন্তু গদি-আসীন দেশসেবকেরা অস্থিতে অস্থিতে জানেন নিগৃহীত আমলা জনগণের দ্বারস্থ হলে এবং মিডিয়া সেটা ফলাও করে ছাপলে পরের নির্বাচনে বিজু পট্টনায়েক বা শারদ পাওয়ারের মতো হেভিওয়েটের সহযাত্রী হয়ে যাবার আশঙ্কা আছে!

'ইন্ডিয়া টুডে'র প্রতিবেদক সক্ষেদে লিখেছিলেন, "Over the decades, a

tame bureaucracy and a timid populace had come to accept bad governance and unethical conduct as a matter of course." [দশকের পর দশক একদল পোষমানা আমলা আর ভয়ে জবুথবু জনসাধারণ মেনে নিয়েছিল : গদী-আসীনেরা আবশ্যিক ভাবে দুর্নীতিপরায়ণ এবং ঐ কৈতববাদী অপশাসন আমাদের অনিবার্য নিয়তি।]

ঠিক কথা। মেনে 'নিয়েছিল!' পাস্ট টেন্স! কিন্তু অতি সাম্প্রতিক কালে একটা পালা-বদলের পালাও যে লক্ষ্য করছি। রথের রশিতে টান পড়েছে!

জি. আর. খেরনার, আনন্দী শাহু আই. পি. এস., পি. কে. ঝা. আই. পি. এস., কে. জে. আলফন্স আই. এ. এস., শ্রীমতী চক্রলেখা আই. এ. এস. — এঁরা সবাই ব্যুরোক্রেসির প্রতিনিধি, 'পোষমানা আমলা' নন। কে. এম. বিজয়ন অথবা মেধা পটকর আপনার-আমার মতোই জনগণের প্রতিনিধি, 'ভয়ে জবুথবু' জনগণের নয়। কোন নির্বাচিত নেতা — তা তিনি যেভাবেই নির্বাচিত হয়ে থাকুন — যদি আজ বলেন "রাজনীতিতে দুর্নীতি হতে পারে এটা আমি বিশ্বাস করি না। কাগজে সিনেমায়-টিভিতে যা সব লেখালেখি আর দেখানো হচ্ছে সব ধাপ্পাবাজি।" — তখন তা নিয়ে কেউ প্রতিবাদ করে না। বোঝে — 'এমনটা তো হয়েই থাকে।' এসব মন্ত্রীকথিত সুসমাচারের প্রতিবাদ অন্যভাবে জানাতে হয় : মৌখিক নয়, লিখিত নয়, খবরের কাগজে চিঠি লিখেও নয় — ভোটবাক্সে।

* * *

1982 ; কটক শহরের জনবহুল এলাকায় গজিয়ে উঠ্‌ল একটা বে-আইনী মদের ঠেক। কাছেই মেয়েদের স্কুল। শহরবাসীরা থানায় এসে অভিযোগ করলেন। থানা-অফিসার বাধা দিতে গিয়ে বাধা পেলেন। অনুসন্ধানে জানা গেল, ঐ চোলাই মদের ঠেকের মালিক একজন প্রভাবশালী মন্ত্রী। প্রায় প্রতিদিনই সন্ধ্যাবেলা একদল মদ্যপ ঐ রাস্তায় এসে মাতলামি করে। ট্রাফিক জ্যাম হয়ে যায়। ট্রাফিক কন্ট্রোল করে যে হোম গার্ড — কাহিনীর খাতিরে ধরে নিন তার নাম রবি ভট্টাচার্য — সে ঘুষ খেতে রাজি না হওয়ায় দু-একবার ঘুষি খেয়েছে। মদ্যপদের হাতে। কিছু করার নেই! মদ্যপেরা আর এক মন্ত্রীমশায়ের পোষা মাস্‌লম্যান। Rig-বেদ এ দারুণ ব্যুৎপত্তি। 'পত্তি' শুধু নয়, 'বুৎ' দখলেও তাদের দারুণ সুখ্যাতি! রবি এসে দরবার করল এস. ডি. পি. ও.-র কাছে : একটা কিছু করুন স্যার! একে বে-আইনি মদের ভাঁটি, তায় ট্রাফিক-জ্যাম-করা মদ্যপ-মস্তান! ওখানে ডিউটি দেব কেমন করে?"

এস. ডি. পি. ও.-র নামটা জোগাড় করতে পারিনি। গল্পের খাতিরে না হয় ধরে নিন: সঞ্জয় মুখার্জি। তিনি এসে উপস্থিত হলেন ডি. আই. জি.-র দপ্তরে। বললেন, মন্ত্রী-ফন্ত্রি বুঝি না! আপনি যদি ঐ সব কটা অ্যান্টিসোশালকে অ্যারেস্ট করার অনুমতি না দেন

তাহলে আমাকে অন্য কোথাও বদলি করে দিন, স্যার!

ডি. আই. জি.র নামটা জানি। না, নজরুল ইসলাম নয়। তাঁর নাম অনাদি সাহু, আই. পি. এস.। তিনি গম্ভীর ভাবে বললেন : ও. কে.! বল, কোথায় বদ্‌লি হতে চাও?

সঞ্জয় তো হাঁ। বলে, বদ্‌লি? আমি কি স্যার বদ্‌লির আবেদন জানাতে আপনার কাছে ছুটে এসেছি?

ডি. আই. জি. অনাদি সাহু মাথা ঝাঁকিয়ে দাঁতে-দাঁত দিয়ে বলেছিলেন, কাঞ্চু আন্ডারস্ট্যান্ড, ইয়াংম্যান! আমি নিরুপায়! নিতান্ত নিরুপায়। ঐ দুজন মন্ত্রী হচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রীর অত্যন্ত পেটোয়া। নলিনী মোহান্তি আর বিজয় মহাপাত্র। রিটায়ারমেন্টের আর মাত্র দুবছর বাকি! তোমার মতো বয়স থাকলে এ চাকরিতে লাথি মেরে কবে . . .

বিচিত্র ঘটনাচক্র! ঐ বে-আইনি মদের দোকানে কী একটা উৎসবের দিনে মদ গিলে এক রাতে শ-পাঁচেক লোক অসুস্থ হয়ে পড়ল। কটক শহরে এমন দুর্ঘটনা কখনো ঘটেনি। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে দুশো লোক মারা গেল! পাক্কা দুই শত শবদেহ সারি দিয়ে সাজানো হল হাসপাতাল আঙিনায়।

সরকার বিচার বিভাগীয় কমিশন বসাতে বাধ্য হলেন!

চুয়ান্ন বছর বয়সের প্রৌঢ় ডি. আই. জি.-কে কমিশন তলব করলেন। যেদিন তাঁর সাক্ষ্য তার পূর্বরাত্রে সাহুর বাড়িতে এসেছিলেন রাজ্যের সর্বোচ্চ নেতার জনৈক বিশ্বস্ত অনুচর। কী কথাবার্তা হয়েছিল তা জানা যায় না! দীর্ঘ বারো দিন ধরে অনাদি সাহু আদালতে তাঁর জবানবন্দি আর জেরার সওয়াল জবাব চালিয়েছিলেন! লোভ এবং ভয় — উপর্যুপরি দু-জাতের ঔষধই প্রয়োগ করা হয়েছিল। সাহুকে বিন্দুমাত্র টলানো যায়নি। মন্ত্রীদ্বয়ের অপকীর্তির কথা তিনি কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে অকপটে বর্ণনা দিয়ে গিয়েছিলেন! কটকের স্থানীয় ইংরেজি কাগজের কাটিং জোগাড় করেছি। নিজস্ব সংবাদদাতা বলছেন, "সাহুজী তাঁর জবানবন্দিতে দুই মন্ত্রীকে আদালতের ভিতর বস্তুত উলঙ্গ করে ছাড়লেন। কীভাবে তাঁকে ল-অ্যান্ড-অর্ডার রাখতে বাধা দেওয়া হয়েছিল, কীভাবে বারংবার আপত্তি সত্ত্বেও ঐ বে-আইনী মদের ঠেকে চোলাই মদের কারবারে ঐ দুই মন্ত্রী পয়সা লুটেছেন তা অকপট বর্ণনা করেছিলেন সাহু।" বিচারে কার কী শাস্তি হয়েছিল জানি না, শুধু বিচার-অন্তে অনাদি সাহু ডি. আই. জি.-কে তাঁর পুলিশের পোশাক খুলে ফেলতে হয়েছিল এটুকু জানি। তাঁকে আরক্ষা-বিভাগ থেকে সরিয়ে ক্রীড়া-দপ্তরের ডিরেক্টার করে দেওয়া হল। এমনকি ডি. আই. জি.-র ফেয়ারওয়েল পর্যন্ত করতে দেওয়া হল না তাঁর অফিসের কর্মীদের। 'ইন্ডিয়া টুডের' রিপোর্টার লিখেছেন "Shahu was shunted out unceremoniously and made the state's sport director, a post he currently holds (Oct '94)।"

আশা করছি, এবং আশা করি আপনারাও আমার সঙ্গে আশা করছেন : জনগণের প্রচণ্ড কৌতুকে ঐ দুই মহাবলী ষড়যন্ত্রী মশাই তাঁদের নাটের গুরু বিজু পট্টনায়কের সঙ্গ ত্যাগ করেননি, সাম্প্রতিক নির্বাচনে। জগন্নাথের রথের চাকায় তাঁরাও দলপতির সঙ্গে গুঁড়িয়ে গেছেন।

কিন্তু অনাদি সাহু? তিনি কি তাঁর ডি. আই. জি.-র পোশাকটা ফেরত পেয়েছেন? কটকের বাসিন্দা কোন পাঠক বা পাঠিকা আমার এই কৌতূহলটা তৃপ্ত করতে পারেন না? সাহুর তো এ বছরই অবসর নেবার কথা! তাঁর ফেয়ারওয়েল কবে? জানাবেন? তাহলে যেতাম!

* * *

অনাদি সাহু ডি. আই. জি.-র পদ ফিরে পেয়েছিলেন কিনা জানি না, তবে সঞ্জয় মুখার্জি যে 'এস. ডি. পি. ও.'র চাকরিটা ফেরত পাননি, তা জানি। দূর দূর দেশের তথ্য সংগ্রহ করেছি। কিন্তু ঘরের এত কাছে ব্যারাকপুরের তথ্য জানতে পারিনি। গেঁয়ো যোগী হবার ফলেই হয়তো। তাই সঞ্জয় মুখার্জি সংক্রান্ত সংবাদ আমি নিছক 'ইন্ডিয়া টুডে'র সংবাদদাতা-পরিবেশিত তথ্যের বঙ্গানুবাদ হিসাবেই পরিবেশন করতে বাধ্য হচ্ছি। পশ্চিমবঙ্গের পুলিশী-মহল ভারী কড়া! কার্ডধারী সাংবাদিকেরাই রাইটার্স বিল্ডিংস থেকে বিতাড়িত, আর আমি তো ফোতো কাপ্তেন! কী সংবাদ জোগাড় করব? অনুবাদটা শুনুন :

"সঞ্জয় মুখার্জি, 29, আই. পি. এস. অফিসার হিসাবে অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছিলেন যখন তাঁকে তার প্রথম পোস্টিং দেওয়া হল—ব্যারাকপুরের এস. ডি. পি. ও. হিসাবে। ব্যারাকপুর কলকাতার উত্তরে একটি কল-কারখানা অধ্যুষিত অঞ্চল। ব্যারাকপুরে এসেই মুখার্জি অনুভব করলেন — গদি-আসীন সি. পি. আই. (এম) দলের মদতে গোটা অঞ্চলটা স্থানীয় অপরাধজীবীদের একটা শক্ত ঘাঁটি। সেই সমাজ-বিরোধীদের শক্ত ঘাঁটি ভাঙতে উনি যে অভিযান শুরু করলেন তাকে বলা যেতে পারে : 'অপারেশন অস্ত্র!' এলাকার যাবতীয় মস্তান ও গুণ্ডাকে তিনি অল্প সময়ের মধ্যে গরাদের ভিতরে পুরে ফেললেন এবং মাত্র এক বছরের ভিতর একশতটি বে-আইনী আগ্নেয়াস্ত্র 'সীজ' করলেন।

"মুখার্জির এই উপর্যুপরি রেইড-এ প্রচণ্ড ক্ষেপে গেলেন বিজপুর এলাকার স্থানীয় সি. পি. আই. (এম) বিধায়ক জগদীশ দাশ। হাজারদুয়েক অনুগামীকে নেতৃত্ব দিয়ে স্বয়ং হাজিনগর পুলিশ-স্টেশন আক্রমণ করলেন। মুখার্জি লাঠি-চার্জের আদেশ দিলেন। এম. এল. এ.-র অনুগামীরা পিছু হটল। এই বে-আইনী সমাবেশ এবং থানা আক্রমণের জন্য সঞ্জয় মুখার্জি এফ. আই. আর.-এ স্পষ্টাক্ষরে এম. এল. এ. জগদীশ দাশকে চিহ্নিত

করলেন। ফল হল দু-জাতের। সঞ্জয় রাতারাতি জনগণের চক্ষে হিরো হয়ে গেলেন এবং সি. পি. আই. (এম) দল অপদস্থের চূড়ান্ত হল।

"সঞ্জয় মুখার্জির এই ব্যারাকপুরের ক্ষণস্থায়ী কীর্তির কথা স্মরণ করে একজন অতি উচ্চপদস্থ পুলিশ অফিসার বলেছিলেন, "বিগত পনের বছরের মধ্যে এই প্রথম ঐ উপদ্রুত এলাকায় সমাজবিরোধীকর্তৃক আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল!"

"ঐ থানা-আক্রমণকারী জনতাকে বিতাড়নের দশ দিনের মধ্যে মুখার্জিকে একটি অপ্রত্যাশিত প্রমোশন দেওয়া হল! তাঁকে ব্যারাকপুর থেকে তুলে এনে লর্ড-সিন্‌হা রোডের এক বাতানুকূল-কক্ষে অধিষ্ঠিত করা হল। সাংবাদিকেরা অবশ্য বলেন, এ ভাবে তাঁকে সুকৌশলে অপসারিত করা হল মাত্র।"

পশ্চিমবঙ্গে প্রশাসনের চূড়ান্ত নেতৃত্বে যিনি আছেন তিনি হঠকারী নন। গুণীজনকে সমাদর করতে জানেন! সমাদৃত সঞ্জয় মুখার্জি কী বলবেন? প্রমোশন চাই না, স্যার! আমি ব্যারাকপুরেই থাকব? আর গুণ্ডাদের ধরে ধরে ঠ্যাঙাব?

তা তো হয় না, চাঁদু!

* * *

সঞ্জীব চাড্ডার অভিজ্ঞতাটা শুনতে চান? আমার কাছে? বিপদটা কিন্তু আপনাদেরই। এ তো পাগলাকে মনে করিয়ে দেওয়া : 'নাচানাচি করতে গিয়ে নৌকাটা ডুবিয়ে দিস্ না, বাপ।' কারণ চাড্ডার কাহিনীর সঙ্গে অচ্ছেদ্যবন্ধনে জড়িয়ে গেছে 'অলিভ রিড্‌লে টার্টল্‌স্'-এর জীবনসংগ্রামের কথা। ঐ সামুদ্রিক কাছিম হচ্ছে এক দুর্লভ প্রজাতির 'না-মানুষ'। তাহলে চাড্ডার কথা পরে বলব ; আগে ঐ কাছিমের জীবন সংগ্রামের কথাটাই শুনুন :

পান্না রঙের এই Olive Ridley Sea Turtles-এর বৈজ্ঞানিক নাম : *Lepidochclys Olivacea* ; দৈর্ঘ্যে 36 ইঞ্চি (91 সে. মি.) পর্যন্ত হয়। এরা বাস করে সমুদ্রে — কিন্তু ইলিশ মাছের মতো ডিম পাড়তে আসে মোহনায়, সমুদ্র কিনারের চিহ্নিত স্থানে। বছরের পর বছর একই জায়গায়। আর্জেন্টিনা, কলোম্বিয়া, ইকুয়াডোর, মেক্সিকো, পানামা ইত্যাদি স্থানে। ভারতের দুটি সমুদ্র তীরের বিশেষ চিহ্নিত স্থানে ওরা ডিম পাড়তে আসে — মাদ্রাজে, আর উড়িষ্যার বৈতরণিকা স্যাংচুয়ারিতে। এছাড়া পাকিস্তানেও করাচির কাছে একটি উপকূলে। আশ্চর্য ওদের ডিম পাড়তে আসার ব্যবস্থাপনা। এক পক্ষকালের মধ্যে ত্রিশ-চল্লিশ হাজার মাদি-কাছিম একই সমুদ্রোপকূলে পাশাপাশি গর্তে ডিম পাড়তে আসে। ফলে ওদের ধরে ফেলা খুবই সহজ ব্যাপার। ওদের প্রজাতি বিলুপ্তির পথে যাচ্ছে সেই কারণেই — বর্তমানে সমুদ্রে যথেষ্ট পুরুষ

কাছিম আছে কিন্তু মাদী-কাছিম খুব কম।

করাচিতে এরা কীভাবে রক্ষা পেয়েছিল শুনুন। 'না-মানুষী বিশ্বকোষের' দ্বিতীয় খণ্ড থেকে উদ্ধৃতিটা দিচ্ছি :

"সিন্ধু মোহনার উপকূলভাগটা পান্না-কাছিমের কোনও পূর্বপুরুষের — না, ভুল বললাম, পূর্ব-নারীর ভালো লেগে গিয়েছিল। সে আজ কয়েক হাজার বছর আগেকার কথা। হয়তো তখন মহেন-জো-দাড়ো, হড়প্পায় আমাদের পূর্বপুরুষেরা বাস করতেন। তারপর থেকে পান্না-মায়েরা দল বেঁধে ওখানে ডিম পাড়তে আসে। হাজারে-হাজারে। মুশ্‌কিল হল সাম্প্রতিক কালে। সেখানে গড়ে উঠল করাচী শহর। নগরবাসী ভারী খুশি। আল্লাতালার কী অপার মহিমা! শত শত মাইল পাড়ি দিয়ে, ব্রেবোর্ন স্টেডিয়াম এড়িয়ে পান্না-কাছিমেরা আসে জাভেদ মিয়াঁদাদের দেশে। শুধু করাচীবাসীকে ডিম খাওয়াতে! কিন্তু বিজ্ঞানীরা বাদ সাধলেন। তাঁরা করাচীর নগরপাল আর শহরবাসীকে দেখিয়ে দিলেন : পান্না-কাছিমের কান্না! আক্ষরিক অর্থে! সে কী কান্না! দু-পেয়েদের অত্যাচারে পান্না-কাছিমের সন্তানহারা জননীরা অঝোর ধারায় কাঁদছে। স্বচক্ষে দেখে নগরপাল রাজী হয়ে গেলেন। পান্না-কাছিমের সহস্রাব্দী-চিহ্নিত সূতিকাগার কাঁটা তারের বেড়া দিয়ে ঘিরে ফেলা হল। আজও সেই নির্জন সমুদ্রতীরে পান্না মায়েরা ডিম পাড়তে আসে।

"একটা বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব এতক্ষণ পর্যন্ত আস্তিনের তলায় লুকিয়ে রেখেছি : আসন্ন জননী যখন লবণাক্ত সমুদ্র থেকে ডাঙায় ওঠে তখন তার দু-চোখ দিয়ে ঝরঝর করে জল পড়ে। দেহস্থ লবণের আধিক্য ওরা এভাবে কমিয়ে ফেলে। সেই অস্‌মস্‌সিস্‌ (আস্রবণ) প্রক্রিয়া।"

* * *

এম. কে. চাড্ডা, আই. এফ. এস্‌.-এর প্রসঙ্গে ফিরে আসি! প্রাণীবিজ্ঞানে অনার্স ছিল তার। 'অলিভ রিডলে সী-টার্টল'দের ভালভাবেই চেনে। চাক্ষুষ দেখেনি, এই যা। তবে বাঁশী শুনেছে। ফরেস্ট-সার্ভিসে যোগদান করে সে পোস্টিং পেল রাজনগর ফরেস্ট রেঞ্জ-এ। ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসার। এসেই খোঁজ নিল : এই রেঞ্জেই বৈতরণিকা স্যাংচুয়ারিটা পড়ে না? যেখানে পান্না-কাছিমেরা ডিম পাড়তে আসে?

ওর অধীনস্থ ফরেস্ট অফিসার বলল, হ্যাঁ স্যার। বছরের এক বিশেষ সময়ে। একমাসের মধ্যে ত্রিশ-চল্লিশ হাজার কাছিম মারা হয়।

: সে কী! ওরা তো এন্ডেঞ্জার্ড স্পেসিস্‌! ওদের ধরা তো বারণ!

ফরেস্ট রেঞ্জার মাথা নিচু করে। মুখ লুকায়। সে কোন্‌ মুখে বলবে যে, কাছিমের ডিম আর জ্যান্ত কাছিম চালানের ব্যবসাটা কোন ধনকুবেরের। আর তিনি চুনাও-এর সময় কত টাকা প্রণামী দেন পার্টি ফান্ডে!

সঞ্জীব জীপ নিয়ে তখনি রওনা দিল। সেটা পান্না-কাছিমের ডিম পাড়ার মরশুম নয়। তবু জায়গাটা দেখে রাখা ভাল। গিয়ে দেখল — পান্না-কাছিমের সূতিকাগারে বুলডোজার চালিয়ে একটা জেটি বানানো হচ্ছে — রাজ্যের মৎস্য-দপ্তরের প্রজেক্ট। আধ কোটি টাকার বিরাট প্রকল্প!

সঞ্জীব অর্ডার দিল : সব কাম বন্দ্ করি দিঅ!

লিখিত অর্ডার দিয়ে ফিরে এল সে। ঠিকাদার বললে, লাখ্ টাকার 'আইড্‌ল্-লেবার ক্লেম' দেব, স্যার!

সঞ্জীব বললে, আমাকে নয়। ফিশারিজ ডিপার্টমেন্টে। আপনি চুক্তি করেছেন তাঁদের সঙ্গে।

ফিশারির অফিসার বলেন, কিন্তু আপনি এভাবে কাজ বন্ধ করে দিচ্ছেন কেন?

: সহজবোধ্য হেতুতে। এই 'গহিরমাথা' সমুদ্রোপকূল — যেখানে বুলডোজার চলছে — ওটা পান্না-কাছিমদের ব্রীডিং গ্রাউন্ড! ওরা এন্ডেঞ্জার্ড!

অনতিবিলম্বে ডাক পড়ল ভুবনেশ্বরে। সঞ্জীব বলল, একটিমাত্র শর্তে আমি রাজি। উড়িষ্যার চীফ ওয়াইল্ড-লাইফ ওয়ার্ডেন লিখিত অনুমতি দিন, তারপর কাজ চালু হবে।

কিন্তু চীফ ওয়াইল্ড লাইফ ওয়ার্ডেন অমন বে-কানুনী আদেশ লিখিতভাবে কেমন করে দেবেন? ঐ পান্না-কাছিম যে বিশ্বসংস্থার বিঘোষিত 'এন্ডেঞ্জার্ড স্পেসিস্'!

Soon, Chaddha started regularly being summoned to Bhubaneswar, the state capital, to be buttonholed by higher-ups, including allegedly the C. M. (B. Patnaik). To add to his already considerable troubles, the local mafia harassed him constantly, as a sequence of which he had to take to moving around with armed guards. Says the 29 year-old Indian Forest Service Officer, "My mental peace was the first casualty." [অচিরেই চাড্ডার কাছে ঘন ঘন ডাক আসতে থাকে রাজধানী ভুবনেশ্বর থেকে। বড় কর্তারা ওকে নানাভাবে চেপে ধরে বেকায়দা করতে চাইলেন। শোনা যায়, তার ভিতর স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীও (বি. পট্টনায়ক) ছিলেন। এমনিতে তো বিপদে চোখে অন্ধকার দেখছে, তার মধ্যে শুরু হল স্থানীয় মাফিয়াদের অত্যাচার। বাধ্য হয়ে চাড্ডা সশস্ত্র দেহরক্ষী ছাড়া জঙ্গলে যাওয়া বন্ধ করে দিল। উনত্রিশ বছরের আই. এফ. এস. অফিসারটি বলেছিলেন : 'সবার আগে শহীদ হল আমার মানসিক শান্তি'।]

কিন্তু কিছুতেই তাঁকে রোখা গেল না। পান্না-কাছিমের উপাখ্যানটা মুখেমুখে চাউর হয়ে গেল। নানান ধরনের বেসরকারী প্রতিষ্ঠান — না মানুষ দরদীরা, পরিবেশদূষণ বিরোধীরা, 'বাস্তব্যবিদ্যার' ধ্বজাধারীরা অর্থাৎ শাদা-বাঙলায় 'ইকলজিক্যাল-ব্যালেন্স' নিয়ে যাঁরা ছুটোছুটি করছেন তাঁরা, মিডিয়ার শরণাপন্ন হলেন। কাগজে ফলাও করে

খবরটা ছাপা হল। কটকের হাইকোর্টে জনগণের তরফ থেকে সরকারের বিরুদ্ধে মামলা করা হল। জজসাহেব এক কথায় স্টে-অর্ডার দিয়ে দিলেন। পান্না-কাছিমের কান্না থামল। চাড্ডা সাংবাদিককে বলেছিলেন, 'পান্না-কাছিমের সঙ্গে বিশ্বাস করুন, আমিও কান্নায় ভেঙে পড়েছিলাম, কিন্তু আমার সেই অরণ্যের একান্তে রোদন 'অরণ্যরোদন'-এ পরিণত হল না।'

তাই বলে কি চাড্ডার বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেওয়া বন্ধ থাকল?

চাড্ডা ঐ অঞ্চলের হিরো হয়ে উঠেছিলেন। স্থানীয় সাংসদ, বিধায়ক, মন্ত্রীদের ডিঙিয়ে মানুষজন চাড্ডার কাছে বাড়িয়ে ধরে অটোগ্রাফ খাতা! এ কি সহ্য হয়? হাইকোর্টে স্টে-অর্ডার হবার পরেই চাড্ডাকে বদলি করা হল। আট মাসের মাথায়। রাজনগর থেকে আটাগড়ে। মামলার স্টে-অর্ডারই শুধু হয়েছে। রায় তো বের হয়নি। তার আগে লোকটাকে অন্যত্র সরিয়ে দেওয়া দরকার।

এটা গতবছরের ঘটনা। ইতিমধ্যে আর এক জাতের 'রায়' বার হল শেষনের ব্যবস্থাপনায়। উড়িষ্যার নির্বাচন। কটক হাইকোর্টের রায় বের হবার আগেই স্বয়ং ষড়যন্ত্রী মশাইরাই সদলবলে বদলি হয়ে গেছেন। বিস্মৃতির অরণ্যাবাসে।

ব্যাপারটা 'অ্যাড-নসিয়াম' হয়ে যাচ্ছে না তো? না হলে বলি : উড়িষ্যাবাসী কোন পাঠক বা পাঠিকা কি দয়া করে প্রকাশকের মাধ্যমে আমাকে জানাবেন : পান্না-কাছিমদের আঁতুরঘরগুলো টিকে আছে তো? না কি গুঁড়িয়ে গেল নতুন দেশসেবকদের সঙ্গে পুরানো শিল্পপতিদের আঁতাতে?

* * *

শ্রী বিশ্বজিৎ মুখোপাধ্যায়। ওয়েস্ট বেঙ্গল পলুশন কন্ট্রোল বোর্ডের ল-অফিসার। গঙ্গার দু-ধারে বড় বড় শিল্পপতিদের আদেশ দিলেন কারখানার ময়লা সরাসরি গঙ্গায় ফেলা চলবে না। চিমনির ধোঁয়াও সরাসরি আকাশে ছেড়ে দেওয়া চলবে না। কী করতে হবে, স্যার? পরিশোধন করতে হবে প্রথমে। তাতে যে প্রচণ্ড খরচ পড়বে, স্যার? তা তো পড়বেই। খরচ করুন। শোধন করুন।

শিল্পপতিরা রাজনৈতিক চাপের আয়োজন করলেন। প্রভাবশালী রাজনীতিবিদ কর্তাব্যক্তিরা সদলবলে বিশ্বজিৎকে তৈলাক্ত অনুরোধ জানাতে এলেন। উনি তাঁদের আপ্যায়ন করে বসিয়ে বললেন, স্যার, কলকাতার পরিবেশ-দূষণটা এখন কোন পর্যায়ে পৌঁছেছে তা কি জানেন?

রাজনীতিবিদেরা বিজ্ঞের হাসি হেসে বলেন, তা আর জানি না? শুনেছি, সেটা নাকি সম্প্রতি বিপদসীমাও পেরিয়ে গেছে!

: বিপদসীমা! সম্প্রতি? শুনুন একটু ধৈর্য ধরে। কলকাতার বাতাসে সীসার পরিমাণ

প্রতি ঘন মিটারে দুশো থেকে তিনশো মাইক্রোগ্রাম। আর বিপদসীমাটা কত জানেন? দশ থেকে পনের! দ্বিতীয়ত : কলকাতার বাতাসে কার্বন-মনোক্সাইডের পরিমাণ সাত হাজার থেকে দশহাজার মাইক্রোগ্রাম, আর তার বিপদসীমাটা কত জানেন? পাঁচশ।

রাজনীতিবিদ দলপতি গলা খাঁকড়ি দিয়ে বলেন, ইয়ে,...তথ্যটা কোথায় পেলেন?

: এ বছর ইন্সটিট্যুট অব এঞ্জিনিয়ার্স (ইন্ডিয়া)-এর প্ল্যাটিনাম জুবিলি হল। সেখানে একটি টেক্‌নিকাল পেপার পড়েছিলেন ডক্টর এন. সোম। উনি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ডীন অব ফ্যাকাল্টিটজ অব এঞ্জিনিয়ারিং। উনি প্রসঙ্গত বলেছিলেন, "We should ensure that those responsible for contributing to pollution are brought to book easily and promptly..." তা, স্যার 'প্রম্‌প্টলি' যাতে হয় সেটা আমি দেখছি, 'ইজিলি' যাতে হয় সেটা অন্তত আপনারা দেখুন। তাহলে দায়িত্বটা ভাগাভাগি হয় যায়, এই আর কি!

বিশ্বজিৎ মুখোপাধ্যায়কে তাঁর 'স্বধর্ম' থেকে টলানো যায়নি, নানান রাজনৈতিক চাপ সত্ত্বেও। আদালতের আদেশ মানতে হয়েছিল, হচ্ছে, ঐ সব শিল্পপতিদের।

ঠিকই বলেছিলেন প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ভেঙ্কটরমনের মুখ্যসচিব "There's an increasing awareness in the bureaucracy that tame acceptance of one's fate will not help, but face-to-face confrontation might." [আমলাতন্ত্র এই তত্ত্বটার সম্বন্ধে ক্রমেই সচেতন হয়ে উঠছে : অন্যায়কে দুর্ভাগ্য বলে স্বীকার করে নিলে কোন লাভ হবে না, বরং তা হতে পরে সম্মুখ সংগ্রামে সাহস করে রুখে দাঁড়ালে।]

* * *

আজ (8.4.95) সকালে লিখতে বসার আগে আনন্দবাজারে একবার চোখ বুলিয়ে নিচ্ছিলাম। প্রথম পাতাতে দুটি টুক্‌রো খবর। প্রথম খবর : **প্রশ্ন ফাঁসের খবর স্বীকার করে নিলেন সংসদ-কর্তা** : "শেষ পর্যন্ত প্রশ্ন ফাঁসের ব্যাপারে নিজেদের দায়িত্ব স্বীকার করে নিলেন উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা-সংসদের সভাপতি ডঃ সুরজিৎ চক্রবর্তী। শুক্রবার তিনি জানিয়েছেন, 'ইংরেজির দ্বিতীয় পত্রের প্রশ্ন কোন্ পরীক্ষা কেন্দ্র থেকে ফাঁস হয়েছে সেই ব্যাপারে কলকাতা গোয়েন্দা পুলিশ তদন্ত করে রিপোর্ট জমা দিয়েছে।' প্রশ্ন 'পাচারকারী' বা 'চোরকে' ধরিয়ে দেবার দায়িত্ব তো সংসদেরই — তাও মেনে নিয়েছেন স্মরজিৎবাবু।"

দ্বিতীয় খবর ঠিক তার পাশের 'কলমে', তার গায়ে-গায়েই : "**বাসু বললেন : প্রশ্ন ফাঁস হয়নি**।" পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়নি বলে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু আজ চণ্ডীগড়ে সাংবাদিকদের জানান। সাংবাদিক-বৈঠক শেষে বেরোবার মুখে এই ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে জ্যোতিবাবু বলেন, 'না, কোনও প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়নি।' এই

একটিমাত্র কথা বলেই গাড়িতে উঠে যান তিনি। প্রশ্ন ফাঁসের কথা অস্বীকার করেছেন মাধ্যমিক শিক্ষামন্ত্রী কান্তি বিশ্বাসও।"

মন্ত্রী এবং আমলার এমন পরস্পর-বিরোধী বক্তব্য নিয়ে আলোচনার কোন অবকাশ এখানে নেই। 'এমনটা তো হয়েই থাকে'। একটা কমিশন বসালেই কয়েক বছরের মতো নিশ্চিন্ত। তার মধ্যে অনেকগুলি মাধ্যমিক পরীক্ষা হবে। মানুষ সবকিছু ভুলে যাবে, যদি না পরের বছরও ঐ একই স্নেহধন্য টিউটোরিয়াল চক্র থেকে বাৎসরিক প্রশ্ন ফাঁসের ব্যাপারটা এবারের মতো জানাজানি হয়ে যায়!

সম্পাদকীয় পৃষ্ঠায় খান-ছয়েক 'সম্পাদক সমীপেষু' চিঠি ছাপা হয়েছে একই বিষয়ে : ইতিপূর্বে প্রকাশিত রবিবাসরীয় প্রবন্ধ '**নেতারা যখন খলনায়ক**'। এটা প্রথম কিস্তি। ছয়খানি পত্রের একই সুর।

মালদহ থেকে কানু ঘোষালের বক্তব্যের কিছু উদ্ধৃতি দিই, "নীতি, আদর্শ, সততা নামক বস্তুগুলিকে বর্তমানকালের রাজনীতিবিদরা কবেই কুলোর বাতাস দিয়ে বিদেয় করেছে। এখন চলছে মাফিয়া এজ। নেতাগিরি এখন মাস্‌ল্‌ম্যান-নির্ভর। যার হাতে যত গুণ্ডা ও সমাজ-বিরোধী, সে তত বড় নেতা। যত পার অস্থিরতা বাড়িয়ে-চলো ... এক একজন সঞ্জয় বা বিশ্বজিৎ বা শ্রীনিবাস বা স্মরণ হয়তো খোলাখুলি বিদ্রোহের সাহস দেখাতে পারবেন না নেতাদের বিরুদ্ধে ; কিন্তু নিষ্ঠাবান, প্রতিবাদী, অনমনীয়, উচ্চ পদাধিকারী আমলাদের সম্মিলিত প্রতিরোধ ভ্রষ্টাচার ও দুর্নীতির শক্ত গ্র্যানাইট পাথরকেও ভেঙে ফেলতে পারে ; কেন না শত-সহস্র মানুষের কব্‌জিও শক্ত হতে শুরু করেছে।"

দুটো কথা আপনাকে বলব, কানুবাবু। প্রথম কথা : সঞ্জয়-বিশ্বজিৎ-শ্রীনিবাস-স্মরণ খোলাখুলি বিদ্রোহের সাহসই কিন্তু দেখিয়েছেন। হয়তো যুদ্ধজয় করতে পারেননি। 'যুদ্ধ' এখানে 'battle'-এর প্রতিশব্দ। War-এর নয়। ব্যাপক অর্থে War চল্‌ছে। তা আমরা জিতব, যদি শত-সহস্র মানুষের কব্‌জির সঙ্গে আপনার এবং আমার কব্জিও শক্ত হয়ে ওঠে। কারণ 'এ আমার এ তোমার পাপ!' 'উচ্চ পদাধিকারী আমলারা' তখনই সম্মিলিত প্রতিরোধ গঠন করতে পারবেন যখন আপনি-আমি পুরস্কারের লোভে লালায়িত হব না, তিরস্কারের ভয়ে পিছপাও হব না। ওঁদের সঙ্গে পায়ে পা ফেলে দুর্নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করব।

দ্বিতীয় কথা : আপনার চিঠিটা আনন্দবাজারের যে সংখ্যায় বেরিয়েছে তাতেই প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছে আর একটি খবর। দেখেছেন? "**জেলা পরিষদের সঙ্গে দ্বন্দ্বে সরে যেতে হচ্ছে বাঁকুড়ার ডি. এম.-কে**।" সেই বুলডোজার রীনা বেঙ্কটরমন! কদিন আগে বাঁকুড়াবাসীদের উদ্দেশ্যে লিখেছিলাম, আগামী শারদীয়া মণ্ডপে ঐ দাক্ষিণাত্যের

দুঃসাহসী মহিলাটিকে একটা সম্বর্ধনা জানাতে। আজ বুঝছি, তা হবার নয়। সংবাদটা আগেভাগে জানা থাকলে আপনিও বোধহয় চারজন পুরুষের সঙ্গে এই মহিলার নামটিও যুক্ত করে দিতেন, তাই নয়?

আপনি যে চারটি নাম উল্লেখ করেছেন, কানুবাবু, তাঁর মধ্যে দুজনের কথা বলেছি। বাকি দুজনের সঙ্গে এবার পাঠকপাঠিকাদের পরিচয় করিয়ে দিই।

* * *

টি. সি. এ. শ্রীনিবাস রামানুজম, আই. এ. এস.। পাটনার একজন সিনিয়ার অফিসার। বিরানব্বই সালে তিনি ছিলেন বিহার সরকারের স্বাস্থ্যমন্ত্রকের কমিশনার। জামশেদপুরের একটি মেডিকেল কলেজে ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি করার বিষয়ে একটি ফাইল ছিল তাঁর দপ্তরে। সচরাচর মেডিক্যাল ও এঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি হতে চায় কয়েক হাজার প্রার্থী, নেওয়া হয় মাত্র কয়েক শত। ফলে নির্বাচন একটা জটিল ব্যাপার। একদিন শ্রীনিবাস রামানুজম অফিসে বসে কাজ করছেন, বাজল টেলিফোন। ও-প্রান্তের বক্তা নিজ পরিচয় দিলেন : রামশরণ যাদব এম. এল. এ.। শ্রীনিবাস চিনলেন — জনতা দলের একজন ক্ষমতাশীল নেতা। তাঁর অনুগ্রহভাজন অনেকগুলি পাটনাই মাস্‌ল্‌ম্যান। যাদব জানতে চাইলেন, তিনি যে ছাত্রীটিকে ভর্তির জন্য সুপারিশ করেছেন তার অ্যাডমিশন কি হয়ে গেছে? রামানুজমের ঠিক স্মরণ হল না। জবাবে বললেন, ফাইল দেখে বলব, কাল এই সময়ে একবার কাইন্ডলি ফোন করবেন।

রামশরণ জবাবে গর্জে উঠলেন কল নহী, আজ, আব্‌ভি! হম্‌ সব আ-রহাহুঁ!

রামশরণ ইতিপূর্বেই দপ্তর থেকে জেনে গিয়েছিলেন যে, তাঁর সুপারিশ করা মেয়েটি 'অ্যাডমিশন টেস্টে' জঘন্য মার্ক পেয়েছে এবং নির্বাচিত হয়নি। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই রামশরণ শ-দুয়েক সহকর্মী নিয়ে কমিশনারের কক্ষে চড়াও হয়ে সব ভাঙচুর করেন। চেয়ার থেকে টেনে প্রৌঢ় অফিসারটিকে মাটিতে পেড়ে ফেলা হয়। কীল-চড়-ঘুষি তো বটেই, তাঁকে জুতো-পেটাও করা হয়েছিল।

রামশরণের সুপারিশ পাওয়া মেয়েটি মেডিকেল কলেজে অ্যাডমিট হতে পারেনি, কিন্তু রামানুজম অ্যাডমিশন পেয়েছিলেন হাসপাতালে।

এবারে 'সিন্‌হার' অপমানের মতো আমলারা এটা মেনে নিলেন না। লালুবাবুর মতো দোর্দণ্ড প্রতাপশালী এবং অত্যাচারী মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে পাটনার আই. এ. এস. এবং আই. পি. এস. অ্যাসোসিয়েশন একত্রে একটা গোপন সভা করে একটা ডেপুটেশন দেবার সিদ্ধান্ত করলেন — স্বয়ং রাজ্যপালকে। চীফ সেক্রেটারি থেকে যাবতীয় গেজেটেড অফিসার মৌন মিছিল করে প্ল্যাকার্ড হাতে রওনা দিলেন রাজ্যপালের আবাসে। লালু 'একশ চুয়াল্লিশ ধারা' জারীর ব্যবস্থা করলেন। জারী হল। নীরব পদযাত্রাও হল। কোন্‌

পুলিশের ঘাড়ে দুটো মাথা যে, গ্রেপ্তার করবে চীফ সেক্রেটারিকে? হোম সেক্রেটারিকে? আই. জি.-কে?

চূড়ান্ত অপমান হল লালুবাবুর। সে মিছিলের ছবি ছেপেছিল 'দ্য স্টেটস্‌ম্যান' পত্রিকা। লালুবাবুর সঙ্গে রামশরণের জনান্তিক আলাপচারী কী জাতের হয়েছিল জানি না। 'যাদব' হওয়া সত্ত্বেও রামশরণ পদত্যাগ করে বর্তমানে কংগ্রেস দলে নাম লিখিয়েছেন, এটুকু জেনেছি।

* * *

স্মরণ সিং, আই. এ. এস. বিরানব্বই সালে ছিলেন পঞ্জাবের মনসা-জেলার ডেপুটি কমিশনার। উচ্চতন অফিসের আদেশ পেলেন আশিজন নতুন করণিক নিতে হবে সরকারী কাজে। এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ থেকে নাম সংগ্রহ করে লিখিত পরীক্ষা নিলেন।

এই সময় স্মরণ সিং একটি 'একান্ত গোপন' ছাপ-মারা পত্র পেলেন গুর্মিৎ সিং-এর কাছ থেকে। গুর্মিৎ সিনিয়ার অফিসার, মুখ্যমন্ত্রী বিয়ান্ত সিংজীর রাজনৈতিক-সচিব। চিঠি সংক্ষিপ্ত, প্রাঞ্জল এবং প্রাণজল : "সংলগ্ন কাগজে আশিটি প্রার্থীর নাম-ঠিকানা লেখা আছে। ওদের কিছু কিছু এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে নামও লিখিয়েছে, সবাই নয়। সে-যাহোক, মুখ্যমন্ত্রীর ইচ্ছানুসারে এই আশি জনকেই চাকরি দিতে হবে। পরীক্ষার ফলাফল দেখার প্রয়োজন নেই।"

দুঃসাহসী স্মরণ সিং টেলিফোন করে মুখ্যমন্ত্রীর পলিটিক্যাল সেক্রেটারিকে জানালেন — ঐ অন্যায় আদেশ তিনি মেনে নিতে অপারগ। তৎক্ষণাৎ তলব এল স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী বিয়ান্ত সিং-এর দপ্তর থেকে। বিয়ান্ত কংগ্রেস দলের। কেন্দ্রের স্নেহধন্য। স্মরণ এসে দেখা করলেন মুখ্যমন্ত্রীর চেম্বারে। বিয়ান্ত সিং একটিমাত্র পংক্তিতে তাঁর মনোবাসনার কথা প্রকাশ করলেন, 'শোন স্মরণ সিং! আশি জন নয়। আমরা পুরোপুরি একশ জন লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক নেব। অর্ডারটা গুর্মিৎ-এর কাছ থেকে নিয়ে যেও। আশিটা নাম তো আগেই পেয়েছ। বাকি এই বিশজনের নাম-ঠিকানা নাও। তুমি ব্যস্ত-মানুষ। তোমাকে আটকাব না। যাও।"

স্মরণ সিং নিঃশব্দে ফিরে এলেন। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর আদেশ অনুযায়ী অর্ডার দিলেন না। পরীক্ষার খাতাগুলো দেখতে বসলেন। ওঁর অধীনস্থ অফিসার বলল, "এ কী করছেন, স্যার? স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী আপনাকে ডেকে কাল দুপুরে কী বললেন?"

স্মরণ সিং তাঁকে বলেছিলেন, "তারপর কাল রাত্রে স্বয়ং গুরুগোবিন্দ্ সিংজী আমাকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বলেছেন 'ধরম সব্‌সে উঁচা!"

খবরটা জানাজানি হয়ে গেল। ওঁর বিভাগীয় মন্ত্রীমশাই তৎক্ষণাৎ 'রিক্রুটমেন্ট বোর্ড'এর একটি সভা ডাকলেন — সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত নিতে। সিদ্ধান্ত কী হবে তা

তো জানাই আছে। শুধু সে মিটিঙে আসতে বললেন না বিভাগীয় সেক্রেটারিকে। 'এমনটাও হয়ে থাকে।' পশ্চিমবঙ্গেও একজন মাননীয় মন্ত্রী সম্প্রতি এ জাতীয় একটি মিটিং ডেকেছিলেন, বিভাগীয় সচিবকে বাদ দিয়ে : এক কোটি টাকার আলু ক্রয়ের পূর্বসিদ্ধান্তটা পাস করিয়ে নিতে।

বঞ্চিত প্রার্থীরা সরাসরি আদালতের শরণ নিল। সরকারের বিরুদ্ধে। চণ্ডীগড়ের সাংবাদিক রমেশ বিনায়ক লিখেছেন, "Just before he deposed in court, he was 'threatened' with departmental action if he spoke against the Chief Minister. And an hour before the hearing on August 17, 1992, Swaran says, he was again called to Beant Singh's residence for reasons not hard to guess. Finally, on the day of the case's second hearing, there was a bomb scare in the court. Unnerved by the events, Singh is seeking transfer to a safe posting." [আদালতে জবানবন্দি দিতে যাবার আগে স্মরণকে ডেকে ধমক দেওয়া হল — তিনি যদি মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে একটি কথা বলেন তবে তাঁকে বিভাগীয় শাস্তি দেওয়া হবে। সতেরই আগস্ট 1992 তারিখে আদালতে সাক্ষী দিতে যাবার যখন ঘণ্টাখানেক বাকি তখন নাকি মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে দেখা করে যাবার একটি আদেশ পান স্মরণ। হেতুটা সহজবোধ্য। শেষ পর্যন্ত আদালতে দ্বিতীয় দিনের শুনানীর সময় গুজব রটে যায় কোর্টে একটি 'টাইম-বম্ব' রাখা আছে। আদালত মুলতুবি রাখা হয়। স্মরণ সিং এই জাতীয় ঘটনায় বিহ্বল হয়ে বদলির জন্য দরখাস্ত করেন।]

মুখ্যমন্ত্রী বিয়ান্ত সিং কংগ্রেস-আই দলের। তিনি গদীতে ওঠার আগে রাষ্ট্রপতির শাসনকালে স্মরণ সিং বেসরকারী প্রতিষ্ঠান থেকে সাত-সাতটি চাকরির অফার পান — তিনি এতই সৎ ও কর্মকুশল ছিলেন। স্মরণ তার ভিতর কোন একটি বেছে নিতে চাইলেন। সাংবাদিক রমেশ বিনায়ককে স্মরণ বলেছিলেন, "I am cheerful because my conscience is clear. Truth is my biggest strength." [আমার মানসিক শান্তি নষ্ট হয়নি, কারণ আমার বিবেক পরিষ্কার। আমার সবচেয়ে বড় হাতিয়ার : সত্য।]

রথের চাকা যে ঘুরেছে তার প্রমাণ দিতে ঐ কালো মেঘের সীমান্তে একটা রূপালী-রেখার সূক্ষ্ম দাগ এবার টানি।

বিয়ান্ত সিং কংগ্রেস দলের। দেশের বর্তমান আর্থ-সামাজিক অবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকার কিছুটা স্বেচ্ছায়, কিছুটা বাধ্য হয়ে এইসব দুর্নীতিপরায়ণ রাজনীতিকদের সহ্য করছেন।

যেমন আর একজোড়া উজ্জ্বল উদাহরণ তামিলনাড়-এর স্বেচ্ছাচারী দুর্নীতিপরায়ণ মুখ্যমন্ত্রী জয়ললিতা অথবা পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার ; কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারে

নিশ্চয় কিছু বিচক্ষণ এবং ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তি আছেন — মন্ত্রী পর্যায়ে অথবা আমলাতন্ত্রে — যাঁরা ঐ নির্ভীক ন্যায়নিষ্ঠ আই. এ. এস. অফিসারটিকে মনে মনে তারিফ করেছেন! না হলে নিম্নবর্ণিত ঘটনা ঘটে কী করে?

স্মরণ সিং সাত-সাতখানি বেসরকারী আহ্বান নিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করতে যখন ব্যস্ত — অর্থাৎ পদত্যাগ করে কোন প্রতিষ্ঠানে যোগদান করবেন — তখনই পেলেন দিল্লীর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক থেকে একটি সীলমোহরাঙ্কিত লেফাফা : স্মরণ সিং আই. এ. এস.-এর কর্মদক্ষতায় প্রীত হয়ে কেন্দ্রীয় সরকার তাঁকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একটি বিশেষ ট্রেনিং নিতে পাঠাচ্ছেন : 'অ্যাডমিনিস্ট্রেশন-কোর্স'। খামের ভিতর ছিল একটি সার্টিফিকেট — সরকার 'টু-হুম-ইট-মে-কন্সার্ন'-কে জানাচ্ছেন যে, স্মরণ সিং আই. এ. এস.-এর বিরুদ্ধে সরকারের কোনও অভিযোগ বা কেস পেন্ডিং নেই।

এটার প্রয়োজন ছিল, পাসপোর্ট জোগাড় করতে।

স্মরণ বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে ট্রেনিং নিচ্ছেন। আপাতত তিনি বিয়ান্ত সিং-এর নাগালের বাইরে।

* * *

অদ্ভুত জীবন। জন্ম মুর্শিদাবাদ জেলার এক প্রত্যন্ত গ্রামের কৃষক পরিবারে। ডোমকল হাই স্কুল থেকে হায়ার সেকেন্ডারী। স্কুলে থাকতে পড়ার বই কেনার সংস্থান ছিল না। পরের বই ধার করে পড়েছেন। কিন্তু পড়াশুনায় বরাবরই ভাল। বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজ থেকে বি. এসসি. এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাঙলায় এম. এ.। মুর্শিদাবাদের যে প্রত্যন্ত গ্রামে ওঁর বাল্যকাল কেটেছে সেই রমনা-বসন্তপুরে তখনো বিদ্যুৎ যায়নি। এখনো যায়নি! পড়তে হয়েছে লণ্ঠনের আলোয় — ষাটের দশকে। ঐ গ্রামের তিনিই বোধহয় প্রথম গ্র্যাজুয়েট। কৃষ্ণনাথ কলেজে ল্যাবরেটরি-অ্যাসিস্টেন্ট হিসাবে কর্মজীবনের শুরু। বিভাগীয় পরীক্ষা দিয়ে রাইটার্সে লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক। তারপর W. B. C. S. পাস করে সমবায় দফতরের সহকারি রেজিস্টার। একাশি সালে আই. পি. এস.-এ নির্বাচিত। ইতিমধ্যে পি. এইচ. ডি. থিস্‌িস জমা দিয়ে বাংলায় ডক্‌টরেট।

কিন্তু ওঁকে তুলে ধরছি এ কারণে নয় যে, তিনি ছাত্র হিসাবে অদম্য অধ্যবসায়ের আদর্শ। কারণ এই : তিনি চূড়ান্ত সত্যনিষ্ঠ এবং নির্ভীক। বুনো রামনাথ যদি অষ্টাদশ শতাব্দীর একজন আদর্শ শিক্ষকের উদাহরণ, তাহলে এই বিংশ শতাব্দীতে একটি আদর্শ পুলিশ অফিসারের দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবেন ডক্টর নজরুল ইসলাম, আই. পি. এস.।

পুলিশের চাকরিতে প্রথম পোস্টিং ছিল বীরভূমে : এস. ডি. পি. ও. বোলপুর। ক্ষমতাশীল রাজনৈতিক দলের মস্তানেরা একটি গ্রাম আক্রমণ করে একজনকে খুন

করে। মহিলাদের বিবস্ত্র করে। আহত ব্যক্তিদের মুখে মূত্রত্যাগও করে। কেন করবে না? তারা তো পার্টি-মস্তান! সদ্য চাকরিতে প্রবেশ করা নজরুল এলাকার সাংসদের বাড়িতে হানা দেন। গ্রেপ্তার করেন পুত্রসহ এলাকার এম. এল. এ.-কেও। ঘটনার পর তাঁর ঐ প্রথম পোস্টিং থেকে বদলির আদেশ পান একমাসের মধ্যে। পরে ঐ এম. এল. এ. অবশ্য দল থেকে বহিষ্কৃত হন। তা হোক, পার্টি-মস্তানের গায়ে হাত দিলে বদলি অনিবার্য!

কিছুদিন ছিলেন ই. এফ. আর. এবং ব্যারাকপুর ব্যাটেলিয়ানে। কিছুদিন বাঁকুড়ার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার। তারপর ঐ অ্যাডিশনাল এস. পি. হিসাবেই বদলি হলেন স্মাগলারদের ভূস্বর্গ, শিলিগুড়িতে।

স্থানীয় সি. পি. এম. নেতা সাংবাদিকের কাছে স্বীকার করেছিলেন : "শিলিগুড়ি নামের সঙ্গে মিশে গিয়েছে কাঠ চুরি, স্মাগলিং, মস্তানি — সব জাতের অপরাধ। অসম্ভব শোনালেও নজরুলের আমলে এই ছবিটা অনেকটাই বদলে গিয়েছিল।"

নজরুলের এক সহকর্মীর মতে, "সাধারণ মানুষের চোখে তিনি হয়ে উঠেছিলেন ত্রাণকর্তা দেবতা!"

এক বছর এক মাস, সঞ্জয় মুখার্জির তুলনায় অনেক বেশি সময়, বডি-লাইন বোলিং ঠেকিয়ে ক্রীজে টিকে ছিলেন — কী বলেন? তারপর কয়েক ঘণ্টার নোটিশে তাঁকে বদলি করা হল — কয়েকজন অতি উচ্চপর্যায়ের নেতার চাপে। আনন্দবাজারে সাংবাদিক দুর্বার গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছিলেন :

"শিলিগুড়ি থেকে লরি বোঝাই কাঠচুরি ছিল দিনের আলোর মতো স্বাভাবিক ঘটনা। নজরুলের আমলে এই কাঠচুরি সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। দক্ষিণ-এশিয়ার নামজাদা 'হংকং' মার্কেটে পর পর দুবার হানা দিয়ে তিনি আতঙ্কিত করেছিলেন মহাকরণের পদস্থ আমলাদেরও। বলা বাহুল্য স্মাগলাররা তাঁকে পয়লা নম্বর শত্রু মনে করত।

"স্মাগলিং থেকে কিছু মানুষের হাতে এত টাকা জমে যেত যে, শহর জুড়ে টাকার জোরে যে-কোন বে-আইনি কাজ করার সাহস তারা পেত। তাদের প্রত্যেকের জীবন বিপন্ন করে তুলেছিলেন নজরুল। জাঁকিয়ে থাকা মস্তানরাজ খতম করে সাধারণ মানুষকে মুক্ত নিশ্বাস নেবার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। এতেও ভীষণ চটেছিলেন সি. পি. এম.-এর একদল প্রভাবশালী নেতা। সিমেন্ট চুরির দায়ে এক পঞ্চায়েত প্রধানের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করায় অবস্থা আরও ঘোরালো হয়। মানুষের আশীর্বাদ নজরুলের বদলি রদ করতে পারেনি।

"...একটি পুরনো কেস একটানা তদন্ত করে রাজ্য সরকারের তহবিলে এগারো কোটি টাকা নিয়ে এসেছিলেন অনমনীয় এই অফিসার। নজরুল এসে যোগদান করলেন,

প্রথমে কলকাতা বিমানবন্দরে, পরে কলকাতা পুলিশের ডি. সি. (ডি. ডি. স্পেশাল) হিসাবে, এখানে তাঁর কাজ ছিল ড্রাগের বিরুদ্ধে অভিযান. কিন্তু বৌবাজার বিস্ফোরণের পর পুলিশ কমিশনার তুষার তালুকদার এই সৎ অফিসারটির হাতে তুলে দিয়েছিলেন গুণ্ডাদমনের দায়িত্ব। বিস্ফোরণের সঙ্গে কে কে জড়িত তা আর খুঁজতে হল না।"

দুর্বার গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন : "বছরের পর বছর ধরে সরাসরি পুলিশের মদতে বেড়ে ওঠা সাট্টার কারবার তিনি সম্পূর্ণ স্তব্ধ করে দিয়েছেন শহর কলকাতায়। নামী-দামী সমস্ত সাট্টা-কারবারিদের শুধু ডেরা ভাঙা নয়, তাদের উপর একটানা আঘাত হেনে কার্যত তাদের কলকাতা ছাড়া করেছেন। সাট্টার ডেরা ভাঙতে গিয়ে আক্রান্ত হয়েছেন সি. পি. এম. এর 'শিক্ষক'-নেতার হাতেও। পরিবর্তে থেমেছে সাট্টার রমরমা কারবার।"

ডক্টর নজরুল ইসলামের লেখা বই — *'বকুল'* এখন বেস্টসেলার। যদি এখনো না-পড়ে থাকেন, তবে পড়বেন। বকুল বিশ্বাস শিলিগুড়ির একজন 'কল্পিত' পুলিশ-অফিসার, যে নাকি অপরাধজীবীদের চোখে 'দুষমন' আর সাধারণ মানুষের চোখে ত্রাতা 'দেবতা' হয়ে গিয়েছিল। তবে এই কল্পিত নায়ক সেখানে তের মাসের বেশি টিকতে পারেনি। শাসক দল তাকে চব্বিশ ঘণ্টার নোটিশে 'রুটিন-ট্রান্সফার' করে শিলিগুড়ি থেকে তাড়িয়েছিল।

একটা অপ্রাসঙ্গিক কথা বলে নিই, প্রসঙ্গান্তরে যাবার আগে। একষট্টি সালে একখানা কেতাব লিখেছিলাম নৈমিষারণ্য (*'অরণ্যদণ্ডক'*)। *'বকুল'* উপন্যাসের লেখকের বয়স তখন সাত — বোধকরি লণ্ঠনের আলোয় তিনি মুর্শিদাবাদ জেলার রমনা-বসন্তপুর গ্রামে সে সময় সহপাঠীর কাছে ধার করে নিয়ে-আসা 'সহজ-পাঠ' পড়ছেন। *'অরণ্যদণ্ডক'* বইটি আমি উৎসর্গ করেছিলাম চারুচন্দ্র চক্রবর্তীকে এই ভাষায় "জীবনকে দেখাতে গিয়ে যিনি জীবিকার কথা চিন্তা করেননি, সেই জরাসন্ধকে।"

আজ সলজ্জে স্বীকার করি, ষাটের দশকে সরকারী চাকুরে 'বিকর্ণ' একটি ছদ্মনামের আড়ালে থেকে প্রণাম জানিয়েছিলেন আর এক ছদ্মনামের অন্তরালবর্তী সরকারী চাকুরে 'জরাসন্ধ'কে।

তোমার উদ্দেশ্যে বয়ঃজ্যেষ্ঠ সাহিত্যিকের লাখো-সেলাম রইল, ভাই নজরুল : নব্বই এর দশকে তুমি স্বনামে *'বকুল'* লিখেছ নির্ভীকভাবে! জীবনযন্ত্রণাকে দেখাতে গিয়ে তুমিও জীবিকার কথা চিন্তা করনি।

* * *

একটি মেয়েদের স্কুলে পুরস্কার বিতরণী উৎসবে কিশোরীদের জমায়েতে আমি প্রশ্ন করেছিলাম, তোমাদের মধ্যে কতজন সুস্মিতা সেনকে চেন? শুনে মেয়েরা হেসেই বাঁচে না। ইস্কুলে উঁচু ক্লাসে পড়ে এমন কোন মেয়ে আছে নাকি যে, ইতিমধ্যেই ভুলে গেছে

টি. ভি.-তে দেখা সুস্মিতা সেনের সেই বিশ্বসুন্দরীর নাম ঘোষণা-মুহূর্তের স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তি? কিন্তু আমার পরের প্রশ্নটায় ওরা সবাই কেমন যেন থমকে গেল। ত্রিশ-চল্লিশজন কিশোরীর মধ্যে শুধু একজন ডাগরচোখা শ্যামলা মেয়ে স্বীকার করেছিল, হ্যাঁ, সে মেধা পটকরের নাম শুনেছে। 'নর্মদা বাঁচাও' আন্দোলনে তিনি নাকি আমরণ অনশনের প্রতিজ্ঞা করেছিলেন।

আমি জানতে চেয়েছিলাম, তারপর? কে বাঁচল? কে মরল? নর্মদা আর মেধা পটকরের মধ্যে? দুজনেই বাঁচল? না, দুজনেই মরল?

হয়তো মেয়েটি জবাবটা জানত ; কিন্তু সহপাঠিনীরা এমন সমবেতভাবে তার দিকে তাকালো যে, বেচারি লজ্জিতভাবে বলল, জানি না।

দোষ ঐ কিশোরী মেয়েদের নয়। তাদের অভিভাবক বা শিক্ষয়িত্রীদেরও নয়। কী বলব?—'এ আমার এ তোমার পাপ!' যে আর্থসামাজিক ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে আমরা দিন গুজরান করছি এ তার দোষে। দেশের যাঁরা শাসক, সমাজের যাঁরা মাথায়, তাঁরা চান না আমরা মেধা পটকরকে চিনে রাখি। তাই সংবাদপত্রে বা টি. ভি.-র পর্দায় বিশ্বসুন্দরী ফিরে ফিরে আসেন। বাবা আম্‌তে, বহুগুণা বা মেধা পটকরেরা অনুপস্থিত।

* * *

আজ থেকে দশ বছর আগে, 1985 সালে মেধা পটকর দিল্লীর একজন অ্যাডভোকেটকে সঙ্গে নিয়ে নর্মদা উপত্যকায় প্রথম আসেন 'কিছু একটা করতেই হবে' এই প্রতিজ্ঞাটুকু সম্বল করে। সেই বিচক্ষণ আইনজীবী মেধাকে বলেছিলেন, "শোন মা! শুধু আইন দিয়ে কিচ্ছু হবে না। প্রতিপক্ষ অত্যন্ত প্রবল। তারা যা খুশি করবে। আদালতে ডেট-এর পর ডেট নেবে। মামলা আদালতে উঠ্‌তে উঠ্‌তেই তোমার এই মনিবেলি সাত-মানুষ গভীর জলের তলায় তলিয়ে যাবে।'

হ্যাঁ, মনিবেলি। ছোট্ট একটি গ্রাম। আদিবাসী অধ্যুষিত। এদিকে মহারাষ্ট্র ওদিকে গুজরাট। দুই রাজ্যের মধ্যবর্তী ধুলিয়া জেলার এই আদিবাসী অধ্যুষিত গ্রামখানিই হবে সর্দার সরোবর প্রকল্পের প্রথম বলি। অ্যাডভোকেট বলেছিলেন, মামলা নয়, তুমি এদের নিয়ে আন্দোলন গড়ে তোলো। প্রতিবাদ কর। তাতে 'কাজ' হলেও হতে পারে।

মেধা পটকরের বয়স তখন আঠাশ। ইতিপূর্বে রুইয়া কলেজ থেকে রসায়নবিদ্যায় স্নাতক হয়েছে। তারপর চলে গিয়েছিল জামশেদপুরে —টাটা ইন্সটিট্যুট অব স্যোশাল সায়েন্সেস্ থেকে সমাজ-সেবার একটা ডিপ্লোমা নিয়েছে। ওর বাবা বসন্ত্ খানোলকর আর মা ইন্দুতাই — দুজনেই ছিলেন ট্রেড ইউনিয়ানের সক্রিয় কর্মী। ঝাণ্ডা ঘাড়ে পথে পথে চিক্কুড় তুলে ঘুরে বেড়ানোর আকুতি ওর রক্তে। সমাজসেবার ছাড়পত্র নিয়ে ও চলে এল বোম্বাই শহরে। তিনটি বস্তিতে সে সমাজসেবার কাজ করতে শুরু করল —

চেম্বুর, ঘাটকোপার আর বিক্রোলি। কিন্তু ঐ বঞ্চিত, শোষিত, নিরন্ন মানুষগুলোকে শুধু সেবা করে তৃপ্ত হত না ওর বিদ্রোহী আত্মা! ব্যাপারটা কী? তোমরা, দেশের শাসকের দল, শিল্পপতিদের সহযোগিতায় ঐ বস্তিবাসী অসহায়গুলোর গলা টিপে রক্ত চুষবে আর আমরা সমাজসেবীর দল, বিদেশ থেকে ভিখ্‌মেঙে-জোগাড়-করা পাউডার মিল্ক গুলে খাইয়ে বস্তিবাসীর বাচ্চাদের বাঁচিয়ে রাখব? কেন? যাতে বড় হয়ে ওরা তোমাদের দাসত্ব করতে পারে?

ঐ সময়েই কে যেন ওকে এসে জানাল নর্মদা বাঁধ প্রকল্পের দুর্দশার কথা! বিরাট প্রকল্প — তিন তিনটে রাজ্য-সরকার মিলিতভাবে কাজে হাত দিয়েছেন। নর্মদা নদীর উপর দুইটি বড়, ত্রিশটি মাঝারি আর তিন হাজারটি ছোট ছোট বাঁধ দিয়ে নর্মদাকে বেঁধে ফেলা হবে। তা করলে কী হয়?

নর্মদা প্রকল্পের তিন-সরিক বললেন, "অপুত্রের পুত্র হয়, নির্ধনের ধন হয়, যে যে বর চায় সে সে-বর পায়। শোন বলি ..."

তাঁরা যে লম্বা ফিরিস্তি শোনালেন তা নিতান্তই অবাস্তব। ওঁদের মতে সর্দার সরোবর প্রকল্পের কাজ সম্পূর্ণ হলে গুজরাটের আঠার লক্ষ হেক্টর, রাজস্থানের পঁচাত্তর হাজার হেক্টর জমি চাষের জল পাবে। এছাড়া 1,450 মেগাওয়াট শক্তিও উৎপন্ন হবে।

লাভের অঙ্কটা নিয়ে পরে বিশ্লেষণ করা যাবে। আপাতত দেখি ক্ষতির পরিমাণটা কী? প্রস্তাবিত জলাধার, খালের নেট-ওয়ার্ক, প্রস্তাবিত অভয়ারণ্য ইত্যাদি মিলিয়ে দশ লক্ষ নিরন্ন গরিব মানুষ বাস্তুচ্যুত হবে। অধিকাংশই নিরক্ষর আদিবাসী—চাষ-আবাদ ছাড়া আর-কিছু জানে না। মাটির মানুষ — মাটিকেই চেনে।

কত খরচ হবে? না, বেশি নয়! 20,000 কোটি! আজ্ঞে হ্যাঁ, ছাপার ভুলে শূন্য বেড়ে যায়নি। বিশ হাজার কোটি টাকার কথাই বলছি আমি। তা, এত টাকা আসবে কোথা থেকে? ওঁরা বললেন, সে-সব ব্যবস্থা হয়েছে : বিদেশী ঋণ। ভারতবর্ষ যে আজ তিন লক্ষ কোটি টাকার মতো বিদেশী ঋণের জালে জড়িয়ে আছে সেটাই সামান্য বৃদ্ধি পেয়ে সওয়া তিন-লাখ-কোটি মতো হবে, এই আর কি। যাঁহা বাহান্ন, তাঁহা বাহাত্তর!

কিন্তু কিছু ভারতীয় বেসরকারী বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানের মনে সন্দেহ জাগল : ডাল মে কুছ কালা হ্যয়! কারণ আছে। সারা পৃথিবীকে এখন ঐ বড় বড় জলবিদ্যুৎ পরিকল্পনাগুলি বর্জিত। পঞ্চাশ বছরের অভিজ্ঞতাতে প্রযুক্তিবিদেরা বুঝেছেন : এটা কোনও সমাধান নয়, বরং সর্বনাশের সূত্রপাত। নিকোলাস হিলওয়ার্ড আশির দশকের মাঝামাঝি তাঁর লেখা বইতে [The Social & Environmental Effects of Large Dams] প্রযুক্তিবিদদের ভবিষ্যতে এ জাতীয় বড় বড় বাঁধ তৈরি করতে বারণ করেন স্পষ্টাক্ষরে। তাঁর যুক্তিগুলি সংক্ষেপে এই রকম —

- শাসকেরা সাধারণ মানুষের ঘাড়ে এইসব 'বড় বাঁধ' উপর থেকে চাপিয়ে দেয়। বেশির ভাগ সময় দেখা গেছে, এই রকম সব পরিকল্পনা শুধু রাজনৈতিক ফায়দা ওঠাবার জন্য গৃহীত হয়। তা থেকে মুনাফা লোটে কিছু বড় বড় ঠিকাদার আর তাদের অনুগ্রহে কিছু অসাধু রাজনীতিবিদ ও আমলা। এর সঙ্গে সাধারণ মানুষের আর্থসামাজিক উন্নতির কোনও সম্বন্ধ নেই।
- তাই এই ধরনের বড়-বাঁধ-প্রকল্প আমেরিকায় এবং শেষ দিকে প্রাক্তন রাশিয়াতেও সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত হয়েছে। তবে তৃতীয় বিশ্বের দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য এই জাতীয় প্রকল্পে মোটা টাকা ধার দিতে ধনী দেশগুলির আপত্তি নেই। নেহাৎ মহাজনী কারবার!
- বিশ্ব ব্যাঙ্ক পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তদন্ত ও বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, সারা পৃথিবীর জলাধারের জলধারণের ক্ষমতা প্রতি বৎসর এক শতাংশ করে কমে যাচ্ছে। সারা পৃথিবীতে এভাবে বড় বড় জলাধারের পরিমাণ প্রতি বছর 50 ঘন কিলোমিটার কমে যাচ্ছে। [যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ডীন অব ফ্যাকালটি অব এঞ্জিনিয়ারিং, ডঃ এন সোম তাঁর বক্তৃতায় বলেছিলেন, "It is estimated that 70% of the Hirakud Reservoir will be lost in the next 70 years by siltation. Siltation also causes reduction of canal depth which leads to widespread flooding in the monsoon" — অর্থাৎ "হিরাকুদ বাঁধের জলধারণ ক্ষমতা পলি পড়ার দরুন আগামী সত্তর বছরে সত্তর শতাংশ কমে যাবে।... পলি পড়ে খালের জলও বর্ষায় দুপাশের বাঁধ ভেঙে বন্যায় দেশকে ভাসাবে।"]
- পৃথিবীর সর্ববৃহৎ বাঁধগুলির অন্যতম 'তারবেলা' জলাধার আগামী বিশ বছরের ভিতর সম্পূর্ণ অকেজো হয়ে যাবে।

একইভাবে ডঃ রেমন্ড স্যান্ডলার তাঁর গ্রন্থে (Myths of T.V.A.) আশির দশকের শেষাশেষি লিখেছেন, টেনেসি ভ্যালি অ্যাসোসিয়েশান কিছু প্রাথমিক সাফল্য লাভ করলেও এতদিনে তার সুদূরপ্রসারী কুফলগুলি ধীরে ধীরে প্রকট হয়ে উঠ্ছে। তাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আর একটিও বড় জলবিদ্যুৎ পরিকল্পনা করছে না। চীনের পীত নদের উপর সানমেক্সিয়া (Sanmexia) জলাধারও পলি জমে যাওয়ায় প্রায় অকেজো হয়ে গেছে। সোভিয়েত ইউনিয়নে স্তালিনের আমলে গড়া ভোলগা-প্রকল্পের পরিণামে ঐ অঞ্চলের সমূহ ক্ষতি হয়েছে। সবচেয়ে করুণ অবস্থা আফ্রিকার ঘানা রাজ্যের। 1966 সালে ভোল্টা নদীর উপর একটি বাঁধ (Akosombo) তৈরি করায় গোটা রাজ্যের আট শতাংশ জমি জলমগ্ন হয়েছিল আর পৌনে এক লক্ষ লোক বাস্তুচ্যুত হয়েছিল, যার একটা বিরাট অংশ এখনো বাস্তুহারা পরিচয়ে তাঁবুতে বাস করে। লক্ষণীয়, ষাটের দশকে

পশ্চিম আফ্রিকায় ঘানা ছিল সব চেয়ে ধনী দেশ, আর আজ সেই দেশ সবচেয়ে গরিব!

ভারতেও ডি. ভি. সি. দামোদরে বন্যা ঠেকাতে পারেনি। পঞ্চাশের দশকের শেষাশেষি পাঞ্চেৎ বাঁধ নির্মিত হয়েছিল। জওয়াহরলাল নাটকীয়ভাবে একটি আদিবাসী মহিলাকে দিয়ে প্রকল্পের বোতাম টেপার আয়োজন করেছিলেন। জওয়াহরলাল স্বর্গে গেছেন। লাখ্ লাখ্ বরিষ তাঁর বেহেস্ত-বাস মঞ্জুর হোক। কিন্তু ঐ পাঞ্চেৎ বাঁধে দুইশত গ্রামের যত মানুষ গৃহহীন হয় তাদের অনেকেই আজও পর্যন্ত স্থায়ী আবাস পায়নি। সমীক্ষায় জানা যায় কেউ পেয়েছে জমি, বাড়ি বানাতে পারেনি ; কেউ পেয়েছে বাড়ি, জমি পায়নি। কেউ জমি-বাড়ি দুই পেয়েছে — কিন্তু সে জমিতে চাষ হয় না!

* * *

মোট কথা 'নর্মদা-প্রকল্প' পরিকল্পনার আগেই বোঝা গিয়েছিল যে, এতে সাধারণ মানুষের স্থায়ী উপকার কিছু হবে না। স্বাধীনতার পর প্রথম ত্রিশ বছরে ভারতে সর্বমোট প্রায় বিশ হাজার কোটি (যে অর্থ শুধুমাত্র নর্মদা প্রকল্পে এখন বিনিয়োগ করার কথা) টাকা খরচ করা হয়েছিল 568 লক্ষ একর জমিতে জলসেচের সুবিধা হবে বলে। এর ফলে প্রতি একরে ফলন বৃদ্ধি পাবে 132 টন — অর্থাৎ পরিকল্পনাকারেরা তাই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। বাস্তবে বৃদ্ধি হয়েছিল মাত্র 42 টন/একর। অর্থাৎ প্রত্যাশার এক-তৃতীয়াংশ! এ তথ্যটা দাখিল করছি স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা থেকে। ছিয়াশি সালের জুলাই মাসে তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রীদের সম্মেলনে ভাষণ দেবার সময় একথা বলেছিলেন রাজীব গান্ধী। তাই তিনি বলেছিলেন, এ জাতীয় বৃহৎ-বাঁধ-প্রকল্পের কোন পরিকল্পনা যেন কোন রাজ্যে না-করা হয়।

কিন্তু চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী। গুজরাট, রাজস্থান ও মধ্যপ্রদেশের তিন মুখ্যমন্ত্রী মিলিত সিদ্ধান্ত নিলেন — নর্মদাকে শৃঙ্খলায়িত করতে হবে।

খরচ : বিশ হাজার কোটি টাকা।

দেশের জ্ঞানীগুণী-বিজ্ঞানীরা আবেদন-নিবেদন করলেন। কেউ কর্ণপাত করল না। প্রস্তাবিত খাস জমির দুধারে গুজরাটে গড়ে উঠতে থাকে বড় বড় চিনির কারখানা। গম চাষে প্রতি একরে যত জল লাগে ইক্ষু চাষে লাগে তার দশ গুণ। বড় বড় শিল্পপতিদের বেশি মুনাফার লোভে এই প্রকল্প গ্রহণ করেছিল গুজরাট সরকার। গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী ঐ অঞ্চলে বিভিন্ন শিল্পে (যেমন রাসায়নিক শিল্প, পেট্রোকেমিক্যাল, চিনি কারখানা শক্তি ইত্যাদিতে) 32,000 কোটি টাকা বিনিয়োগের কথা ঘোষণা করেছেন — যেজন্য প্রয়োজন ত্রিশ-লক্ষ একর-ফুট পরিমাণ নর্মদার জল। সোজা কথায় নর্মদা প্রকল্প শুধু শিল্পপতিদের জন্য। দশ লক্ষ আদিবাসী বাস্তুচ্যুত হল কি না কে দেখছে!

মেধা পটকর আন্দোলনে নামলেন। কেউ ভ্রূক্ষেপ করল না। তবে তিন সরিকের

মধ্যে 'লঙ্কাভাগ' নিয়ে একটি বিরোধ বেধে ওঠায় গঠিত হল একটি ট্রাইবুনাল — 1979 সালে ট্রাইবুনাল বিরোধ-নিষ্পত্তি করে রায় দেন এবং প্রসঙ্গত বলেন যে, জলমগ্ন হবার সম্ভাব্য তারিখের ছয়মাস পূর্বে গ্রামবাসীদের গ্রাম ত্যাগের নোটিস দিতে হবে। এছাড়া জলমগ্ন হবার একবছর আগেই বাস্তুচ্যুতদের পুনর্বাসন দিতে হবে। বলা বাহুল্য কোনটাই করার চেষ্টা হয়নি। **রাজনৈতিক কারণে এই ট্রাইবুনালের রিপোর্টটি গোপন তথ্য হিসাবে রাখা ছিল। তাতে কী বলা হয়েছে তা কাউকে জানানো হয়নি।**

'93 সালের দশই জুন 'মনিবেলি'তে বাঁধ-বিরোধী গ্রামবাসীরা সমবেত হল। তারা স্বেচ্ছায় নর্মদায় ঝাঁপিয়ে পড়ে সলিল সমাধি-গ্রহণ করতে প্রস্তুত। মেধা পটকর উপস্থিত হয়ে সলিল-সমাধি গ্রহণের পরিবর্তে অনশনে প্রাণত্যাগের প্রস্তাব দেন। এটা আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায় — 10.6.93 তারিখ থেকে। দু-সপ্তাহের মধ্যেই মনিবেলি গ্রামটি পুলিশে ঘিরে ফেলে। বহিরাগত বা সাংবাদিকদের প্রবেশ নিষিদ্ধ হয়। বারোজন জোর করে ঢুকতে গিয়ে আটক হন — তাদের মধ্যে ছিলেন কিছু প্রেসের লোক এবং কয়েকজন মহিলা। পুলিশী নির্যাতন শুরু হয়ে যায়। বিশেষ করে গ্রামের মেয়েদের উপর। মেধা পটকর তেশরা থেকে সতেরই জুন অনশন করেন। সরকার এবং প্রকল্পের কর্ণধারেরা মেধা পটকরের উত্থাপিত প্রশ্নগুলি পুনর্বিবেচনা করে দেখবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পর মেধা অনশন ভঙ্গ করেন।

অনশন ভঙ্গ করা মাত্র গুজরাত-মুখ্যমন্ত্রীর অন্য মূর্তি। বাঁধের উচ্চতা কমিয়ে আনার যে প্রস্তাব মেধা এবং বিশেষজ্ঞরা দিয়েছিলেন [বাঁধ-উচ্চতা যদি 455′ থেকে 400′ ফুটে কমিয়ে আনা যায় তাহলে ঐ এলাকার 90% লোককে বাস্তুচ্যুত হতে হয় না। এবং 80% আবাদী জমি রক্ষা পায়। এ বিষয়ে দ্য স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকার 13.6.93 তারিখে শ্রী পি. কে. অধিকারীর প্রবন্ধ : Water & Blood দ্রষ্টব্য। শ্রী অধিকারী একজন বিশেষজ্ঞ — সেন্ট্রাল ডিপার্টমেন্ট অব সায়েন্স অ্যান্ড টেক্‌নলজির বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা।] গুজরাত তা প্রত্যাখ্যান করল। ফর্মান জারী করল : বাঁধ-উচ্চতা 455′ ফুটই করা হবে।

এই সময় (22.7.93) দিল্লীর রাজঘাটে গান্ধী সমাধিতে গিয়ে ধর্না দেন বাবা আম্‌তে। বলেন, সর্দার সরোবর প্রকল্প পুনর্বিবেচিত না হলে নর্মদা বাঁধ-বিরোধী সত্যাগ্রহীরা ছয়ই আগস্ট থেকে এক-একজন করে নর্মদার জলে আত্মসমর্পণ করবে। স্বাধীনতা দিবসে দশম শহীদ! বস্তুত আবার মেধা পটকর তাঁর দলবল নিয়ে নর্মদা তীরে সমবেত হলেন। শেষ দিন, অর্থাৎ পাঁচই আগস্ট, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্বয়ং বিদ্যাচরণ শুক্লা হস্তক্ষেপ করে ঐ আত্মঘাতীদের নিবৃত করেন। প্রতিশ্রুতি দেন : পুনর্বিবেচনা হবে। বাঁধের উচ্চতাও কমিয়ে আনা হবে।। ইতিমধ্যে বাঁধ-বিরোধী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ

সরাসরি বিশ্ব-ব্যাঙ্কের দ্বারস্থ হন। জানতে চান : আপনারা কেন এই দেশবাসীর ক্ষতি করতে বিশ হাজার কোটি টাকার ঋণ দিচ্ছেন? ঋণ মঞ্জুর করার আগে আপনাদের নিজস্ব একটি বিশেষজ্ঞ দলকে দিয়ে পরীক্ষা করে দেখুন : কে ঠিক বলছে! আমরা, না ঐ তিন মুখ্যমন্ত্রীর নিয়োজিত বৈজ্ঞানিকেরা।

বিশ্ব-ব্যাঙ্কের যিনি সর্বময় কর্তা তিনি বোধকরি আনন্দবাজারে প্রকাশিত মাননীয় কলিমুদ্দিন সাহেবের বঙ্গভাষায় প্রদত্ত বাণীটা পাঠ করেননি যে, রাজনীতি যাঁরা করেন তাঁরা নীতিভ্রষ্ট হতেই পারেন না। হয়তো তিনি টি. এন. শেষনের কেতাবের (A Heart Full of Burden, p. 95) ঐ বক্তৃতাটা পড়েছিলেন "Rishvateva Jayati" (সত্য নয়, ঘুষ সর্বত্র জয়যুক্ত হয়) ঠিক জানি না, হয়তো তিনি হিসাব কষে দেখেছিলেন যে, অন্তত শতকরা দশ যদি ঘুষ হিসাবে পকেটস্থ করা যায়, তাহলে নিদেন দু-হাজার রাজনীতিবিদ্-তথা-আমলা কোটিপতি হতে পারে! তাই তিনি একটি কানাডীয় এক্সপার্ট কমিটিকে নিরপেক্ষ বিচার করে এ বিষয়ে রিপোর্ট দিতে বলেন। কানাডার বিশেষজ্ঞ দলের প্রধান ব্র্যাডফোর্ড মর্স দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বিশ্ব-ব্যাঙ্ককে এ প্রকল্প থেকে হাত গুটিয়ে নিতে পরামর্শ দিলেন। এবং বিশ্ব-ব্যাঙ্ক তাই করল।

তিন মুখ্যমন্ত্রী তাতেও দমলেন না। বিশ্ব-ব্যাঙ্ক না দেয় তো কী হল? টাকা খাটানোর মহাজনের কি অভাব আছে নাকি? কাজ চলতে থাকে পুরোদমে। লাগে টাকা দেবে 'গোরে শ্যেন'! শুধবে ভবিষ্যৎ! শুরু হল শ্রীমতী মেধা পটকরের তৃতীয় ও এ যাবৎ শেষ আন্দোলন। তিন-তিনজন গোলিয়াথের একত্র আক্রমণের বিরুদ্ধে একা মহিলা ডেভিড। আপাতদৃষ্টিতে একা — বাস্তবে সারা পৃথিবী তাঁর সঙ্গে আছে!

মধ্যপ্রদেশের রাজধানী ভূপালে ওঁরা তিনজন শুরু করলেন আমরণ অনশন : শ্রীমতী কমলা যাদব, শ্রী সীতারাম পতিদার আর মেধা পটকর। একুশে নভেম্বর থেকে। ধীরে ধীরে সারা ভারতের দৃষ্টি ঘনীভূত হল ভূপালে।

2.12.94 : ...অনশনের দ্বাদশ দিবসে ভূপাল দুর্ঘটনার প্রতিকার-সন্ধানী ইউনিয়ান কার্বাইডের কর্মীরা বিরাট শোভাযাত্রা করে এসে মেধাকে সম্বর্ধনা দিল। শহরের সব পথঘাট বন্ধ হয়ে গেল। বিধানসভা তখন চালু। অনেকে বিধানসভায় যেতেই পারলেন না। পুলিশ কিন্তু নীরব। নর্মদা বাঁচাও আন্দোলনের নেতারা বললেন, আসন্ন নর্মদা প্রকল্পে ভূপাল দুর্ঘটনার পুনরভিনয় হতে চলেছে। মেধা বক্তৃতা দিতে উঠেছিলেন; কিন্তু শারীরিক দুর্বলতায় বসে পড়েন।

4.12.94 : গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী ছবিলদাস মেহ্‌তা সাংবাদিকদের বললেন, 'মেধা পটকর দেশের প্রকল্প বানচাল করতে বিদেশীদের কাছে ভিক্ষার-ঝুলি বাড়িয়ে দিয়েছেন।' "Let her (Medha Patkar) file a defamation case against

me in the court, I will prove that she is being funded for running destructive activities in the country." সাংবাদিকরা এ বিষয়ে মেধা পটকরকে প্রশ্ন করলে তিনি শারীরিক দুর্বলতাজনিত কারণে জবাব দিতে পারেননি।

5.12.94 : বিধায়কদের একটি দলের সঙ্গে ভূপাল হাসপাতালের বড় ডাক্তার এসে মেধাকে পরীক্ষা করে মতামত দিলেন ওঁকে অবিলম্বে হাসপাতালের ইন্‌টেনসিভ ওয়ার্ডে স্থানান্তরিত না করা হলে ওঁকে বাঁচানো যাবে না। মেধা অস্বীকার করলেন।

7.12.94 : অনশনের সপ্তদশ দিবস। ডাক্তারবাবুরা ওজন হ্রাসের বৃদ্ধি, রক্তচাপের হ্রাস ও ইউরিন-স্যাম্পেলে অ্যাসিটনের পরিমাণ দেখে অনিবার্য জীবনাশঙ্কার কথা জানালেন। মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মেধা পটকরকে জানালেন যে, তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে জে. এন. পাটিল কমিটির রিভিউ রিপোর্ট চেয়ে পাঠিয়েছেন। সেটা না দেখে মুখ্যমন্ত্রী কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারছেন না। এ বিষয়ে সাংবাদিকরা মেধাকে প্রশ্ন করলে তিনি ক্ষীণকণ্ঠে বললেন, "মিস্টার পাটিল গত বছর মে মাসে তাঁর রিপোর্ট ইউনিয়ান ওয়াটার রিসোর্স মন্ত্রকে জমা দিয়েছেন। এই একবছর সাত মাসের ভিতর মুখ্যমন্ত্রী মশাই সেটা চাইতে পারেননি? কী করছিলেন এতদিন?"

8.12.94 : সুইডেনের রাজা কিং কার্ল XVII গুস্তফ ভারত সরকারকে মেধার প্রাণ রক্ষার্থে তৎপর হতে বলেন। স্মর্তব্য : মেধা পটকরকে সুইডীশ নোব্‌ল আকাদেমী বিরানব্বই সালেই 'নোবেল পুরস্কারের বিকল্প পুরস্কারে' ভূষিতা করেছেন।

9.12.94 : মেধার মুহুর্মুহু বমন হচ্ছে। তাঁর যকৃত ধীরে ধীরে অকেজো হয়ে যেতে বসেছে। মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং দিল্লী চলে গেলেন ঐ পাটিল-কমিটির রিপোর্ট সংগ্রহ করতে।

10.12.94 : অ্যাম্বুলেন্সে করে পুলিশ মেধাকে হাসপাতালে নিয়ে এল। হ্যাঁ, বলপূর্বক। পুলিশ আন্দোলনকারীদের বাধা মানল না, প্রায় দেড়শ জনকে গ্রেপ্তার করা হল বাধা দেওয়ায়।

11.12.94 : মেধা মৌখিকভাবে কোন ঔষধ গ্রহণে অস্বীকৃত। ইন্‌জেকশনের মাধ্যমে তাঁকে খাওয়ানো হচ্ছে। চিকিৎসকদের মতে এভাবে দু-এক সপ্তাহ চলতে পারে মাত্র। দিল্লীর যন্তর-মন্তরে একদল আন্দোলনকারী নতুন করে অনশন শুরু করলেন : মেধা পটকরের "গ্রেপ্তারের" প্রতিবাদে। রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী ভেরোঁ সিং শেখাওয়াৎ গুজরাত মুখ্যমন্ত্রীকে জানালেন, তিনি মেধা পটকরের সংশোধনী প্রস্তাব গ্রহণে স্বীকৃত।

13.12.94 : বি. জে. পি. সরকারের নিজস্ব বিধায়ক বাদে সব দলের সদস্য বিধানসভা ত্যাগ করে চলে যান। জনতা দল, বহুজনসমাজ, সি. পি. এম. প্রভৃতি সব দল একত্রে মধ্যপ্রদেশ সরকারকে তীব্র আক্রমণ করে।

15.12.94 : দিল্লী থেকে ফিরে মুখ্যমন্ত্রী সন্ধ্যাবেলা টি. ভি.-তে ঘোষণা করলেন

পরদিন তিনি বিধানসভায় একটি স্টেটমেন্ট দেবেন। সব দলের বিধায়করা নিশ্চয় তাতে সন্তুষ্ট হবেন এবং মেধা পটকরও তাঁর অনশন ভঙ্গ করবেন। এ বিষয়ে মেধাকে সাংবাদিকেরা প্রশ্ন করলে তিনি একটি মারাঠী প্রবচন শুনিয়ে দেন, যার বঙ্গানুবাদ হতে পারে : 'না-আঁচালে বিশ্বাস নেই।' অথবা 'এ যে ভূতের মুখে রামনাম!'

16.12.94 : মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করলেন : প্ল্যানিং বোর্ডের মেম্বার মিস্টার জয়ন্ত পাতিলের সুপারিশক্রমে বাঁধের উচ্চতা ওঁরা 455′ ফুট থেকে কমিয়ে 436′ ফুটে নামিয়ে আনতে স্বীকৃত। তাছাড়া বাস্তুচ্যুতরা সকলে পুনর্বাসিত না হলে বাঁধের জল ছেড়ে গ্রামগুলিকে জলমগ্ন করা হবে না।

এই দিন সন্ধ্যায় আন্দোলনের নেত্রী অতঃপর তাঁর অনশন ভঙ্গ করতে স্বীকৃতা হন। মুখ্যমন্ত্রী দিগ্বিজয় সিংহ তাঁর দিকে এক গ্লাস গ্লুকোজ মেশানো দুধ বাড়িয়ে ধরলে মেধা বলেন, "প্লীজ, ওর হাতে দিন।"

পাশের শয্যাতেই শুয়েছিলেন ওঁর আদিবাসী মৃত্যুসহযাত্রিণী। সেও অনশন করছে সাতাশ দিন ধরে। তার হাত থেকে মেধা দুধটা খেলেন। সেও খেল মেধার হাত থেকে নিয়ে।

17.12.94 : (1) Mr. Digvijay Singh, CM, also said that if oustees living below the 80.03-meter level were not rehabilitated by December 31, the State Govt. would ask for immediate halt to further construction at the Sardar Sarovar Dam site." [মুখ্যমন্ত্রী দিগ্বিজয় সিং সংসদে আরও প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, বাঁধের উচ্চতা 80.03 মিটার হলে যারা বাস্তুচ্যুত হবে তাদের সবাইকে 31.12 তারিখের মধ্যে বিকল্প জমি-বাড়ি দেওয়া হবে। না পারলে সর্দার সরোবর কাজ বন্ধ রাখা হবে।]

(2) Another significant byproduct of the Anndolan's agitation was publication of the review report, headed by the Planning Commission Member, Mr. J. Patil. The report states that while Gujarat was pressing ahead with the Project in the name of providing water to the parched regions of Saurashtra & Kutch, it was really allowing numerous industries with an estimated investment of Rs 60,000 crore to come up along the "golden corridor" declared by it along the main canal. [আন্দোলনকারীদের আরও একটি সফলতা উল্লেখযোগ্য। প্ল্যানিং কমিশনের সভ্য জে. পাতিলের যে রিপোর্টটি এতদিন সরকারী নির্দেশে অপ্রকাশিত ছিল তা প্রকাশিত হল। তাতে বলা হয়েছে : সৌরাষ্ট্র ও গুজরাটের খরাপীড়িত অঞ্চলের তৃষিত মানুষদের পানীয় বা সেচের জল সরবরাহ করার উদ্দেশ্যে নয় — গুজরাত ঐ খালের ধার বরাবর ষাট-হাজার কোটি টাকার ফ্যাকটারি বানাতে চায় — সে জন্যই এ প্রকল্প রূপায়িত হচ্ছে।]

বর্তমান শতাব্দীতে অহিংস সত্যাগ্রহীর এ জাতীয় সাফল্যের কথা অল্পই লিখে রেখেছে ইতিহাস।

মেধা পটকর কোনও রাজনৈতিক দলের নেতা নন। বিধায়ক, সাংসদ বা মন্ত্রী হবার প্রত্যাশায় তিনি ভেল্কি দেখিয়ে জনগণের মন জয় করতে চাননি। নির্বাচনে তিনি কখনো দাঁড়াননি, দাঁড়াবেন না। তাঁর অভিধানে 'দেশসেবা'র যে অর্থ তা ঐসব হোলটাইম রাজনীতি-ব্যবসায়ীরা কল্পনাও করতে পারেন না। তিনি আপনার-আমার মতো নিতান্ত সাধারণ মানুষ। তবু তিনি অসাধারণ, কারণ 'দেশসেবা' করতে গিয়ে মাত্র আটত্রিশ বছর বয়সে তাঁর মাথার সব চুল পেকে গেছে ; বার বার অনশন করে তাঁর স্বাস্থ্যও ভেঙে গেছে। তিনি আমার মতো প্রবীণ সাহিত্যিকের দৃষ্টিতে কন্যাপ্রতিম স্নেহধন্যা এবং প্রণম্যা!

* * *

হয়তো আপাত-অপ্রাসঙ্গিক মনে হবে আপনাদের, তবু বিষয়ান্তরে যাবার আগে বুধনি মেঝানের কাহিনীটা এখানে বলে নিতে চাই। নর্মদা বাঁধের প্রসঙ্গে তিন-চার দশক পূর্বে নির্মিত পাঞ্চেৎ বাঁধের কথা। মেধা পটকরের নির্যাতন প্রসঙ্গ থেকে বুধনি মেঝানের নির্যাতনের কথা। যেকথা পণ্ডিত নেহেরুও জানতেন না, এবং হয়তো জানেন না সংলগ্ন কার্টুনের অসামান্য ব্যঙ্গ-চিত্রশিল্পী চণ্ডী লাহিড়ীও।

পঞ্চাশের দশকের শেষাশেষি শেষ হল পাঞ্চেৎ বাঁধ। ডি. ভি. সি.র বড়-কর্তারা তা-বড় তা-বড় কংগ্রেসী রাজনীতিবিদদের কাছে দহরম মহরম করে ব্যবস্থাটা পাকা করে ফেললেন। পণ্ডিত নেহেরু রাজি হলেন স্বয়ং পাঞ্চেৎ বাঁধের উদ্বোধনে।

বাঁধের নিচে একটা গোল কংক্রিটের মঞ্চ বানানো হয়েছে। দেবদারু পাতা, নিশান আর ফেস্টুন। ছোট ছোট জাতীয় পতাকা! কী সুন্দর লাগছে দেখতে! বুধনি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল। বুধনি মেঝান, এখোড়বোনা গাঁয়ের স্বামীত্যক্তা শিয়ারি মেঝানের যুবতী কন্যা। ষোলোটি বসন্তের আশীর্বাদে তখন বুধনির চোখ বিন্‌কাজলেই কালো। মায়ের হাত ধরে দেড় দু মাইল পথ হেঁটে সে পাঞ্চেৎ-বাঁধে মজুরি খাটতে আসত। একা নয় — আসত গাঁয়ের আরও দু দশটা মেয়ে-পুরুষ। আর আসত ঝামরু সর্দার। ওদেরই গাঁয়ের — বিশ বাইশ বছরের নওজোয়ান। ঐ বয়সেই সর্দার! কষ্টিপাথরে খোদাই করা যেন।

মা ডাকল, আয়রে বুধনি, আঁধার হই যাবেক। ঘরকে চল। কাইল আস্যে দেখপি!

বুধন মায়ের পিছু পিছু রওনা দিচ্ছিল। পিছন থেকে আচমকা ঝামরু ডেকে ওঠে: এ-বুধন! রুখ্ যা! শুন্!

মা-মেয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। দেখে, ঝামরু একা নয়, তার সঙ্গে এঞ্জিনিয়ার

সাহেবও আছেন। মা-মেয়ে নত হয়ে সেলাম করে, প্রতিবর্তী-প্রেরণায়। ঝামরু সাহেবকে বলে, ইয়ার কুথাই বইল্‌ছিলাম আইজ্ঞা, শিয়ারি মেঝানের বিটি বটেক। উ পারবেক। বড়া তেজী মাইয়া। বইল্যে দেখেন কেনে।

এঞ্জিনিয়ার-সাহেব বুধনকে একবার আপাদমস্তক দেখে নিলেন। তার নিকষ-কালো তনু দেহখানি। ডম্বরুর মতো মধ্যক্ষামা। উপরে-নিচে যৌবনের তরঙ্গভঙ্গ। বুধনি পুরুষের এ দৃষ্টিতে অভ্যস্ত — লজ্জা পেল না। এঞ্জিনিয়ার-সাহেব বললেন, হ্যাঁ, এ পারবে মনে হচ্ছে। শোন রে বুধন! কাল রাজাবাবু আসবেক। তু ডায়াসের উপর থাক্‌বি। রাজাবাবু মঞ্চে উঠে এলেই তাঁর হাতে একটা ফুলের তোড়া তুলে দিবি। পারবি না?

শিউরে উঠেছিল মেয়েটি : ই বাবা গ! মুই লারবেক।

এঞ্জিনিয়ার-সাহেব অট্টহাস্য করে উঠেছিলেন সে কথায়।

মোট কথা তাকে রাজি হতে হল।

গাঁয়ে ফিরে এসে শিয়ারি তার মেয়েকে ঐ প্রশ্নটাই বেমক্কা জিজ্ঞেস করে বসল, যেটা ক্রমাগত জানতে চেয়েছে ওর জিজ্ঞাসু মন তার যুক্তিবাদী মনের কাছে : এতেক মেঝেন থাক্‌তি তুরে ক্যান বুললেক?

জানে না। বুধন সত্যিই জানে না। এ প্রশ্নের জবাব আন্দাজে করতে পারে, মুখ ফুটে তা তো বলা যায় না। সঙ্কোচে, সরমে। হতে পারে এটা ঝামরুর সুপারিশেই। অথবা ... হ্যাঁ, তার যৌবনপুষ্ট তনুদেহের দিকে তাকিয়ে এঞ্জিনিয়ার-সাহেবকে সে অনেকবার আনমনে সিগ্রেট টানতে দেখেছে। তাই হয়তো এটা অতনুর আশীর্বাদে ওর তনু-ভঙ্গিমার জন্যই। কিন্তু এটা কী হতে চলেছে! হাজার-হাজার মেয়েমদ্দ জমিন সই-সই, আর বুধনি মেঝান মঞ্চের উপর! সবার চোখের সামনে সে রাজাবাবুর হাতে তুলে দেবে একটা প্রকাণ্ড ফুলের তোড়া। আচ্ছা, তখন ফটোক-যন্তরে ঝিলিক মারবে? সিবার যেমন চোখ ধাঁধানো ঝিলিক্ মারিছিল? যখন পাঞ্চেৎ বাঁধের কাজ পেরথম্ শুরু হয়?

পরদিন ভুল্‌কো তারা ডোবার আগেই বুধনি ক্ষার দিয়ে তার একমাত্র ভাল শাড়িখানা কেচেছে। মহুয়া ডালে একপ্রান্ত বেঁধে হাওয়ায় নেড়ে নেড়ে শুকিয়ে নিয়েছে। সাজিমাটি দিয়ে গা রগড়ে স্নান করেছে। মেয়ের রকম সকম দেখে মা অবাক মেনেছে। মেয়ে কি আসনাই করছে নাকি? কার সঙ্গে? ঝামরু? নাকি ঐ শাদা-চামড়া ইন্‌জিসাব? বুধন 'খেয়া' পড়েনি। তাই তার মাকে বুঝিয়ে বলতে পারেনি :

"ওগো মা,
রাজার দুলাল যাবে আজি মোর
ঘরের সমুখপথে,
আজি এ প্রভাতে গৃহকাজ লয়ে

রহিব বলো কী মতে।
বলে দে আমায় কী করিব সাজ,
কী ছাঁদে কবরী বেঁধে লব আজ,
পরিব অঙ্গে কেমন ভঙ্গে
কোন্ বরনের বাস।
মাগো, কী হল তোমার, অবাক নয়নে
মুখপানে কেন চাস।"

* * *

রাজা-মশায়ের গাড়ি আসার সময় হয়ে এল। সবাই ব্যস্ত। ছুটোছুটি করছে। বুধন মেঝানকে ওরা ডেকে নিয়ে গেল মঞ্চের উপর। বড়-সাহেব ওকে কী যেন বললেন। কোলাহলে কিছু শোনা গেল না। হঠাৎ জনারণ্যে জাগল চাঞ্চল্য। দূর থেকে ভেসে এসেছে পাইলট-কারের সাইরেনের শীৎকার। হঠ যাও, হঠ যাও, তফাৎ যাও। যেন 'বরাত' আসছে সিঙে ফুঁকতে ফুঁকতে। বুধনের বুকের মধ্যে গুড়গুড় করে উঠল।

এসে হাজির হল গাড়ির পর গাড়ি। ঐ তো রাজা-মশাই! শাদা একটা শেরওয়ানি, শাদা চুস্ত, মাথায় শাদা গাঁধি টুপি। আর বুক পকেটে একটা রক্ত গোলাপ। গট্‌গট্ করে রাজা-মশাই কংক্রিটের ধাপ বেয়ে উঠে এলেন মঞ্চের উপরে। পিছন পিছন আরও অনেকে। ঠিক তখনই এঞ্জিনিয়ার-সাহেব ঝুঁকে পড়ে বুধনের লাজে-রাঙা কর্ণমূলে ফিস্ ফিস্ করে বললেন, লে রে বুধন। ই মালাটো ধর কেনে। রাজা-সাহেবের গলায় পরায়ে দে!

মালা! সে কী! মালার কথা তো ছিল না! কাল তো কথা হয়েছিল ফুলের তোড়া! বুধন বলতে গেল সে-কথা। কিন্তু তার আগেই — কোথাও কিছু নেই — রাজামশাই, তামাম মুলুকের রাজামশাই, তাঁর শাদা 'মুটুক'পরা চিরউন্নত মাথাটি নত করে দিয়েছেন এখোড়বোনা গাঁয়ের নগণ্য মেঝান বুধনির সামনে। তিনি বুঝতে পেরেছেন : মালাটা তাঁরই জন্য।

বুধন ডানে-বাঁয়ে তাকাবার অবকাশ পেল না। কে যেন পাশ থেকে ওর হাতে ধরিয়ে দিয়েছে গোলাপ-গ্ল্যাডিওলাস আর চন্দ্রমল্লিকায় গাঁথা প্রকাণ্ড একটা মালা। কে যেন পাশ থেকে বললে, দে দে! পরায়ে দে, ডেরি করিস না!

থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে বুধন ঐ মালাটা পরিয়ে দিল ভারতের প্রধানমন্ত্রীর গলায়। ঝিলিক্ ঝিলিক্ করে ফটোক-যন্তরে চোখ-ধাঁধানো আলো। জমিন-সইসই হাজার মেঝান-কামিন উলুধ্বনি দিয়ে উঠল। পাঞ্চেৎ মাইয়া ইস্কুলের পড়ুয়া আর দিদিমণিরা সার দিয়ে ডাঁড়ায়ে ছিল — এক সাথে তারা বাজায়ে দিলেক : শঙ্খ!

কিন্তু এ কী! একী ! এ কী করছেন আপ্‌নে!!

রাজামশাই শহরগঞ্জে সচরাচর যা করে থাকেন, তাই করলেন। যে মেয়েটি ওঁর গলায় মালা দিয়েছে তার গলাতেই আবার পরিয়ে দিলেন সেই ফুলের মালাখানি।

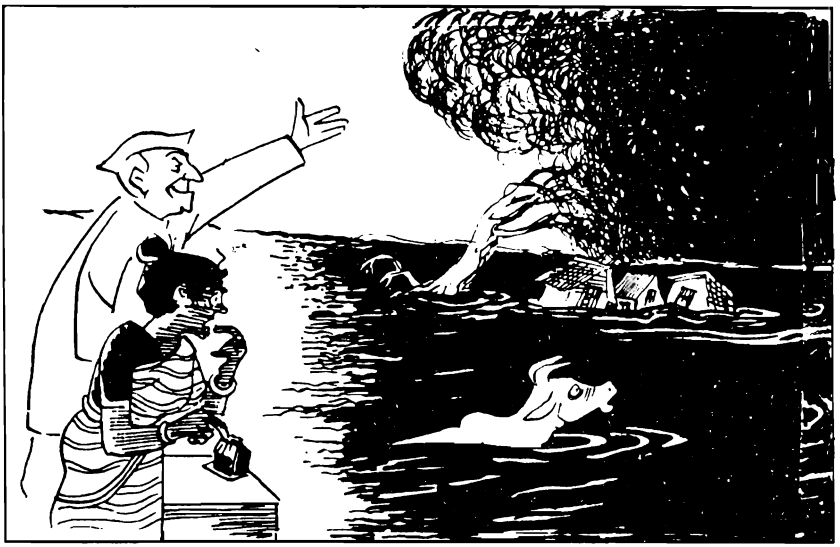

শুধু উলুধ্বনি আর শঙ্খনির্ঘোষই নয়, মালা বদলও হয়ে গেল!

*　　*　　*

তারপর? তারপর কী যেন হয়েছিল? না, মনে পড়ে না। পাঞ্চেৎ-বাঁধের দিকে উদাসদৃষ্টি মেলে বসে থাকা পঞ্চাশোর্ধ্বা বুধনির। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন : সব ভুল হই গেলো। তু ঘর যা কেনে বাবু! মোর মনে নাই!

বুধনির দোষ নেই। ইতিমধ্যে ত্রিশ-পঁয়ত্রিশটা বছর কেটে গেছে যে। সেই সমাজত্যক্তা অন্তেবাসীর কথা জানতে এসেছেন এক শহুরে সাংবাদিক। বরাকরের রূপক সাহা! জানতে এসেছেন : জওয়াহরলালজী না হয় জানতেন না, কিন্তু ষোলো বছরের যুবতী মেয়েও কি জানত না আদিবাসী সমাজের প্রথা? তাহলে? কেন তিনি সর্বসমক্ষে রাজামশায়ের সঙ্গে মালা বদলে স্বীকৃতা হয়েছিলেন?

বুধন জানেন না। সত্যিই জানেন না। কেন অমন দুর্মতি হয়েছিল তাঁর! আব্‌ছা আব্‌ছা মনে পড়ে :

আদিবাসী-সমাজের প্রধানরা ষোলো আনার ডাক দিয়েছিল। 'ব্যভিচারী' মেয়েটির শাস্তি বিধান করতে। স্বামীত্যক্তা শিয়ারি মেঝান আর তার 'স্বৈরিণী' ষোড়শী আত্মজা! ষোলো আনা একমত হয়ে বিধান দিল : সাঁওতাল সমাজে বুধনির ঠাঁই হবেক নাই।

কোন আদিবাসী তাকে 'বিহা' করবে না, তার সাথে ঘর বাঁধবেক নাই!

: উর বিহা তো হই গেল রাজাবাবুর সাথে! সবাই জোকার দিলেক। শাঁখ বাজাইলেক! সবার সুমুখে উরা মালাবদল করলেক! কী? বল্ কেনে শিয়ারি? ই সব কি মিছা কথা বটেক? তু দেখিস নাই?

বুধন সেই রাত্রেই গৃহত্যাগ করে। জন্মদুখিনী মাকে বাঁচাতে! তা সমাজের কাছে শিয়ারি ক্ষমা পেয়েছিল। মারাঙবোঙার ঠাঁয়ে পাঁঠা বলি দিয়ে।

আর বুধন? দুঃসাহসিনী মেয়েটি একাই গিয়ে আশ্রয় নিল একটা কলিয়ারির বস্তিতে। খাদানে কাজ করত! সেখানেই পরে ভালবেসে একটি বাঙালি বাবুকে 'বিহা' করে। তার একটি কন্যাসন্তানও হয়। তারপর খাদানে কয়লা নিঃশেষিত হয়ে যাবার পর বেকার মেয়েটি প্রচণ্ড অর্থকৃচ্ছ্রতায় নিপীড়িত হতে থাকে। আদিবাসী সমাজ তাকে সারাজীবন ক্ষমা করেনি।

ঐ সময় ঘটনাচক্রে এক সাংবাদিক তাকে চিনতে পারেন। আনন্দবাজারে একটি প্রবন্ধ ছাপেন : 'যে মেয়েটি প্রধানমন্ত্রীর হুকুমে সুইচ জ্বেলে লক্ষ লক্ষ বাড়িতে প্রথম আলো জ্বেলেছিল আজ তার বাড়িতে আলো জ্বলে না! অপরাধটা কার? কেন বুধন একঘরে, অন্তেবাসী, অচ্ছুৎ?' ঘটনাচক্রে প্রবন্ধটি পাঠ করেন একজন বাঙালী কংগ্রেসী সাংসদ। তিনি তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীকে চিঠি লিখে ব্যাপারটা জানিয়ে দেন। রাজীবও তৎক্ষণাৎ ব্যবস্থা করেন যাতে বুধান মেঝান — না, মেঝান নয়, বুধান দত্তের — একটি কর্ম সংস্থান হয়। তাঁর দাদুর অনভিজ্ঞতাজনিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করছিল বুধন, একথা শুনে মর্মাহত হন নাতি! কিন্তু সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র অন্যায়ের প্রতিবিধান করেছিলেন রাজীব।

* * *

বুধনের বেলায় যেমনটি ঘটল তেমন ঘটনা কেন ঘটতে পারল না ইমরোজ আলি ইমামের ক্ষেত্রে? তাঁর কথাও তো পাটনা থেকে লিখে পাঠিয়েছিলেন আশিস ঘোষ, ছাপা হয়েছিল আনন্দবাজারেই। কারণটা কী? জমানা বদলে গেছে? নাকি কম্যুনিস্ট সাংসদরা বুর্জোয়া কাগজ পড়েন না? বুধন মেঝানের বিড়ম্বনা প্রধানমন্ত্রী আদৌ জানতে পারেননি ; কিন্তু আলি ইমামের মৃত্যু তো মুখ্যমন্ত্রীর স্বচক্ষে দেখা! আর কেউ পড়ুক না পড়ুক, জ্যোতিবাবুর রাজনৈতিক সচিব তো প্রতিদিন আনন্দবাজার পড়েন এবং যেখানে-যেখানে জ্যোতিবাবুর কিস্‌সা ছাপা হয়েছে তা লাল পেন্সিলে দাগিয়ে 'হুজুরে হাজির' করেন। তাহলে কেন? কেন পঁচিশ বছর ধরে তদবির করার পরেও ইমরোজ আলি ইমাম শ্রী চন্দন বসুর বিস্‌কুটের কারখানায় একটা খেটে-খাওয়ার চাকরিও পান না?

আশিস ঘোষ লিখছেন "১৯৭০ সালের একত্রিশে মার্চ দিনটি যেমন জ্যোতিবাবুর

জীবনীকারেরা ভুলবেন না, তেমনই ভুলতে পারেননি ইমরোজও। ওই দিনটি তাঁর আদরের আব্বুর মৃত্যুদিন। ছলছল চোখে তিনি বলেন, 'আমি তখন দশ বছরের ছোট্ট ছেলে। আব্বা ছিলেন পাটনার সবচেয়ে বড় জীবনবীমার এজেন্ট। সি.পি.এম.-এর সদস্যও। হঠাৎ আমরা শুনলাম, কলকাতা থেকে জ্যোতি বসু আসবেন। পার্টির লোকজন সব এসে ধরল আব্বাকে, গাড়ি চাই। স্টেশন থেকে জ্যোতিবাবুকে আনতে যেতে হবে। আব্বু তো এককথায় রাজি।"

সেদিন দিল্লি-হাওড়া এক্সপ্রেসে জ্যোতি বসু পাটনা জংশনে এসে পৌঁছান বেলা আটটা নাগাদ। এক নম্বর প্ল্যাটফর্মে সেদিন অনেক পার্টি-নেতাই সমবেত হয়েছিলেন তাঁকে স্বাগত জানাতে। মেন গেটের পাশে টেলিফোন বুথের কাছে দাঁড়িয়েছিল কালো শাল গায়ে জড়ানো একটা বেগানা লোক। সদলবলে সবাই গেটের দিকে চলেছেন। জ্যোতিবাবুর ঠিক পিছন পিছন যাচ্ছিলেন দীর্ঘদেহী আলি ইমাম। হঠাৎ তাঁর নজরে পড়ল ঐ শাল জড়ানো লোকটা তার ডান হাতটা চাদরের তলা থেকে বার করছে, আর মুহূর্ত মধ্যে ওঁর মনে হল সে হাতে একটা রিভলভার! বিদ্যুৎগতিতে আলি ইমাম এক ধাক্কা দিলেন জ্যোতিবাবুকে। জ্যোতিবাবু মুখ থুবড়ে পড়তে পড়তে সামলে নিলেন। কিন্তু ঘুরে দাঁড়িয়ে প্রচণ্ড ধমক দেবার আগেই ঘটে গেল অনেকগুলি ঘটনা। টেলিফোন বুথের দিক থেকে ভেসে এল একটা ফায়ারিঙের শব্দ। আর তাঁকে আড়াল করে দাঁড়ানো আলি ইমাম বুকে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় প্ল্যাটফর্মে লুটিয়ে পড়লেন।

আততায়ীকে ধরা যায়নি। কে কেন খুনটা করতে এসেছিল আজও জানা যায়নি।

ইমরোজ অপরের কাছ থেকে শুনেছে সেসব কথা।

"দশবছরের ইমরোজের মনে আছে তাঁর আব্বুর লাশ চাদরে মুড়ে বাড়িতে নিয়ে আসার কথা। তারপর অনেকে এসেছে তাঁদের বাড়িতে। সমবেদনা জানাতে। সাহায্যের কথাও বলেছে অনেকে। জ্যোতিবাবুর স্ত্রী সমবেদনা জানিয়ে চিঠি লিখেছিলেন ওর মাকে। একটা বাক্সে সেদিনের খবরের কাগজের কাটিঙের সঙ্গে সেইসব চিঠিপত্র আজও রাখা আছে ইমরোজের কাছে। আর তারই সঙ্গে গাঁথা আছে জ্যোতিবাবুকে লেখা তাঁর নানান আবেদনপত্র, আজ যার প্রয়োজন আর মূল্য — দুইই ফুরিয়েছে ইমরোজের কাছে।"

ইমরোজের স্থায়ী রোজগার বলতে কিছু নেই। সম্বল ছিল স্থানীয় নেতাদের আশ্বাস আর আলিমুদ্দিন স্ট্রিটের কিছু হর্তাকর্তার প্রতিশ্রুতি।

সাতাত্তর সালের প্রথম দিকে বামফন্ট্র সরকারের মুখ্যমন্ত্রী হলেন জ্যোতি বসু। ইমরোজের মনে হয়েছিল এতদিনে সব বাধা সরে গেল। সতের বছরের উঠতি জোয়ান ছেলেটি ছুটে এলেন কলকাতায়। সেবার মুখ্যমন্ত্রীর খাশ-কামরায় ঢুকতে পেরেছিলেন

তিনি। ইমরোজের ভাষায়, "জ্যোতিবাবু সেবার অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে আমাদের কথা শুনেছিলেন। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আমাদের সব খবর নিয়েছিলেন। কী সাহায্য দরকার তা জানতে চেয়েছিলেন।"

এরপর যোগাযোগ ছিল কিছুদিন। প্রথম থেকে দ্বিতীয়, তারপর তৃতীয়, চতুর্থবার মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন জ্যোতিবাবু। দক্ষিণ কলকাতার বাড়িতে সরকারী খরচে লিফ্‌ট বসিয়েও সে বাড়ি পছন্দ না হওয়ায় জ্যোতিবাবু চলে গেছেন সল্টলেকে। ওদিকে আরও বেশি দারিদ্র্যের মধ্যে তলিয়ে গেছে একটি পরিবার, যার কর্তা পশ্চিমবঙ্গের পার্টিনেতার জন্যে গুলি খেতে বুক পেতে দিয়েছিলেন।

"আমরা কখনও ক্ষতিপূরণ চাইনি বা টাকার কথা তুলিনি। কিন্তু একেবারেই যখন চলে না, তখন আবার গিয়ে দেখা করলাম। কিছু হল না। গত বছর (১৯৯৪) পাটনায় সিটুর সর্বভারতীয় সম্মেলনে উনি এসেছিলেন। উঠেছিলেন রাজভবনে। ব্যস্ত মানুষ! অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে কোনওমতে দেখা হল, মিনিট পাঁচের জন্য। উনি চিনতে পারলেন। ... তিনি তাঁর সচিব জয়কৃষ্ণ ঘোষকে ডেকে কিছু বললেন। আমাকে বললেন কলকাতায় গিয়ে দেখা করতে।"

গতবছর অগস্টে কলকাতায় এসেছিলেন ইমরোজ। বিহার পার্টির এক সি. পি. এম. নেতার সুপারিশ নিয়ে আবার এসেছিলেন আলিমুদ্দিন স্ট্রিটে। ফিরেছেন তিক্ত অভিজ্ঞতা নিয়ে।

"ওঁরা বললেন রাইটার্সে যেতে। গেলাম। এবার জ্যোতিবাবু ব্যস্ত ছিলেন। দেখা হল না।" অবশ্য দেখা হয়েছে জয়কৃষ্ণবাবুর সঙ্গে। তিনি পাঠিয়ে দিলেন এক অফিসারের কাছে। সেখান থেকে আবার আরেক অফিসার। সেখান থেকে আবার আর এক অফিসার। ধৈর্য এবং আস্থা দুটোকেই রাইটার্সের অলিন্দে জমা দিয়ে পাটনায় ফিরে গিয়েছিলেন শহিদ আলি ইমামের একমাত্র পুত্র।

* * *

কেন এমন হয়?

আমাদের মনে হয়েছে — টি. এন. শেষনের ভাষায় যারা 'রাজনীতিতে হোলটাইমার', অর্থাৎ রাজনীতি ছেড়ে দিলে সংসারযাত্রা নির্বাহের অন্য কোনও পথ যাদের জানা নেই, তারা এই রাজনীতি ব্যবসায়ে প্রবেশের সময় শুধু সততাবোধকেই বিসর্জন দেয় না, দেয় মনুষ্যত্বকে। স্বাভাবিক ভদ্রতার বোধকেও! তারা রাজনীতি-জগতের শতকরা নিরানব্বই ভাগ। বাকি একভাগ পেশাদারী রাজনীতিক নন — তাঁরা যখন সংসদে থাকেন না তখন অন্যভাবে সংসারযাত্রা নির্বাহের ব্যবস্থা করতে সক্ষম — অন্তত রেস্তোয়াঁয় কেবিন-বয় হিসাবেও। তাঁরা ভদ্রতাবোধকে, মনুষ্যত্বকে বিসর্জন দেন

না।

কিন্তু যারা রাজনীতিকে জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করেছে তারা বলে আমি ভারতবাসী নই, আমি যাদব/রাজপুত, অথবা আমি হিন্দু/মুসলমান কিংবা আমি গোর্খা/ঝাড়খণ্ডী। সগর্বে ঘোষণা করে : আমি ভদ্রলোক নই, আমি কম্যুনিস্ট!

আমাদের যুক্তির সমর্থনে কয়েকটি তথ্য পরপর সাজিয়ে দিই। কোথাও কিছু ভুল হলে অনুগ্রহ করে জানাবেন, পরবর্তী সংস্করণে ত্রুটি স্বীকার করে সংশোধন করে দেব:

● ইন্দিরা গান্ধীকে গদিচ্যুত করে জনতা সরকার ক্ষমতায় এসেছিল নিঃসন্দেহে জয়প্রকাশ নারায়ণজীর 'নব নির্মাণ' আন্দোলনের ফলশ্রুতি হিসাবে। জনতা দলনেতারা

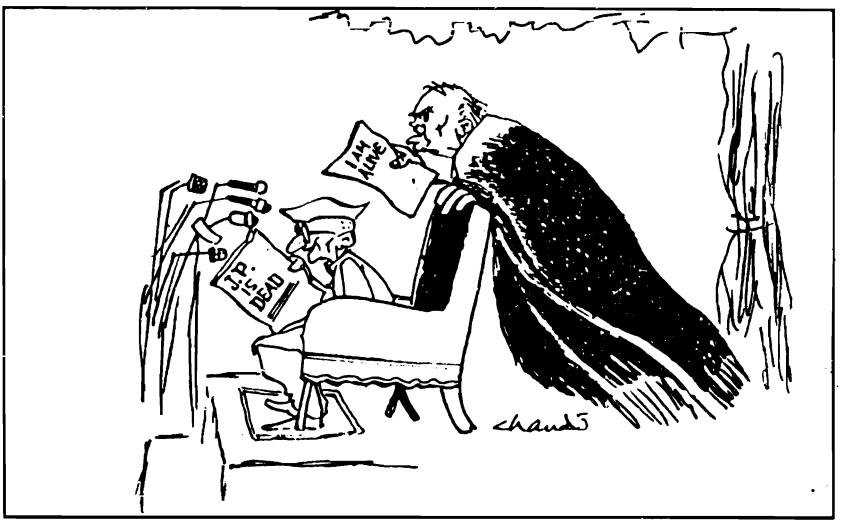

ক্ষমতায় আসার পর জয়প্রকাশজী হাসপাতালে দীর্ঘদিন ভুগে প্রয়াত হন। 'None of the leading ministers of the Janata Party — Morarji, Jagjivan, or Charan Singh cared to visit the dying leader in hospital.—AIR 23.3.79.' [মৃত্যুশয্যায় শায়িত দলপতিকে দেখতে জনতা দলের কেউ একদিনের জন্যও হাসপাতালে দেখা করতে আসেননি — মোরারজী, জগজীবন, চরণ সিং — কেউ না]

● জয়প্রকাশজীর মৃত্যুর পূর্বেই ভুল খবর পেয়ে প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাই লোকসভার স্পিকারের মাধ্যমে গোটা ভারতকে জানিয়ে দেন : জয়প্রকাশ প্রয়াত। ভুল ভুলই। যদিও অত উচ্চপর্যায়ে তা না হওয়াই উচিত। To err is human, not Prime Mininisterian! তবু যেহেতু প্রধানমন্ত্রীও হিউম্যান তাই সেটা ক্ষমা করা যায়। কিন্তু ভ্রান্তি সম্বন্ধে অবহিত হবার পর? মৃত্যুপ্রতীক্ষায় শায়িত জয়প্রকাশজীর

শয্যাপার্শ্বে হাজির হয়ে মোরারজী শ্রদ্ধা জানাবার সময় পেলেন না কেন? এটা ক্ষমার অযোগ্য। জয়প্রকাশজী তখন 'কোমা'র মধ্যে ছিলেন — টের পেতেন না — কিন্তু আমরা তো প্রধানমন্ত্রীকে মার্জনা করার একটা সুযোগ পেতাম!

● প্রথা বলে : কোন রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রয়াত হলে তাঁর শেষযাত্রার সময় পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী উপস্থিত থেকে তাঁকে শ্রদ্ধা জানাবেন। বিশেষ কারণে সেটা সম্ভবপর না হলে বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীর তরফ থেকে একটা পুষ্পস্তবক অথবা মালা পাঠানোটা ভদ্রতা। পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেনের শ্মশানযাত্রার সময়ে বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীর তরফ থেকে কোন পুষ্পমাল্য পাঠানো হয়নি। আমি ঐ দিন হিন্দি-ইংরাজি সংবাদ স্বকর্ণে শুনেছিলাম। ঘোষক স্বজ্ঞানে বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীর নাম বাদ দিয়ে লম্বা লিস্ট শোনাবে এটা অপ্রত্যাশিত। কিছু লিট্‌ল ম্যাগাজিনে এ নিয়ে লেখাও বেরিয়ে ছিল। কোন প্রতিবাদ নজরে পড়েনি।

● বিরানব্বই সালের উনিশে মে শ্রীমতী ভি. চন্দ্রলেখা আই. এ. এস.-এর মুখে অ্যাসিড বাল্‌ব ছুঁড়ে মারা হয়। প্রকাশ্য দিবালোকে, রাস্তায়। তার একপক্ষকাল পূর্বে আমলা চন্দ্রলেখা এবং মুখ্যমন্ত্রী জয়ললিতার একটি দ্বৈরথ-সংঘর্ষ হয় — তামিলনাড় ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপ্‌মেন্ট কর্পোরেশন সংক্রান্ত বিতর্কে। চন্দ্রলেখা ছিলেন তার চেয়ার-পার্সন। জয়ললিতা তাঁর অনুগ্রহভাজন (দুর্জনে বলে তাতে মুখ্যমন্ত্রীর বেনামী স্বার্থ জড়িত) SPIC-কে কিছু নীতিবহির্ভূত অর্থনৈতিক সুবিধা দিতে বলেন। চন্দ্রলেখা তা অস্বীকার করেন। জয়ললিতার দাবী ঐ বিরোধের সঙ্গে এই অ্যাসিড বাল্‌ব ছোঁড়ার কোনও সম্পর্ক নেই। অপরপক্ষে চন্দ্রলেখা, সুব্রহ্মণীয়াম স্বামী এবং সরকার-বিরুদ্ধ অসংখ্য পত্রিকার মতে দুষ্কৃতিকারীরা AIADMK পার্টির পোষা সুপরিচিত সমাজবিরোধী মস্তান।

কোনটা মেনে নেবেন সেটা আপনার যুক্তিনির্ভর সিদ্ধান্ত। কিন্তু এ জাতীয় বর্বর ও নৃশংস আক্রমণে চন্দ্রলেখা যখন হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা কষছেন তখন জয়ললিতার পক্ষে একবার হাসপাতালে যাওয়াটা কি ভদ্রতাসূচক ছিল না? অন্তত একটি পুষ্পস্তবক পাঠিয়ে রোগিণীর আশু রাগমুক্তির কামনা করা? বিশেষ : জয়ললিতা শুধু মুখ্যমন্ত্রীই নন, 'ইন্ডাস্ট্রি' পোর্টফোলিও তাঁরই করতলগত এবং সেই বিভাগের সর্বোচ্চ আমলা ছিলেন আক্রান্তা ভি. চন্দ্রলেখা আই. এ. এস.।

● একটি অহিংস সত্যাগ্রহীর মিছিল পরিচালনা করে এগিয়ে আসছিলেন নিরস্ত্র সাংসদ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। হাজরা পার্কের কাছে। সহস্র লোকের চোখের সামনে শহরবাসীর সুপরিচিত এক অপরাধজীবী তাঁকে পিটিয়ে হত্যা করতে চাইল। মাথায় প্রথম লাঠির আঘাত খেয়েই মমতা রক্তাক্ত অবস্থায় লুটিয়ে পড়েছিলেন রাস্তায়।

হত্যাকারী সর্বসমক্ষে মাথার উপর লাঠি তুলে ভূপতিতা মহিলাটিকে দ্বিতীয়বার আঘাত করতে যায়। নিঃসন্দেহে আততায়ী মমতাকে আঘাত করতে নয়, হত্যা করতে চেয়েছিল। ঐ সময়, প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ অনুসারে, ভবানীপুর থানার জনৈক ইন্সপেক্টার বিদ্যুৎগতিতে তার রিভলভার বার করে আততায়ীর মুখোমুখি দাঁড়ায়। বলে, 'আপনি দ্বিতীয়বার লাঠি চালাবার আগেই কিন্তু আমি আপনার খুলি উড়িয়ে দেব।'

এ বিবরণ কিছুটা সংবাদপত্র থেকে, কিছুটা প্রত্যক্ষদর্শীর কাছ থেকে সংগ্রহ করা। এ ঘটনা বস্তুত আমাদের পাড়ার। কিন্তু ভবানীপুর থানায় খোঁজ করে সেই পুলিশ ইন্সপেক্টারের নামটা সংগ্রহ করতে পারিনি। হয়তো বিশেষ কারণ ছিল।

সে যাই হোক, শাসকদল স্বীকার করতে রাজি হলেন না যে, ঐ সর্বজন পরিচিত অপরাধজীবী তাঁদের অনুগ্রহপুষ্ট। সে ফৌজদারী মামলার রায় কী হয়েছে, আদৌ হয়েছে কি না, জানি না। কিন্তু এটুকু জানি যে, পশ্চিমবঙ্গের ব্যস্ত মুখ্যমন্ত্রী ঐ মুমূর্ষু মহিলার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে নার্সিং-হোমে যেতে পারেননি। তা না পারুন, তাঁর তরফে শীঘ্র আরোগ্যলাভের শুভেচ্ছাবাণীসহ একটা ফুলের স্তবকও কি নার্সিং-হোমে পাঠানো যেত না? বিশেষ, সে মেয়েটি যখন ইলেকশন জিতলে তাঁকে প্রণাম করতে আসে?

* * *

রাজনীতিজীবীরা শুধু নীতিভ্রষ্ট এবং ভদ্রতাবোধহীন একথাই এতক্ষণ বলতে চাইছিলাম। এ ছাড়া তাঁদের চরিত্রে আরও একটি 'গুণ' গজিয়ে ওঠে। ক্ষমতাসীন হলেই: 'ট্রিগার-হ্যাপী' মনোভাব। যেহেতু আমি ক্ষমতায় আসীন সে-হেতু যে-কেউ আমার বিরুদ্ধে বা আমার পার্টির বিরুদ্ধে কথা বলবে তাকে গুলি করে খতম করা দরকার!

একটা উদাহরণ দিই : এ বছর বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবসের (সাতই এপ্রিল) তিন দিন আগে দেবগ্রামের স্বাস্থ্যকেন্দ্রে হাম-প্রতিষেধক বিষাক্ত ইনজেক্শন দিয়ে তিন তিনটি নবজাতক শিশুকে অনিচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করা হল : মিন্টু শেখ, সোমা বিশ্বাস আর বন্দনা দাশ। সম্পূর্ণ কর্তৃপক্ষের গাফিলতিতে। দেবগ্রামের মানুষ ক্ষিপ্ত হয়ে হাসপাতালে ভাঙচুর করে। বামপন্থী স্বাস্থ্যমন্ত্রী প্রশান্ত শূর মহাশয় স্বয়ং দেবগ্রামে গিয়েছিলেন, নিহত শিশুর মায়েদের সান্ত্বনা দিতে। এটা নিশ্চয়ই প্রশংসার্হ। সচরাচর মন্ত্রীমশাইরা দেহরক্ষী পরিবৃত হওয়া সত্ত্বেও ঐ সব দুর্যোগের সময় অকুস্থলে যেতে ভয় পান। দূর থেকেই সমবেদনার বার্তা পাঠিয়ে থাকেন অথবা বলেন, "ও কিছু নয়, এমনটা মাঝে মাঝে হয়েই থাকে।"

দুঃখের কথা, শূরমশাই বিক্ষুব্ধ জনতার মুখোমুখি পড়ে যান। এমনটা হওয়াও অস্বাভাবিক মোটেই নয়। স্বাস্থ্যকেন্দ্রটিতে অগ্নিসংযোগ করা অথবা মহকুমা শাসকের জীপে আগুন ধরানোর প্রচেষ্টা নিশ্চয় অত্যন্ত নিন্দার্হ। কিন্তু একটা কথা মনে রাখতে

হবে : সে সব ঘটনা জনতার স্বতঃস্ফূর্ত রোষে — তাৎক্ষণিক উত্তেজনায়। কিন্তু দেবগ্রাম থেকে ফিরে এসে পরদিন বাতানুকূল-কক্ষে বসে স্বাস্থ্যমন্ত্রী সাংবাদিকদের যে কথা বললেন তার মধ্যে তাৎক্ষণিক উত্তেজনা ছিল না। তিনি বললেন : "দেবগ্রামে উত্তেজিত জনতার উপর আগেই গুলি চালানো উচিত ছিল পুলিশের।"

এটা কেমন দায়িত্বজ্ঞানহীন কথা?

তাঁর ও-কথার সমালোচনা করে পশ্চিমবঙ্গ হেলথ সার্ভিসেস অ্যাসোসিয়েশানের সম্পাদক ড. হীরালাল কোঙার আনন্দবাজারে (22.4.95) লিখলেন, "শ্রীশূরের নেতৃত্বে সর্বত্র অনাচার চলছে। এবং তা শুধু টিকাদানের ক্ষেত্রে নয়। মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে সুস্থ-নীরোগ নবজাত শিশুদের মৃত্যু ঘটেছে হাসপাতাল কর্মীদের হাতুড়েপনার ফলে। চিকিৎসাবিজ্ঞানের নিয়মবিধিকে উপেক্ষা করে এড্‌স রোগীকে চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। একই অনাচারের ফলে বন্ধ্যাকরণ অপারেশন করাতে গিয়ে সুস্থ নারীর মৃত্যু ঘটেছে। দেবগ্রামে শ্রীশূর বলেছেন, "এ রাজ্যে এমন ঘটনা এর আগে ঘটেনি।" কথাটা সত্য নয়। এর আগেও এ হেন মৃত্যুর কাহিনী প্রকাশিত হয়েছে এবং অপ্রকাশিত অবাঞ্ছিত প্রতিক্রিয়ার সংখ্যা অসংখ্য! ... নিরীহ জনসাধারণ এসব কথা জানে না বলেই শ্রীশূর এবং তাঁর বশংবদ কর্মকর্তারা যা নয় তাই বিবৃতি দিয়ে থাকেন। দেবগ্রাম ঘটনার জন্য সরকারি তদন্ত কমিটিতে যাঁরা আছেন তাঁরা সবাই ঐ বশংবদ বাহিনীর সদস্য! সত্য উদঘাটন করা তাদের কাজ নয়।"

হাবড়া থেকে তপন বিশ্বাস এ-প্রসঙ্গে লিখেছেন (আনন্দবাজার পত্রিকা 22.4.95) "যদি গোঁসা না করেন তবে একটা অনুরোধ। একটু ভেবে দেখুন না, যারা মারা গেল তারা যদি আপনারই সন্তান-সন্ততি হত তাহলে আপনার অনুভূতিটা কেমন হত? ... আপনি জনগণের সেবক সেজেছেন। নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তায় দিনযাপন করছেন। তবু আপনাকে একটু স্মরণ করিয়ে দিই যে, আপনার পরিচালনার গুণে সরকারি হাসপাতালগুলির নাভিশ্বাস উঠেছে। অসাধু লোকের দাপটে সাধারণ মানুষের প্রাণ ওষ্ঠাগত! খাবার চুরি, ঔষধ চুরি নিত্যকার ঘটনা। আপনারা জানেন না, সাধারণ মানুষ আপনাদের কতটা ঘৃণা করে। সাধারণ মানুষের ঘৃণা যেদিন একত্র হবে, তারা যেদিন প্রতিবাদের ভাষা খুঁজে পাবে, সেদিন কোথায় পালাবেন?. . . "

কিন্তু না। আমরা সরকারি হাসপাতালের ব্যবস্থাপনা, রোগীর খাবার চুরি বা, ঔষধ চুরি নিয়ে এখন আলোচনা করছি না — করছি একজন মন্ত্রীপর্যায়ের দেশসেবকের 'ট্রিগার-হ্যাপী' মনোভাব নিয়ে। উত্তেজনা মুহূর্তে অকুস্থলে নয়, পরদিন বাতানুকূল ঘরে সাংবাদিকদের বিবৃতি দেবার সময় যদি কোনও মন্ত্রীর মনে না পড়ে যে, পুলিশের প্রতিরোধের অসংখ্য ব্যবস্থা আছে — ব্যারিকেড রচনা করা থেকে গুলিবর্ষণের মধ্যে

— যথা মৃদু লাঠি চার্জ, হোসপাইপ ব্যবহার, লাঠি চার্জ, কাঁদানে গ্যাস, শূন্যে বন্দুক ছোঁড়া ইত্যাদি — তাহলে অন্তত এই ন্যূনতম সিদ্ধান্তে আমাদের উপনীত হতে হবে যে, বন্দুকনির্ভর 'ট্রিগ্যার-হাপি' শাসকটি মন্ত্রীপদের অযোগ্য!

একটা উদ্ধৃতি শুনুন। যিনি লিখছেন তিনি ভারতের প্রধানতম আই. সি. এস্.দের অন্যতম। ঘটনাচক্রে পঞ্চাশের দশকে আমি নিজে তাঁর অধীনে চাকরি করেছি। আমি ছিলাম অ্যাসিস্টেন্ট এঞ্জিনিয়ার, তিনি ডেভেলপমেন্ট কমিশনার। উনি আমার চাকরিজীবনে-দেখা একমাত্র আই. সি. এস. অফিসার যিনি তাঁর ড্রাইভারকে, অর্ডার্লিকে 'আপনি' সম্বোধনে আদেশ দিতেন। এমন নম্র, ভদ্র, আদর্শনিষ্ঠ প্রবীণ অফিসার তাঁর স্মৃতিচারণে লিখছেন [তিনকুড়ি দশ পৃ: 152-3 — অশোক মিত্র, অবসারপ্রাপ্ত আই. সি. এস.।]

> কেন আমি গুলি চালানোর এত বিপক্ষে ছিলুম? রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত কারণগুলি একটু আগেই বলেছি। ব্যক্তিগত কারণ হচ্ছে আমার জেদ ছিল গুলি চালালে আমার নিজের কাছে আমার নৈতিক ও নেতৃত্বগত হার হবে। রাজনৈতিক কারণ ছিল, একবার গুলি চললে বার বার গুলি চালাতে হবে। তৃতীয় একটা কারণ ছিল, অত্যন্ত দুঃখ ও খেদের সঙ্গে বলতে বাধ্য হচ্ছি, স্বাধীনতা পাবার পর, আমাদের সরকার বর্তমানকালে যার এক কাণাকড়িও মূল্য দেন না। পরাধীনতার সময়ে ভারতবাসীর জীবনের যে মূল্য ছিল, আজ স্বাধীন হয়ে তার কিছুমাত্র নেই। আজকের দিনে কথায় কথায় পুলিশ ট্রিগার টিপেই খুশি, জীবনহরণের কোন জবাবদিহি নেই। ম্যাজিস্ট্রেট উপস্থিত থাকার প্রয়োজন নেই, সে বিরাটি বা বানতলার ভয়ঙ্কর পাশবিক হত্যাকাণ্ডই হোক অথবা অল্পবয়স্কা রাজনৈতিক নেত্রীর মাথা ফাটিয়ে দেওয়াই হোক, বা রাজনৈতিক শত্রুদের ট্রাক থেকে নামিয়ে পিছন থেকে গুলি করে মেরে রাস্তায় ফেলে রাখাই হোক! পুলিশের তদন্তাধীন লোককে সম্পূর্ণ বে-আইনি সাফাই গেয়ে হত্যা করা সেকালে সম্ভবপর হত না। জালিয়ানওয়ালাবাগের পর বৃটিশ সরকার গুলি চালাতে রীতিমতো ভয় পেত — শুধু যে ভারতীয় জনমতের ভয়ে তা নয়, তার থেকে বেশি বৃটিশ পার্লামেন্ট ও বৃটিশ সংবাদপত্রগুলির ভয়ে। উপরন্তু গুলি চললে সরকার সংশ্লিষ্ট কর্মচারির কাজ খুব কম ক্ষেত্রেই বিনা ওজরে পূর্ণ সমর্থন পেত।"

কী দুঃখের কথা, কী অপরিসীম পরিতাপের কথা: এ রাজ্যের মন্ত্রীরা দেশসেবকের ভূমিকায় গান্ধী, লেনিন. অথবা অ্যাব্রাহাম লিংকন্-এর মতো কোন মহামানবকে আদর্শ হিসাবে বেছে নিতে পারছেন না। 'দেশসেবকের' চেয়ে 'দেশশাসকের' ভূমিকাটাই

তাঁদের কাছে বড় হয়ে উঠছে। আর তাই 'ট্রিগার-হ্যাপী' স্বাস্থ্যমন্ত্রী আদর্শ হিসাবে বেছে নিলেন : গোয়েরিঙ, ইদি আমিন অথবা পাঞ্জাবের সেই লে: গভর্নর মাইকেল ও' ডায়ারকে!

* * *

কিন্তু অকর্মণ্য আমলা, অসৎ সাংসদ-বিধায়ক বা অপদার্থ মন্ত্রীদের নিয়ে আলোচনা চালিয়ে গেলে এ 'কৈফিয়ৎ' কোনদিনই শেষ হবে না। তার চেয়ে আসুন কিছু সাহসী সৎ মানুষের কথা আলোচনা করি — যাঁরা এই ভারতব্যাপী নীরন্ধ্র অমারাত্রির তপস্যায় নির্যাতিত হয়ে যাচ্ছেন এই আশায় যে, নিষ্প্রভাত রাত্রি হয় না।

* * *

এঁরও বিচিত্র জীবন। কেরালার ক্রিশ্চিয়ান। ভীষণ দুরন্ত ছিলেন ছেলেবেলায়। পরিবারের সবাই এবং মাস্টার-মশাইরা ধরে নিয়েছিলেন এ ছেলের কিছু হবে না। বড়জোর দোকানদার, সেল্‌স্ এজেন্ট বা প্রাইমারী স্কুল টিচার। একবার স্কুলের ক্লাস প্রমোশনে অঙ্কে খুব কম নম্বর পান। বাড়িতে কেউ কিছু বলেনি — ভাবখানা ওর কছে এর চেয়ে বেশি কী প্রত্যাশা করা যাবে?

ভীষণ অপমানিত বোধ করলেন উনি। সব রকম দুষ্টামি ছেড়ে মন দিলেন পড়াশুনায়। পরের বছর সবাইকে অবাক করে দিয়ে ক্লাসে প্রথম। ব্যস! সেই শুরু। তারপর থেকে আর কেউ তাঁকে ঠেকাতে পারেনি। উনআশি সালে পরীক্ষা দিলেন আই. এ. এস.-এ। সেখানেও সফল।

প্রথম পোস্টিং কেরালাতেই। সিভিল সাপ্লাই কর্পোরেশনে। প্রথম বছরেই হিসাবের আলমারি থেকে একটা 'কঙ্কাল'কে টেনে বার করলেন —হিসাবের প্রচণ্ড গড়মিল! তদন্ত কমিটি বসানো হল। কেরালা সরকারের বিখ্যাত, অথবা কুখ্যাত : 'পালমোলিন অয়েল ডীল'। মুশকিল হল এই যে, কেরালা সরকারের অনেক তা-বড় তা-বড় রাজনীতি-ব্যবসায়ী এবং অসাধু আমলা চূড়ান্ত বেইজ্জত হয়ে পড়লেন। আপনারা যা প্রত্যাশা — না কি আশঙ্কা — করছেন, তাই হল : রাতারাতি বদলি।

এলেন দিল্লীতে। ডি. ডি. এ.-র ডেপুটি কমিশনার। অর্থাৎ দিল্লী ডেভেলপমেন্ট অথরিটির। অচিরেই প্রমোশন পেয়ে হলেন কমিশনার। বাঁকুড়ার রীনা বেঙ্কটরমন খেতাব পেয়েছিলেন 'বুলডোজার লেডি'। কে. জে. আলফন্স আই. এ. এস. খেতাব পেলেন : 'ডেমলিশন ডাইনামো।'

বৃহত্তর দিল্লীর একটা বিরাট ম্যাপ টাঙানো হল ওঁর ঘরের দেওয়ালে। তাতে লালরঙে দাগানো ডি. ডি. এ.-র যে-জমি বেআইনি ভাবে দীর্ঘদিন বেদখল হয়ে আছে। মাস-তিনেক লাগল লিস্টটা বানাতে। কোন জমি কে, কবে, কীভাবে বেদখল করেছে।

তারপর ফাইলটা নিয়ে চলে গেলেন বিভাগীয় মন্ত্রীর কাছে। বললেন, য়োর এক্সেলেন্সি! আমি প্রায় হাজার একর বে-আইনি জমিদখলের তালিকা তৈরী করেছি। দখল ফেরত নেওয়া খুবই সহজ, কিন্তু আপনাকে তার আগে আমাকে মৌখিক আশ্বাস দিতে হবে যে, কাজ শুরু করার পর আপনি আমাকে মাঝপথে থামিয়ে দেবেন না।

মন্ত্রী বললেন, মাঝপথে থামিয়ে দিতে যাব কেন? এ তো ভাল কাজ!

আলফন্সের সোজা কথা, আজ্ঞে না। বাধা কেন দেবেন? তবে একথা যেন বলবেন না — 'এ. বি. সি.'র বিরুদ্ধে অ্যাকশন নাও তারপর 'ডি.'-কে বাদ দিয়ে 'ই. এফ. জি.' পর্যন্ত। 'এইচ.' টাকে অবশ্য আবার বাদ দিতে হবে, কারণ সেও আমাদের পার্টির লোক।

মন্ত্রী নির্নিমেষ নয়নে কমিশনারের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। তারপর জানতে চাইলেন, ঐ হাজার একর জমির বর্তমান বাজারদর কত?

—অন্তত দশহাজার কোটি টাকা! ডি. ডি. এ.-র অ্যাসেট এক বছরের মধ্যে আমি ঐ পরিমাণ বৃদ্ধি করে দেব — শুধু ঐ একটি মাত্র শর্তে। মাঝপথে আপনি, বা আপনার প্রধানমন্ত্রী, কিংবা রাষ্ট্রপতি ...

বিভাগীয় মন্ত্রী ওঁকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, ব্যস! খুব! গো ফরওয়ার্ড! হয়তো মাঝপথে 'হল্ট' আদেশ পাবে; কিন্তু ঐ সঙ্গে সেদিন খবরের কাগজে দেখবে আমি পদত্যাগ করেছি।

সৎ আমলা শুধু নয়, সৎ রাজনীতিবিদকেও জন্ম দিয়েছেন ভারতজননী! সৎ মন্ত্রীও ছড়িয়ে আছেন বিভিন্ন রাজ্য-সরকারে বা কেন্দ্রে। পশ্চিমবঙ্গে যেমন বিনয় চৌধুরী বা শঙ্কর সেন।

বিরানব্বই থেকে চুরানব্বই —দুবছরে আলফন্স এগারো শত একর জবর-দখল ডি. ডি. এ.-র জমি উদ্ধার করেছেন — যার মূল্যমান দশহাজার কোটির উপর। এখনো (ডিসেম্বর' 94) 6,500 একর জমি উদ্ধার করা বাকি — বাঘের বাচ্চার মতো উনি লড়ে যাচ্ছেন তাই নিয়ে। মন্ত্রী পদত্যাগ করেননি, আলফন্সও বদলি হননি। কিন্তু বিশ্বাস করুন — আলফন্সের বিরুদ্ধে বিভিন্ন আদালতে অমিমাংসিত মামলার সংখ্যা 24,000! আজ্ঞে হ্যাঁ! চব্বিশ হাজার। তাঁর বাড়িতে মেশিনগানধারী পুলিশ তিন-শিফটে পাহারা দেয়। গাড়ি করে কোথাও গেলে ঐ মেশিনগানধারী বসে থাকে ঠিক পাশে। অর্থাৎ ঐ চব্বিশ হাজার মামলা যে হেভিওয়েট ধনকুবেররা লড়ে যাচ্ছেন তাঁদের দ্বারা কোনও অর্থমূল্যে নিয়োজিত খুনীকে একথা বুঝে নিতে হবে যে, তার নিজেরও ঝাঁজরা হয়ে যাবার আশঙ্কা অন্তত শতকরা পঞ্চাশভাগ :

Still Alphons nurses ambitions of launching a forum to fight corruption. And even quitting service to build it into a national movement. "As an IAS officer my job was to transform society,"

he says,"That's what I wanted to do and that's what I'm doing."
— Shefali Rekhi, INDIA TODAY, 15.10.94

["তা সত্ত্বেও আলফন্স মনে মনে একটা উচ্চাশা পোষণ করেন — দুর্নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রস্তুত একটা সংস্থার স্বপ্ন দেখেন তিনি। প্রয়োজনে সর্বভারতীয় "দুর্নীতি নিরোধ সংস্থা" গঠনের জন্য চাকরি ছেড়ে দিতেও তিনি রাজি। বলেন "আই. এ. এস. অফিসার হিসাবে আমার প্রথম কর্তব্য সমাজকে গ্লানিমুক্ত করা। আমি তাই করতেই চাই ; আর করছিও তাই।" —শেফালি রেখি, ইন্ডিয়া টুডে, 15.10.94]

* * *

আভাস চ্যাটার্জির কপালে কিন্তু সে সুখ জোটেনি। দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি বিহার ক্যাডারের লোক। আই. এ. এস. অফিসার হিসাবে পোস্টিং পেয়েছিলেন রাজধানীতে। বিহার বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত বিভাগেই দুর্নীতি ও স্বজনপোষণ দেখে তিনি কড়া হাতে তা নিবৃত্ত করতে গেলেন — বছরকয়েক আগেকার কথা। তার দুবছর আগে লালু যাদব বসেছেন মুখ্যমন্ত্রীর গদিতে। লালু ওঁকে ডেকে 'থোড়াবহুৎ' সমঝে চলার আদেশ দিলেন। আভাস বিশ্ববিদ্যালয়কে ছেড়ে ধরলেন পাটনা শহরকে। সেই পি. কে. সিন্‌হার অসমাপ্ত কাজ। রাস্তার দুধারে সরকারী জমিতে উঠেছে বে-আইনি দোকান, বাড়ি। রাজনীতি-ব্যবসায়ীদের প্রণামী দিয়ে। উঠেছে নয়, ছিলই। কিছু বরং বেড়েছে। সেই সিন্‌হা সাহেবের সাকসেসারের 'চন্দ্রার্কমেদিনী' ফর্মানে। এবার লালুপ্রসাদ আর আমলাকে ডেকে পাঠালেন না। বিধানসভায় ঘোষণা করলেন : "বহ্ হরগিজ পাগল হ্যয়, ঔর সাম্প্রদায়িক ভি হ্যয়! ম্যায় দাওয়াই কা এন্তাজাম করুঙ্গা।"

না, লালুবাবুকে দাওয়াই-এর এন্তাজাম করতে হল না। বিরানব্বই সালের জুলাই মাসে মুখ্যমন্ত্রীর এ জাতীয় ঘোষণা শুনে আভাস চট্টোপাধ্যায়, আই. এ. এস. চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে বিহার ছেড়ে চলে গেলেন।

* * *

বিহার এদিক থেকে এক আশ্চর্য রাজ্য! ভারতবর্ষের মধ্যে সবচেয়ে অনগ্রসর, সবচেয়ে দুর্নীতিপরায়ণ, সবচেয়ে প্রাকৃতিকসম্পদে ভরপুর এবং সবচেয়ে গরিব রাজ্য —তবে হ্যাঁ, লালুবাবু ইলেকশান জেতায় তাঁর গলায় যে ফুলের মালাটা তোলা হয়েছিল তার জন্য একটা ক্রেনের ব্যবস্থা নিতে হয়েছিল এবং সেদিন কলকাতায় সি. পি. এম. ক্যাডাররা আনন্দে রাস্তায় রাস্তায় নেচেছিল। লালুবাবুর অসীম সৌভাগ্য : সুপ্রীমকোর্ট বিনা আইডেন্টিটি কার্ডে সেখানে ভোট হতে দেয়।

এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ ইন্সস্টিট্যুটের (ADRI) প্রতিষ্ঠাতা শৈবাল গুপ্তের মতে "মহারাষ্ট্রের সব উন্নয়ন কাজ যদি বন্ধ করে দেওয়া হয় তাহলে বিহার যে গতিতে

উন্নতি করছে তাতে মহারাষ্ট্রকে ছুঁতে তার একশ বছর সময় লাগবে। বিহার ধীরে ধীরে অনিবার্যভাবে ভারতের সোমালিয়ায় পরিণত হতে চলেছে।"

এর একমাত্র হেতু, রাজনীতি-ব্যবসায়ীদের ভ্রষ্টাচার—কোন ট্যাক্স সংগ্রহ করা হয় না, সেলস-ট্যাক্সও নয় ; অথবা যেটুকু সংগ্রহ হয় তা সংগ্রাহকের পকেটে যায়। ফলে বিহারের উপার্জনের খাতায় বিরাট একটা শূন্য। সরকারী আমলা এবং রাজনীতিবিদেরা মাসে শতশত কোটি টাকা ঘুষ খাচ্ছে। ADRI-কতৃর্ক প্রচারিত একটি সাম্প্রতিক প্রচার পুস্তিকায় বলা হয়েছে, "ঐতিহাসিক কিছু নিদর্শন — সাঁচি, নালন্দা, বুদ্ধগয়া ছাড়া — বিহারের আর কিছু দেখাবার নেই।"

'ইন্ডিয়া টুডে'র সাংবাদিকের মতে, পাটনা মেডিকেল কলেজের নার্সরা গত সাত আট মাস মাহিনা পান না। পাবলিক হেলথ ইন্সটিট্যুটের গুদামে এক ড্রামও ব্লিচিং পাউডার অথবা গ্যামাক্সিন নেই। স্কুলের মাস্টার-মশাইদের মাহিনা দেওয়া হয় না। পঁয়তাল্লিশ হাজার সংস্কৃত শিক্ষক বিগত চৌদ্দমাস ধরে মাহিনা পাননি। পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক বলেছেন, বিগত দশ বছরে লাইব্রেরীতে একখানি পুস্তকও কেনা হয়নি — অর্থাভাবে। একমাত্র পুলিশ বাহিনীর অবস্থা কিছুটা ভাল। তারা মাহিনা পায়। না হলে লালুবাবুর রাজ্য টিকতে পারে না। তবে গোটা বিহারের 1,216টি থানার ভিতর 475টিতে কোন জীপ বা গাড়ি নেই। 600টি থানায় কোন টেলিফোন কনেকশান নেই। বাকি ছয় শতাধিক ও.সি-র টেবিলে এক-একটি টেলিফোন রিসিভার শোভাবৃদ্ধি করে, বাজে না। কারণ সহজবোধ্য : লাইন কাটা। টেলিফোন বিল না মেটানোতে।

সব বিভাগে একই হাল :

● গতবছর আগস্ট মাসে ওয়াটার রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট মন্ত্রী শ্রী জগতানন্দ সিংজী লেজিস্‌লেটিভ কাউন্সিলকে জ্ঞাত করলেন যে, দুর্গাবতী জলাধার প্রকল্পের হিসাবে চল্লিশ কোটি টাকার গরমিল। আশি কোটি টাকার প্রজেক্ট। প্রায় সবটাই খরচ হয়ে গেছে, অথচ কাজ চার-আনাও হয়নি। এ প্রকল্প পরিত্যাগ করাই বাঞ্ছনীয়। তবে যে টাকা চুরি গেছে তার জন্য একটা বিভাগীয় তদন্ত কমিশন করা যেতে পারে...টুং টাং!

● গয়ার সন্নিকটবর্তী শোনদহ জলাধার পঁচাশি কোটি টাকা ব্যয়ে সদ্য সমাপ্ত হয়েছে। পরিকল্পনা অনুযায়ী বাঁধের জলে 1,500 একর জমিতে জল সরবরাহ হবার কথা ; বাস্তবে হচ্ছে 5 একর জমিতে। বাকি সামান্য 1,495 একর জমিতে কেন সেচের জল সরবরাহ করা যাচ্ছে না — প্রকল্প সুসমাপ্ত হবার পরেও — এ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর মতে একটা বিভাগীয় তদন্ত কমিশন বসানো দরকার .. .. টুং টাং!

● লালুবাবুর পূর্বজমানায় শুরু বিশাল 'মহাত্মা গান্ধী সেতু'-র কাজ সম্প্রতি শেষ হয়েছে। গঙ্গার উপর। ব্রীজ খুলেও দেওয়া হয়েছে। অথচ কেউ তা ব্যবহার করছে না!

কী করে বুঝলেন? হিসাবের খাতা দেখে! টোল কালেকশন : Nil! [সাংবাদিক অমৃত ধিলন রিপোর্ট দিচ্ছেন,"It is believed that at the northern end of the bridge at Hajipur alone, an estimated Rs. 25,000 to Rs. 30,000 per day has been going into the pockets of engineers, district officials and local policemen" — ব্রিজের উত্তরপ্রান্তে শুধু হাজিনগর চেক পোস্টে, দৈনিক পঁচিশ হাজার থেকে ত্রিশ হাজার টাকার টোল আদায় হয়। তবে সবটাই যায় এঞ্জিনিয়ার, আমলা আর স্থানীয় পুলিসের পকেটে। সহজ পন্থা! সরকারী টোলের যা রেট তার থেকে দু-এক টাকা কম নেওয়া হয়, পরিবর্তে রসিদ দেওয়া হয় না।]... টুং টাং!

● গত বছর গোপালগঞ্জের ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট জি. কৃষ্ণাইয়াকে পাটনার কিছু উত্তরে মজঃফরপুরের কাছাকাছি জীপ থামিয়ে খোলা রাস্তার মাঝখানে খুন করা হয়। এই জেলা সমাহর্তার প্রতি জনগণের ক্রুদ্ধ হবার আদৌ কোন কারণ ছিল না — একমাত্র হেতু তাঁর গাড়িতে যে নেমপ্লেট ছিল তাতে লেখা "ডি.এম. গোপালগঞ্জ"! খুন কোনও আগ্নেয়াস্ত্রের মাধ্যমে করা হয়নি। ক্রমাগত পাথর ছুঁড়ে! সমতা পার্টির সাংসদ নীতিশকুমারের ভাষায় "Lalloo has criminalised the entire police system, terrorised his opponents and destroyed the morale of the bureaucracy." [লালু তাঁর পুলিশদলকে একটা গুণ্ডা, অপরাধজীবী সংস্থায় পরিণত করেছেন। বিরোধীদলকে চরম আতঙ্কগ্রস্ত করতে সক্ষম হয়েছেন, আর আমলাতন্ত্রের মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়েছেন।"] বিশ্বাস করা কঠিন, কিন্তু একথা বর্ণে বর্ণে সত্য : কৃষ্ণইয়ার জন্ম একটি দলিত পরিবারে, অন্ধ্রপ্রদেশে তাঁর বাবা ছিলেন মাটি কাটা কুলি। কৈশোরে স্কুলে পড়তে পড়তে তিনিও বাবাকে সাহায্য করতে ছুটির দিনে কোদাল চালাতেন। ম্যাট্রিক পাশ করে কেরানির চাকরি। রাতে পড়ে জার্নালিজম-এ ডিগ্রি। পঁচাশি সালে আই.এ.এস. পরীক্ষায় অবতীর্ণ এবং একবারে পাশ। মারা গেলেন পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে, সদ্যবিবাহিত অবস্থায়। বিহারে তিনি অজাতশত্রু! গরিবদের চিরটাকাল ভালই করেছেন! জীবনে একটাই ভুল করেছিলেন : আই.এ.এস. পাস করে বিহার ক্যাডার বেছে নেওয়া!

● বিগত ষোল বছরে বিহারে পঁচিশজন এঞ্জিনিয়ারকে (অধিকাংশই এক্সিকিউটিভ র‍্যাঙ্কের) সমাজবিরোধীরা খুন করেছে, এছাড়া সাতাশজনের রহস্যজনক মৃত্যু হয়েছে — একুনে বাহান্নজন। এছাড়া অন্তত 53 জন উচ্চপদস্থ অফিসারকে আক্রমণ করা হয়েছে এবং নয়জনকে অপহরণ করা হয়েছে (স্টেটস্‌ম্যান পরিবেশিত তথ্য)। স্বতই মনে হবে, "পাশের রাজ্য পশ্চিমবাংলায় সে তুলনায় অবস্থা নিশ্চয়ই ভাল। এখানে এক-আধজন মেহতা বা অনিতা ধাওয়ানকে শহীদ হতে হলেও বাকিটা এখনও দলবাজির

সীমানায় — প্রকাশ্যে খুন, পুড়িয়ে মারা, পিটিয়ে মারার পর্যায়ে রয়েছে। অতএব প্রশাসন বা পুলিশ এবং বিভাগীয় উচ্চপদস্থরা এখনও আক্রমণের লক্ষ্য নন।" (কৃষ্ণনগর থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'গ্রাম-গ্রামান্তর', 12.12.94 সম্পাদকীয়) ঐ লিট্‌ল্ ম্যাগাজিনের সম্পাদক শ্রীচন্দন সান্যালের মতে এ পার্থক্যের হেতু "এ রাজ্যে দলের সঙ্গে প্রশাসনের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ সমঝোতা করে নেন।"

আমাদের কিন্তু তা মনে হয়নি। আমাদের মতে হেতুটা ভিন্ন জাতের। পশ্চিমবঙ্গে এক্সিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ারদের 'ড্রইং অ্যান্ড ডিসবার্সিং' ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে সেটা দিয়ে দেওয়া হয়েছে পঞ্চায়েতের সভাধিপতিদের। ঠিকাদারী কাজ বণ্টন, সাপ্লাই নেওয়া, বাস-সার্ভিসের রুট-পার্মিট বণ্টন, ইত্যাদি সব অর্থসম্পৃক্ত 'দেশসেবা'র কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন পঞ্চায়েতরাজ। অর্থাৎ তা শাসকদলের নিজের কব্জায়। বিহারে তা নয়। পশ্চিমবঙ্গের কোন সভাধিপতি নিরক্ষর নন, অথচ বিহারে অনেক সরপঞ্চ নিরক্ষর! বিহারে অফিসাররাই কাজ দেন ঠিকাদারদের। সরবরাহকারীদের। 'চেক'ও দেন কর্মসমাপনান্তে। তার ফলে বিহারে ওঁদের মরতে হয়! পশ্চিমবঙ্গে সঞ্জয় মুখার্জি, নজরুল ইসলাম, অর্কপ্রভ বা রীণা বেঙ্কটরমনকে প্রাণ দিতে হয় না। 'দেশসেবক' শাসকদলের নির্দেশে ঘন ঘন বদলির বা সঞ্জয় মুখার্জির মতো বিচিত্র 'প্রমোশন'-এর বিড়ম্বনা সইতে হয়, এই মাত্র!

* * *

পি. কে. ঝা। ছাত্র ভাল। কানপুর আই.আই.টি. থেকে এঞ্জিনিয়ারিং পাস করে চাকরি পেল একটা মাল্‌টিন্যাশনাল অয়েল কর্পোরেশনে। অনেক টাকা মাইনে। ওরা তাকে পাঠিয়ে দিল ব্যাঙ্ককের অফিসে। কিন্তু বিদেশে ওর মন টিকল না। ছুটি নিয়ে ভারতে এসে বসে গেল প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায়। একবারেই নির্বাচিত হল। বেছে নিল আই.পি.এস. সার্ভিস। সেটা উনিশ শ ছিয়াশি সাল।

বছরপাঁচেক পরের কথা। ঝা তখন গুজরাটের অন্তর্গত কচ্ছ জেলার পুলিশ চীফ। কচ্ছ হচ্ছে চোরাকারবারিদের এক স্বর্গরাজ্য। 'রান'-অঞ্চলের বাদায় চোর-পুলিশ খেলা চলে না। বাদার কাদায় পা বসে যায়, সামুদ্রিক জোঁকে ছিঁড়ে খায়। আর পুট করে পাকিস্তানে পালিয়ে যাওয়ার সুবিধা। তবু ঝা লড়ে যাচ্ছে। তার গোপন খবর : পালের গোদা হচ্ছে ইব্‌লা শেঠ ; কিন্তু মুশকিল এই : ইব্‌লা শেঠ মুখ্যমন্ত্রীর পেয়ারের লোক। চীমনভাই প্যাটেলের জনতাদলের সক্রিয় কর্মী। তা হোক, অনেক কায়দাকানুন করে একদিন রুমাল হাতেনাতে ধরে ফেলল ইব্‌লা শেঠকে। মুখ্যমন্ত্রী ক্ষুব্ধ হলেন। ঝায়ের বড়কর্তা মারফৎ তাঁর অসন্তোষ প্রকাশও করলেন ; কিন্তু ঝা খুশি। কারণ আদালত শেঠকে দোষী হিসাবে রায় দিলেন। মুখ্যমন্ত্রীর পেয়ারের লোক গেল জেল খাটতে।

চীমনভাই এবার ঝাকে মুসৌরীতে পাঠিয়ে দিলেন। ট্রেনিঙে! লোকটাকে চোখের উপর সহ্য করা যাচ্ছিল না। কিন্তু ট্রেনিং একদিন শেষ হল। ফিরে আসার পর তাকে বদলি করে দিলেন বরোদায়। এবার ঝাকে করা হল ডেপুটি কমিশনার, অ্যাডমিনিস্ট্রেশন। ভাবখানা : গুণ্ডা-বদমায়েশ চোরাকারবারিদের আর তোমাকে ধরতে হবে না, বাছা। শুধু অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের ফাইলটা দেখ। এক হিসাবে প্রমোশন, পশ্চিমবাঙলার সঞ্জয় মুখার্জির যেমন হয়েছিল।

"Frankly, I was frustrated when I was being punished for doing my duty by this promotion. As a matter of fact, I was contemplating to resign and return to engineering." [সত্যি কথা বলতে কি, ভাল কাজ করার 'অপরাধে' এভাবে আমাকে 'প্রমোশনের মাধ্যমে শাস্তি দেওয়ায়' আমি মর্মাহত হয়েছিলাম। সে সময় চিন্তা করেছিলাম পদত্যাগপত্র দাখিল করে আবার এঞ্জিনিয়ারের চাকরিতে ফিরে যাব।]

কিন্তু রাখে কেষ্ট মারে কে! সি.বি.আই. হঠাৎ বেমক্কা সন্দেহ প্রকাশ করে বসল — বোম্বাই-বিস্ফোরণে যে RDX ব্যবহৃত হয়েছে তা এসেছে পাকিস্তান থেকে গুজরাটের কোন উপকূল হয়ে। চীমনভাই তো রেগে লাল। ডেকে পাঠালেন রাজ্যের সর্বোচ্চ পুলিশ অফিসারকে। বললেন, 'তুমি একটা ব্যবস্থা কর দেখি! এসব হচ্ছে কংগ্রেসি চক্রান্ত। সি.বি.আই.-কে আমার পিছনে উস্‌কে দিয়েছে। বিস্ফোরণ হল বোম্বাইয়ের শেয়ার বাজারে, আর দোষ হল গুজরাটের জনতা দল সরকারের! বাঃ!'

পুলিশ চীফ বললেন, 'স্যার! ঠাণ্ডা মাথায় বিবেচনা করে দেখুন। আমি সি.বি.আই. রিপোর্টটা পড়েছি : আমার অনুমান ওরা ঠিক কথাই বলছে। পাকিস্তানী 'মেরিন এজেন্সি'র মাধ্যমে কোনও ভারতীয় চোরাকারবারি ইলেকট্রনিক গুডস্ বলে অসৎ পুলিশের জ্ঞাতসারে সৌরাষ্ট্র উপকূলে নামিয়েছিল ঐ 'RDX-কনসাইনমেন্ট'!

চীমনভাই বললেন, বটে! তুমি বল্‌ছ? তাহলে একজন সৎ পুলিশ অফিসারকে জামনগরের পুলিশ চীফ করে পাঠিয়ে দাও। ঐ চোরাকারবারিদের খুঁজে বার করতেই হবে। নইলে আমরা বেইজ্জৎ হয়ে যাব। তেমন সৎ আর এফিশিয়েন্ট অফিসার কেউ আছে তোমার ঝুলিতে?

— আছে স্যার। ভাদোদারার ডেপুটি কমিশনার (অ্যাডমিনিস্ট্রেশান)।

— কে সে? কী নাম লোকটার?

— ঐ যে, পি. কে. ঝা — যে ইব্‌লা শেঠকে ধরেছিল! ইব্‌লা এখন জেলে।

মুখ্যমন্ত্রী সেটা অস্থিতে অস্থিতে জ্ঞাত আছেন। তাঁর মুখখানা মা লক্ষ্মীর বাহনটির আকার ধারণ করল।

ঝাকে বদলি করা হল, জামনগরে। ডিমোশন তো আর হতে পারে না। তাই 'পে-

প্রটেকশান' দিয়ে 'স্পেশাল অফিসার — অপারেশন স্মাগলিং' (SOOS)। সেটা বিরানব্বই সালের জুন মাস। সেপ্টেম্বরের মধ্যেই ঝা হাতেনাতে ধরে ফেলল গুজরাট অঞ্চলের এক অতি কুখ্যাত মাফিয়া-ডন স্মাগলারকে : রাম গাদ্‌ভি!

না। চীমনভাই প্যাটেলের সেবার হার্ট-অ্যাটাক হয়নি! কেন হয়নি সেটাই বিস্ময়। কারণ রাম গাদ্‌ভি এতদিন ছিল মুখ্যমন্ত্রীর দক্ষিণ হস্ত, — "who had shared the platform with the Chief Minister, sitting next to him, on many occasions" [যিনি মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বহু বক্তৃতামঞ্চে আসন ভাগাভাগি করেছেন, তাঁর পাঁজর ঘেঁষে বসে।]

চীমনভাই কী করবেন স্থির করতে করতেই খবর পেলেন, ঐ পিত্তি-জ্বালানো অফিসারটি — অর্থাৎ ঝা, ইতিমধ্যে ধরে ফেলেছে চারপাঁচজন চোরাকারবারীকে, যাদের সঙ্গে এদিকে পাকিস্তানের ওদিকে বোম্বাই-বিস্ফোরণের ঘটনার প্রত্যক্ষ সংযোগ আছে।

চীমনভাই আবার ডেকে পাঠালেন পুলিশ চীফকে। জানতে চাইলেন, এসব কী হচ্ছে? এ কি সত্যি কথা? না কংগ্রেসী চক্রান্ত?

পুলিশ-চীফ বললেন, স্যার! ঝা যাদের ধরেছে তাদের মধ্যে আছে মুস্তাফা মনজু শেখ — লোকটা ছিল দাউদ ইব্রাহিমের অত্যন্ত কাছের লোক। খুব সম্ভবত সে নিজেই সৌরাষ্ট্র উপকূলে ঐ RDX কন্‌সাইনমেন্টটা পাকিস্তানী মেরিন এজেন্সি অফিশিয়ালদের কাছ থেকে গ্রহণ করেছিল। মোট কথা তার স্বীকারোক্তিতে দাউদ ইব্রাহিমের আরও অনেক কাছের লোক ধরা পড়েছে।

চীমনভাই বললেন, বুঝলাম! তা ইয়ে . . . রাম গাদ্‌ভির কী হবে? —

—ও তো স্যার নির্ঘাৎ যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড!

> Still, the Chimanbhai administration seemed to find Jha's services dispensable. It readily acceded to a routine RAW request asking for his services in the agency, a move that fell through when the then Gujarat Home Minister C. D. Patel pulled up Chimanbhai for "transferring Jha when he is close to finding vital clues to the Bombay bomb blasts conspiracy." The transfer order was cancelled. Says Jha in hindsight : "I strongly believe that commitment and drive ultimately pay in the long run."—Uday Mahurkar, Jamnagar.
>
> [তবু চীমনভাই সরকার ঝা'য়ের অপসারণের জন্যই উদ্যোগী হয়ে পড়েন। (তাঁর ব্যবস্থাপনায়) RAW ঝা-কে নিজেদের সাধারণ রুটিন কাজ করতে চেয়ে পাঠাল এবং চীমনভাই সরকার তাতে রাজি হয়ে গেলেন। কিন্তু এটা কার্যকরী

করা গেল না। মন্ত্রীসভার ক্ষমতাশালী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সি. ডি. প্যাটেল আপত্তি জানালেন। ঝা যখন বোম্বাই বোমা বিস্ফোরণের রহস্য প্রায় কিনারা করে এনেছে তখন তাকে গুজরাট ছেড়ে দিতে পারে না। বদলির আদেশ প্রত্যাহৃত হল। ঝা বন্ধুদের বলেছিলেন, "আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি স্থির সিদ্ধান্ত এবং অনলস পরিশ্রম শেষপর্যন্ত জয়যুক্ত হবেই"।]

তাই হয়েছিল। সাম্প্রতিক কালে নেপালে দাউদ ইব্রাহিমের দক্ষিণহস্ত ইয়াকুব মেনান যখন ধরা পড়ল এবং সি.বি.আই. যখন ধৃত আসামীকে দিল্লিতে উড়িয়ে নিয়ে এল তখন তার জবানবন্দি নেবার জন্য গুজরাট থেকে উড়িয়ে আনা হয়েছিস পি. কে. ঝা. আই. পি. এস.-কে, যে নাকি সি. বি. আই.-এর অধীন নয়। যাঁরা এসব বিষয়ে খোঁজখবর রাখেন তাঁরা বুঝবেন : কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা এ ভাবে পি. কে. ঝা-কে যে সম্মান দিয়েছিল তা কেন্দ্রীয় সরকার দিতে পারত না তাঁকে 'পদ্মবিভূষণে' বিভূষিত করলেও!

* * *

খেরনারের প্রসঙ্গে আসা যাক। না, ভাগলপুরে যিনি বলেছিলেন, "ওরা হিন্দু না ওরা মুসলিম ঐ জিজ্ঞাসে কোন জন? কাণ্ডারী বল, ডুবিছে মানুষ সন্তান মোর মার"— সেই মেডিকেল ডক্টর খেরনার নন। ইনি সেই 'নায়ক যখন খলনায়ক' প্রবন্ধে উল্লিখিত 'অখ্যাত' খেরনার, যিনি নাকি ...

যাক। ইন্ডিয়া টুডেতে (11.7.94) তাঁর উপর কভার স্টোরি লেখা হয়েছিল : KHAIRNAR'S CRUSADE : STRIKING A CHORD.

প্রবন্ধের শুরুটা হয়েছিল এই ভাবে :

> There has never been another like him. It is impossible to predict whether Govind Ragho Khairnar, 52, will self-destruct — or go down in history as the little man who challenged a powerful establishment and sparked off scores of forest fires against corruption and political chicanery. But there is no doubting that the son of a poor peasant who joined the Bombay Municipal Corporation in 1975 and rose to become a deputy municipal commissioner, is today a national figure who evokes adulation bordering on hero worship."
>
> [এমন মানুষ আগে কখনো দেখিনি। বাহান্ন বছর বয়সী গোবিন্দ রাঘো খেরনারের পরিণাম কী হবে, তা আগেভাগে বলা অসম্ভব! হয়তো তিনি শহীদ হয়ে যাবেন — অথবা ইতিহাসে তাঁর নামটা এভাবে লেখা থাকবে : এই মানব-

শিশুটি অসীম ক্ষমতাশালী একটা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছিল আর এখানে-ওখানে ঘনীভূত অসন্তোষের বারুদস্তূপে ক্রমাগত অগ্নিসংযোগ করে চলেছিল — দুর্নীতির বিরুদ্ধে, রাজনৈতিক প্রতারণার বিরুদ্ধে। তবে একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, দরিদ্র কৃষকের সেই সন্তানটি, যে 1975 সালে বম্বে-মিউনিসিপ্যাল করপোরেশনে চাকরি করতে এসেছিল, আর ধাপে ধাপে ডেপুটি মিউনিসিপ্যাল কমিশনার পদে উন্নীত হয়েছিল — সে আজ একজন জাতীয় বীর! সাধারণের স্তুতি প্রায় 'হিরো-ওয়ার্শিপে'র পর্যায়ে পৌঁছে গেছে।]

আপনাদের হয়তো একঘেয়ে লাগছে — ঘটনাটা কিন্তু একই জাতের। খেরনারের উপর দায়িত্ব দেওয়া হল, বোম্বাই মিউনিসিপ্যালিটির বেহাত হয়ে যাওয়া সম্পত্তি পুনরুদ্ধারের। গড়া নয়, ভাঙা। আলফন্স ডি. ডি. এ.-তে যে বিচক্ষণতা দেখিয়েছিলেন খেরনারের স্বভাব সে-জাতের নয়। উনি সেই বিহারের পি. কে. সিনহা, বাঁকুড়ার রীনা ভেঙ্কটরমনের মতো ধরে নিলেন অন্যায় যখন করছি না, অসত্যের পথে যাচ্ছি না তখন আবার অনুমতি নেবার কী আছে? কার অনুমতি নেব? সব তো চোর!

অচিরেই বাধল সংঘাত। আদেশ এল, "A.B.C.-র বাড়ি ভেঙে বেশ করেছ ; কিন্তু 'D.'-এর উপর নোটিস প্রত্যাহার করে নাও। আর E.F.G.-র বাড়ি বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দিলে আমাদের আপত্তি নেই ; কিন্তু H.-এর সম্পত্তিতে হাত দেওয়া চলবে না। ও আমাদের পার্টির ডোনার।"

খেরনার ভ্রূক্ষেপও করলেন না। চলতে থাকে ধ্বংসকার্য। বে-আইনি দোকান-বাড়ি-গুদাম! অগত্যা সাসপেন্ড করতে হল দুর্বিনীত কর্মচারীকে — চুরানব্বই সালের জুন মাসে। খেরনার এবার প্রচারে নামলেন — দুর্নীতির বিরুদ্ধে, অপরাধজীবীদের বিরুদ্ধে, শারদ পাওয়ারের বিরুদ্ধে। অত্যল্প সময়ের মধ্যে তিনি মহারাষ্ট্র ছাপিয়ে গুজরাটেও জনপ্রিয় হয়ে উঠলেন, ডাক আসতে লাগল কাশী থেকে, চণ্ডীগড় থেকে, কানপুর থেকে। দুর্নীতির বিরুদ্ধে বিভিন্ন রাজ্যে গড়ে উঠেছে যেসব সংগ্রাম পরিষদ, সংগ্রামী সমিতি তারা তাঁকে বক্তৃতা দিতে ডাকে। উনি যাতায়াতের ট্রেনভাড়া নেন — আর কিছু গ্রহণ করেন না। টাটা সন্স-এর ডিরেকটার ননি পাল্‌কিওয়ালার দেওয়া দশ হাজার টাকার চেক উনি সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। রাজ আস্‌রোন্ধকর লিখছেন, "In the backward district of Akola and Amravati, villagers walked 8 Km to stop and garland him on the highway. Men lunge forward to touch him, women want him to bless their babies [আকোলা আর অমরাবতী জেলার অনুন্নত পল্লীবাসীরা সাত-আট কিলোমিটার হেঁটে সদর সড়কের উপর সার দিয়ে দাঁড়িয়েছিল — ওঁর গাড়িকে রুখতে, ওঁকে মালা পরাতে! পুরুষেরা চাইছিল ওঁকে স্পর্শ করতে, মেয়েরা চাইছিল উনি যেন তাঁদের

সন্তানকে আশীর্বাদ করে যান।]"

বলা বাহুল্য সবাই আশঙ্কা করছিল শারদ পাওয়ায়ের গুণ্ডা বাহিনী অচিরেই তাঁকে খতম করে দেবে। তাই ব্যবস্থা নিলেন মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং। সাময়িকভাবে বরখাস্ত মিউনিসিপ্যাল কর্মীর জন্য নিযুক্ত হল Z-ক্যাটাগরির নিরাপত্তা কর্মী! বিচক্ষণ শারদ পাওয়ারের আশঙ্কা হল, পথ দুর্ঘটনাতেও যদি খেরনার হত হন সবাই বলবে ওটা তাঁর অপকীর্তি।

চাপ নানা দিক থেকে আসছিল। অতি উচ্চপযার্য়ের কিছু কংগ্রেস (আই) নেতা ওঁর কাছে গোপন প্রস্তাব পাঠালেন — খেরনার যদি তাঁর বক্তৃতায় শুধুমাত্র মুখ্যমন্ত্রীকেই আক্রমণ করেন, আর কারও নাম না করে, তাহলে ওঁকে চাকরিতে ফিরিয়ে নেবার ব্যবস্থা হবে। খেরনার এ প্রস্তাব সরাসরি প্রত্যাখ্যান করলেন। বললেন, আমার সংগ্রাম রাম-শ্যাম-যদুর বিরুদ্ধে নয় — দুর্নীতির বিরুদ্ধে। রাম-শ্যাম-যদু দুর্নীতিমুক্ত না হলে আমি কেন ছেড়ে কথা বলব? হলে তো বলবই!

বিধানসভায় বিরোধীপক্ষের প্রশ্নের জবাবে শারদ পাওয়ার বলেছিলেন, "দাউদ ইব্রাহিম বা তার কোনও আত্মীয়ের নামে বোম্বাই শহরে কোনও বাড়ি নেই। সুতরাং আমার জ্ঞাতসারে গড়ে উঠেছে কি না এ প্রশ্ন অবান্তর। বোম্বাই শহরে দাউদের কোনও আত্মীয়ের সম্পত্তি আছে এটা যদি কেউ প্রমাণ করতে পারেন তবে আমি তাঁকে পাঁচ লাখ টাকা পুরস্কার দেব।"

দুদিন পরেই খেরনার একটা লিস্ট সাংবাদিকদের দাখিল করেন। বলেন, "এই তালিকা অনুযায়ী প্রতিটি সম্পত্তি দাউদ অথবা তার আত্মীয়ের। এই তালিকা আমি ইতিপূর্বেই ডিরেকটরেট অব রেভিন্যু ইন্টেলিজেন্সকে দাখিল করেছি। তাঁরা চেপে বসে আছেন। দেখুন, পাঁচ লাখ টাকা রোজগার করতে পারেন কি না। পেলে আমাকে লাড্ডু খাইয়ে দেবেন।"

খেরনারের মূল বক্তব্য : বোম্বাই শহরে বে-আইনি ভাবে 'প্রাসাদ-বাড়ি-ঝোপড়ি' যা কিছু গড়ে উঠেছে তার বর্তমান বাজার দর 1,400 কোটি টাকা এবং এর শতকরা পঁচাত্তর ভাগ শারদ পাওয়ারের পোষা মাস্‌লম্যান বা গুণ্ডা দলের। বাকি পঁচিশ ভাগ ওঁকে চাঁদা দেয়।

এই বিদ্রোহী সাস্‌পেন্ডেড 'অখ্যাত' মানুষটির বিষয়ে রবিবাসরীয় আনন্দবাজারের বক্তব্য শুনেছেন ; এবার ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রান্তের কিছু পণ্ডিতের মতামত শুনুন — আক্ষরিক অনুবাদে :

(1) "খেরনার যা বলছেন তা সারা ভারতের সাধারণ সৎ মানুষের কথাই। কিন্তু এই দুর্নীতি পরিবৃত-সমাজে তারা সে কথা বলতে পারে না। এটাই খেরনারের

জনপ্রিয়তার হেতু।"

— ডঃ বি. এ. পারেখ / ভাইস-চ্যান্সেলার/দক্ষিণ গুজরাট বিশ্ববিদ্যালয়।

(2) "গণতন্ত্রের যখন নাভিশ্বাস উঠেছে তখন খেরনার একটি অক্সিজেন সিলিন্ডার। গণতন্ত্র বোধকরি এ যাত্রা বেঁচে গেল।"

—চুনিভাই বৈদ্য, গান্ধীশিষ্য, জয়প্রকাশের ব্যক্তিগত বন্ধু, বৃদ্ধ এবং আমেদাবাদের 'ভ্রষ্টাচার প্রতিকার মঞ্চে'র স্রষ্টা ও আহ্বায়ক।

(3)"খেরনার গণনয়নের ক্যাটার‍্যাক্ট অপারেশন করে দিয়েছেন। এখন আমরা চোখ মেলে ভ্রষ্টাচারকে পরিষ্কারভাবে দেখতে পাচ্ছি।

—যশোবন্ত শুক্লা, গুজরাটী সাহিত্যিক এবং শিক্ষাবিদ।

(4) "একজন সৎ, অপরিচিত, সাধারণ মিউনিসিপ্যাল কর্মী থেকে রাতারাতি জি. আর. খেরনার একজন মহাকাব্যের বীরের মতো সুপরিচিত হয়ে উঠেছেন — শুধু বোম্বাইতে নয় — যেখানে যেখানে অপশাসকেরা মস্তানবাহিনীর সাহায্যে শাসনের নামে শোষণ চালিয়ে যাচ্ছে : দুর্নীতির নরক বিহার, আদিবাসী-দলিত অধ্যুষিত মধ্যপ্রদেশ, জয়ললিতার স্বার্থসুরক্ষিত তামিলনাড়, অথবা মার্ক্সিস্ট উৎপীড়িত পশ্চিমবঙ্গ। খেরনার এই একক সংগ্রামে চোরাকারবারী রাজনীতিকদের সামনে দাঁড়িয়েছেন — তাঁর চাকরির নিরাপত্তার, পরিবারের বা জীবনের নিরাপত্তাকে উপেক্ষা করে।"

—এম. রহমন, বোম্বাই — ইন্ডিয়া টুডে (1.1.7.94)।

(5) "সাধারণ মানুষ অনেক কিছু বুঝতে পারে না — বোফোর্স, শেয়ার কেলেঙ্কারি, টাডা ইত্যাদি — কিন্তু তারা এটুকু জেনে গেছে যে 'খেরনার' শব্দটার অর্থ 'ধর্মযোদ্ধা'। সে হচ্ছে ছেলেবেলায় পড়া রাজপুত্তুর, যে বিরাটকায় দৈত্যের সামনে দাঁড়িয়েছিল, খাপখোলা তলোয়ার হাতে।"

—রাম উদগর মাহাতো, পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক।

(6) "এতদিন পর্যন্ত 'বুরোক্র্যাট' বলতে আমরা বুঝে নিতাম একদল ভীরু কলমজীবী 'ইয়েস-ম্যান'! খেরনার একটা নতুন পথের সন্ধান দিলেন। সৎ আমলা যাঁরা মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার সাহস পাচ্ছিলেন না, তাঁদের সামনে একটা উদাহরণ রাখলেন।"

—আর. এ. যাদব, চেয়ারম্যান, বিহার পাবলিক সার্ভিস কমিশন।

* * *

'ডেভিড বনাম গোলিয়াথের' দ্বৈরথ-সমরের বর্ণনাটা থামিয়ে, আসুন আর একটা যুদ্ধ প্রাঙ্গণে আপনাদের নিয়ে যাই। এটাও কিন্তু একই জাতের লড়াই। দ্য সান্ডে

অবজার্ভারে (10.9.94) অল্লা টেলিস যে প্রবন্ধটা লিখেছিলেন তার নাম ঐ একই ধরনের : The Mosquito & the Elephant [মচ্ছড় ঔর হাথি]।

উল্লাস যোশী। আজ্ঞে না, এবার আর থোড়-বড়ি-খাড়া নয়। কৃষক পরিবার নয়, গাঁয়ের ছেলেও নয়। বাবা ছিলেন সান্তাক্রুজের বিখ্যাত পোদ্দার স্কুলের প্রিন্সিপ্যাল — যেখানে ইন্দিরা গান্ধী ছেলেবেলায় কিছুদিন ছাত্রী ছিলেন। ওঁর মাও একটি মারাঠী হাইস্কুলের শিক্ষয়িত্রী। ঠাকুর্দা ছিলেন মারাঠী সাহিত্য সম্মেলনের প্রধানসচিব। উচ্চমধ্যবিত্ত পরিবারের যোশী বোম্বাই থেকে এম. এ. পাশ করেন সাতষট্টিতে ; তারপর আই. পি. এস.। ভূতের কিল খাবার জন্য পিঠ নিশ্চয় সুড়সুড় করছিল। সেটা খেতে শুরু করলেন '88-'89-এ। উনি তখন বোম্বাইয়ের পূর্বপ্রান্তে একটি জেলার এস. পি.। তাঁর 'অত্যাচারে' অপরাধজীবীরা তাদের দীর্ঘদিনের স্বাধীন ব্যবসা একে একে গুটিয়ে নিতে বাধ্য হল। যারা হল না তারা কারান্তরালে যেতে বাধ্য হল। সারা ভারতে এসব ক্ষেত্রে যা হয় তাই হল : অপরাধজীবীরা সদলবলে দরবার করল দুর্নীতি-নির্ভর রাজনীতি-ব্যবসায়ীদের সঙ্গে। যোশী একবছর না ফুরতে বদলি হয়ে গেলেন, যদিও সচরাচর আই. পি. এস.-রা এক স্টেশনে তিনবছর থাকেন। তবে ইয়ে . . . এক স্টেশনে তিনবছর থাকার যোগ্যতা থাকা চাই তো। এলেন থানে শহরে। টিকতে পারলেন না। আবার বদলি। এবার থানে (রুরাল)। এখানে ছিলেন মাত্র সাড়ে তিন মাস — আগস্ট '91 থেকে ডিসেম্বর '91।

ইতিমধ্যে খাতা-কলমে প্রমোশন 'ডিউ' হয়েছে। পোস্টিং হল ডি. আই. জি. কোঙ্কন রেঞ্জ। বিরাট এলাকা — থানে, ভাসাই, ভিবার, মুর্বাদ, কাশ্‌মিরা, পালঘর, উল্লাসনগর — সাতটি জেলা।

> "Murbad was under the control of the Arjun Shelke gang, the 'Golden Gang' controlled Palghar, and the Asif Patel gang ruled over Kashmira. Extortion and goondaism was the name of their game. Two Thakur brothers, Jayendra Bhai and Hitendra Bhai, had their fingers in every underhand activity in the Vasai-Vivar area, from controlling water tankers to land grabbing through large scale use of muscle and money power."
>
> [মুর্বাদ জেলাটা ছিল 'অর্জুন শেল্‌কে' মস্তান-পার্টির কব্জায়, পালঘর জেলা যে গুণ্ডাদলের কব্জায় তার নাম 'স্বর্ণসঙ্ঘ', আর কাশ্‌মিরার যাবতীয় তোলা আদায় করত আসিফ প্যাটেল। গোটা এলাকার মাফিয়ারাজের নাম : জয়েন্দ্র আর হিতেন্দ্র ঠাকুর। বলপ্রয়োগ অথবা অর্থপ্রয়োগে এরা ছিল গোটা এলাকার মালিক।]

যোশী এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে নিতেই শারদ পাওয়ার ওদের দুজনকে রাতারাতি কংগ্রেসের বাই-ইলেকশানের মাধ্যমে এম. এল. এ. বানিয়ে দিলেন। যোশী অগত্যা এম. এল. এ. ছেড়ে উল্লাসনগরের মাফিয়ারাজ 'পান্নু কালানি'র বিরুদ্ধে অভিযান চালালেন। এবার ডাক পেলেন বোম্বাইয়ে। মুখ্যমন্ত্রীর ইচ্ছায় তাঁর পলিটিক্যাল সেক্রেটারি যোশীকে 'বিনীত অনুরোধ' করলেন 'পান্নু কালানি'র পিছনে না লাগতে। যোশী তাঁকে সরাসরি জানিয়েছিলেন, সরি! সুরেশ পাপ্পু কালানি'র বিরুদ্ধে যা চার্জ তা তুলে নেবার ক্ষমতা আমার নেই। আমি ইতিপূর্বেই তা সি. বি. আই.কে জানিয়েছি।

এবম্ শ্রুয়তে : শারদ পাওয়ার প্রচণ্ড ক্রোধান্বিত হয়ে পড়েন।

তাঁর মতে ডি. আই. জি. কোঙ্কন রেঞ্জ মুখ্যমন্ত্রীকে না জানিয়ে কোন রিপোর্ট সরাসরি সি. বি. আই.কে পাঠাতে পারেন না। এ নিয়ে অবশ্য তিনি কোন কথা বললেন না। রাতারাতি রাজ্যের 'অ্যান্টিকরাপশান ব্যুরো' (ACB) যোশীকে শো-কজ করল। তার বিরুদ্ধে দু-দুটি চার্জ। এক : এম. এল. এ. জয়েন্দ্র ভাই আর হিতেন্দ্র ভাই ঠাকুর যৌথ আবেদন করেছেন যে, উল্লাশ যোশী তাঁদের কাছে পঁচাত্তর লক্ষ টাকা দাবী করেছিলেন — না দিলে 'টাডায়' ধরিয়ে দেবেন ভয় দেখিয়ে। দুই : যোশী নাকি একজন আন্তর্জাতিক হেরোইন পাচারকারীকে সাহায্য করেছেন, তাকে আমেরিকায় পালিয়ে যেতে।

কেস উঠল আদালতে। যোশী প্রতিবাদীর কাঠগড়ায়। অধম বিরচিত 'মান মানে কচু' যোশী নিশ্চয় পড়েননি ; কিন্তু হয়তো ফ্রেডারিক ফোরসাইথ-এর 'প্রিভিলেজ' গল্পটা পড়েছিলেন। তিনি জানতেন, প্রতিবাদী কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে যখন আত্মরক্ষা করে তখন আইন তাকে কিছুটা বাড়তি সুবিধা দেয়। প্রথম দরখাস্তে আত্মসমর্থন করতে যোশী তাঁর এফিডেবিটে বলেছিলেন, "অ্যান্টি-করাপশান-ব্যুরোর প্রশ্নের সত্য জবাব দিতে গেলে নিম্নদরখাস্তকারী অনিবার্যভাবে কিছু অত্যন্ত ক্ষমতাসম্পন্ন রাজনৈতিক নেতার ক্রোধবহ্নির শিকার হবেন। এজন্য তিনি সত্যপ্রকাশে বিরত থাকছেন।"

বোম্বাই হাইকোর্ট তা শুনল না। বলল, "সেই অত্যন্ত ক্ষমতাসম্পন্ন রাজনৈতিক নেতাদের নাম করুন। আদালত তাঁদের কাছ থেকে অনুমতি আনিয়ে নেবেন।"

কী মুশকিল! এ তো দেখছি শাঁখের করাত। যোশী আদালতের কাছে সময় চাইলেন। দেখা করতে চাইলেন মহারাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পুলিশ অফিসার ডি. ডি. শিবাজীরাও বারা-ওকরের সঙ্গে। ডি. জি. দেখাই করলেন না — বললেন, "ব্যাঘ্রস্পর্শে অষ্টাদশ ক্ষত। ব্যাপারটি সাব জুডিস। আমি ওতে নাক গলাব না।"

ফলে যোশী নাক গলাতে চাইলেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীর খাশকামরায়। সেখানেও পাত্তা পেলেন না।

'দুত্তোর নিকুচি করেছে' বলে অ্যাডভোকেটের তৈরী করা 'রিভাইজড্ এফিডেভিটে' স্বাক্ষর করে দাখিল করলেন কোর্টে।

অ্যাটম বোমা ফাটল এবার আদালতে! খেরনার পথে ঘাটে যেসব কুকথা বলে বেড়াচ্ছিলেন — বিনা সাক্ষ্যপ্রমাণে, বিনা দলিল দস্তাবেজে, এবার তাই আদালতে দাখিল করা হল একজন আই. পি. এস. অফিসারের এফিডেভিটে। সাক্ষ্য প্রমাণ, নথী পত্র-দলিল দস্তাবেজ সমেত। কেঁচো খুঁড়তে এক ঝাঁক কেউটে!

প্রমাণিত হল, উল্হাসনগরের কুখ্যাত অপরাধজীবী সুরেশ পাপ্পু কালানি — যাঁকে মুখ্যমন্ত্রীর সুপারিশে কংগ্রেস টিকিট দিয়ে ইতিমধ্যে এম. এল. এ. বানিয়ে দেওয়া হয়েছে — সেই কালানির একটি 'হলিডে রিসর্ট' আছে থানেতে। সেখানে কালানি দুজন পাঞ্জাবের উগ্রপন্থীকে লুকিয়ে রেখেছিলেন। যোশী তার পাঞ্জাব-পুলিশের সহযোগীদের নিয়ে সেখানে চড়াও হবার আগেই উপরমহলের কারসাজিতে অপরাধীদ্বয়ের পালিয়ে যাবার সুযোগ করে দেওয়া হয়। এই রকম অনেক অনেক কেস তুলে ধরলেন, যুক্তির নিরিখে, যার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত হয়ে যাচ্ছে একটি প্রখ্যাত নাম : শারদ পাওয়ার! এম. এল. এ. পাপ্পু কালানি নিজের প্রাণ বাঁচাতে জলে ডোবার আগে জড়িয়ে ধরল একটা শক্ত খুঁটি : শারদ পাওয়ার! প্রাক্তন ডি. জি. এস. রামমূর্তির অপকীর্তির তালিকা বাধ্য হয়ে ফাঁস করতে হল প্রতিবাদী যোশীকে — আত্মরক্ষার্থে — ACB—উত্থাপিত প্রশ্নের জবাব দিতে! রামমূর্তি কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে বেগতিক দেখে ঐ হেভিওয়েট রক্ষাকর্তাকেই জড়িয়ে ধরলেন : শারদ পাওয়ার।

এ তো মহা ঝামেলা! সব গাওনার ধুয়ো যে, 'ঘুরে-ফিরে সেই বাব্লা গাছ'! ছিল ছোট ছোট কেঁচো, এখন সবকটা ফণা-তোলা কেউটে! শারদ পাওয়ার দিল্লি-বোম্বাই করছেন। কী করে এই চরম বিপদ থেকে রক্ষা পাবেন স্থির করে উঠ্তে পারেন না।। আর ওদিকে সেই সাস্পেন্ডেড নেংটি ইঁদুর শালপাতার ভেঁপুটা বোম্বাইয়ের পথে পথে বাজিয়েই চলেছে : "গলি গলিমে শোর হ্যয় . . শারদ পাওয়ার চোর হ্যয়।"

এই ব্রাহ্মমুহূর্তে ডুগডুগি হাতে কল্কি অবতারের অকাল আবির্ভাব : "বন্ধ করো সব কাম/কহো আল্লাহ্, কহো রাম/ইমানদার লোক লে পরনাম/ঔর ধান্দাবাজ যাও আপনা ধাম/"

"ডুগডুগ . . ডুগডুগ.. আব্ভি শুরু হোগা চুনাও কি খেল।"

তাই হল। কল্কি অবতারের বরে গ্রাম-গ্রামান্তরের নেংটিসারের দল, ঘাটকোপারের বস্তিবাসী ঠেলাওয়ালা, অটোওয়ালা এল ভোট দিতে। ওরা সবাই একদিনের আবুহোসেন : হঠাৎ রাজা।

হল ভোট। হল গিনতি। মহারথী শারদ পাওয়ার — বৃদ্ধ প্রধানমন্ত্রীর ভালমন্দ কিছু

হলে যাঁর নাকি গোটাভারতের শাসনদণ্ড হাতে তুলে নেবার সম্ভাবনা—তিনি তলিয়ে গেলেন আরব সাগরে!

'নেংটি ইঁদুর' কিন্তু টিকে আছে। আছে 'মচ্ছড়'ও!

* * *

আপনারা দয়া করে আর একবার পাতা উলটে সেই রবিবাসরীয় প্রবন্ধটা দেখবেন?: **'নায়ক যখন খলনায়ক'**।

পরের সপ্তাহে পরপর তিনদিন ঐ হেডিঙে পনের-বিশখানি চিঠি প্রকাশিত হয়েছিল, আনন্দবাজারের সম্পাদকীয় পৃষ্ঠায়। 'সম্পাদক সমীপেষু'-মার্কা চিঠি। আমি সেগুলি খুব খুঁটিয়ে পড়ে দেখেছি — এই কৈফিয়ৎটি লিখতে হবে বলে। আমি কতকগুলি সাধারণ সূত্র লক্ষ্য করেছি — সাধারণ পাঠকমানসকে সম্‌ঝে নিতে। যথা —

● ঐ পনের-বিশখানি পত্রলেখকের প্রত্যেকেই প্রবন্ধ লেখকের সঙ্গে একমত। তাঁকে, এবং আনন্দবাজার পত্রিকাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। বিষয়টি তুলে ধরায়।

● একজনও পত্রলেখকের সন্ধান পাওয়া যায়নি যিনি মাননীয় কলিমুদ্দিন সামশ-সাহেবের সঙ্গে ['রাজনীতিবিদেরা দুর্নীতিপরায়ণ হতেই পারেন না' (যেমন গুডফ্রাইডের ছুটিটা রোব্বারে পড়ে নষ্ট হতেই পারে না)] অথবা প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সির সঙ্গে ['রাজনীতিবিদ অপেক্ষা সাংবাদিকদের মধ্যে খলনায়ক বেশি দেখেছি' (তা তো হবেই, সাংবাদিকদের কিছু পরীক্ষা পাশ-টাশ করতে হয়, রাজনীতিবিদদের বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলটা অক্ষত থাকলেই তিনি উপার্জনক্ষম 'দেশসেবক')] একমত।

● একজনও পত্রলেখকের মনে এ-প্রশ্ন জাগেনি : টি. এন. শেষন কলকাতাবাসিনী অভিজাত মহিলার বাগিচায় লন-জ্বালানো হাতে-গরম বক্তৃতা ছাড়া আর কোথাও কিছু কি বলেছেন? খলনায়কদের বিরুদ্ধে আজ যে ভারতব্যাপী অসন্তোষ তাতে ঐ শেষনের কি কোন সামান্যতম অবদানও নেই? কেউ তা জানতে চাননি!

● একজনও পত্রলেখক জানতে চাননি : বোম্বাইয়ের বরখাস্ত হয়ে থাকা [প্রসঙ্গত বর্তমানে তিনি সাসপেন্ডেড নন, বরখাস্ত হয়ে যাওয়া প্রাক্তনকর্মী, যেহেতু বি. জে. পি. বা বাল থ্যাকারের সুরে গাওনা গাইতে তিনি নারাজ] 'অখ্যাত' খেরনার — যাঁর প্রসঙ্গে লেখক শুধু আশ্চর্যান্বিত নন, দুঃখিতও হন — তাঁকে চাইনিজ ইংকে অবগাহন স্নান করানোর মূল উদ্দেশ্যটা কী?

● সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা, কয়েক লক্ষ পাঠকের ভিতর থেকে প্রতিনিধিমূলক যে পনের-বিশজন পত্র লিখেছেন তাঁদের মধ্যে কারও মনে এই কৌতূহলটা জাগল না : ভূপালের মার্বেল প্যালেসের মালিক যদি অর্জুন সিং হন, তাহলে দক্ষিণ কলকাতার আড়াই হাজার স্কোয়ার ফুট-কভার্ড এরিয়ার প্রাসাদের মালিক কোন্ কীর্তিমান বিধায়ক?

অথবা ষোলোজন সেবক খিদ্‌মৎ খাটে কোন্ ভাগ্যবান অবসরপ্রাপ্ত-সাংসদের ভদ্রাসনে? কেউ তা জানতে চাইল না? কারও কোনও কৌতূহল জাগ্রত হল না?

● কারও মনে এ-প্রশ্নটাও জাগেনি : নায়ক খলনায়কে পরিবর্তিত হয় কার অঙ্গুলি-হেলনে? ভারতব্যাপী এই অপশাসনের মূল নিয়ামক কারা? যাঁরা এই খলনায়কদের বানতলার হাটে কিনে বিরাটির হাটে বেচতে পারেন, তাঁরা কে? যেহেতু তাঁরা সংবাদপত্রে পাতাজোড়া বিজ্ঞাপন দেন, নিত্যনতুন কন্‌জিউমার গুড্‌স-এর পরিচয় দিতে অর্ধনগ্না সুন্দরীদের কালার্ড ছবি ছাপেন, তাই তাদের নামধাম উল্লেখ করা বারণ? তাঁরা সবাই : ভাশুর ঠাকুর?

চিঠিগুলি নিশ্চয় 'সম্পাদক সমীপেষু' সেকশনে বসে লেখা নয়! তার মানে দেশের লক্ষ লক্ষ পাঠক-পাঠিকা বোকা হাবা! খবরের কাগজ যা গেলায়, তাই গেলে।

সেক্ষেত্রে, রাগ করবেন না, এ-দেশ খলনায়কদ্বারা শাসিত হওয়াই তো স্বাভাবিক—

Every country gets the government it deserves!

কিন্তু না। কিছু ভুল হল। অশুদ্ধ তথ্যসমূহের ভিত্তিতে আমি বোধহয় একটা ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত নিতে চলেছি। ঠিক যেভাবে ভুল 'ডাটা'র উপর নির্ভর করে আনন্দবাজার পত্রিকার নিজস্ব সাংবাদিক ভ্রান্ত সিদ্ধান্তে এসেছিলেন। উড়িষ্যা-নির্বাচনের মাত্র এক সপ্তাহ আগে কটক-পুরী-ভুবনেশ্বরে দশ-বিশজন লোকের সঙ্গে কথা বলে রিপোর্ট পাঠিয়েছিলেন : "পুরীমন্দিরের গর্ভগৃহ থেকে 'কালিয়া'-জগন্নাথের দারুমূর্তি এবং ভুবনেশ্বরে মুখ্যমন্ত্রীর গদী থেকে 'কালিয়া'-বিজুর ভাবমূর্তি অপসারণ করা একই রকম অসম্ভব কাজ।"

আমিও বোধহয় এইমাত্র সেই জাতের ভুলই করলাম। আনন্দবাজারে প্রকাশিত ঐ পনের-বিশখানি পত্র নিশ্চয় কয়েক লক্ষ পাঠকের চিন্তাধারার প্রকৃত প্রতিফলন করছে না। হয়তো ঐ **নায়কেরা যখন খলনায়ক** নিবন্ধের উপর পাঁচ-সাতশ "সম্পাদক সমীপেষু" প্রতিবেদন এসেছিল। পত্রিকার ঐ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মী তার ভিতর বেছে বেছে খান পনের-বিশ ছাপতে পাঠিয়েছিলেন। ফলে, এটি সেই বিশেষ নির্বাচকের মানসিক প্রতিফলন। তিনি সেই কয়খানি পত্রই বেছে নিয়েছিলেন যা ছাপা হলে তাঁর 'বস' খুশি হবেন। কাগজের কর্তৃপক্ষ খুশি হবেন।

অর্থাৎ, পত্রিকা যা 'গেলায়' পাঠক নির্বিচারে তাই 'গেলে না!'

* * *

এতক্ষণে মনে হচ্ছে বক্ষ্যমাণ 'কৈফিয়ৎ'-এরও একটা পৃথক কৈফিয়ৎ ক্রমে অপরিহার্য হয়ে পড়ছে। বলতে পারেন : সেটা 'কৈফিয়ৎ-এর 'কৈফিয়ৎ'।

দেখুন, এটা আমি লিখতে শুরু করি এ বছর কলকাতায় বই মেলা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে—পূজার জন্য লেখার চাপ আসতে শুরু হবার আগেই এটা শেষ করতে চেয়েছিলাম। পারিনি। এখন মে মাস চলছে, 'মন্‌সুন' আসেনি। তবু শেষ হয়নি 'কৈফিয়ৎ'। এই কয়মাসে এ দেশের রাজনৈতিক ইতিহাস স্থানে স্থানে আমূল বদলে গেছে। তাই ভবিষ্যতের পাঠক এ 'কৈফিয়তে' কিছু কিছু অনুপপত্তিতে বিভ্রান্ত হবেন। ধরুন, প্রথম দিকে আমি শারদ পাওয়ারকে মহারাষ্ট্রের এবং বিজু পট্টনায়ককে উড়িষ্যার হর্তাকর্তাবিধাতা রূপে চিহ্নিত করেছিলাম—এখন যেমন তামিলনাড়-এ আছেন সুব্রহ্মণ্যম স্বামী কর্তৃক অভিযুক্তা শ্রীমতী জয়ললিতা, পশ্চিমবঙ্গে আছেন নৃপেন চক্রবর্তী কর্তৃক অভিযুক্ত কমরেড জ্যোতি বসু— অথচ এই কৈফিয়ৎ যখন শেষাশেষি পর্যায়ে পৌচেছে ততদিনে শারদ পাওয়ার আরবসাগরে এবং বিজু পট্টনায়ক বঙ্গোপসাগরে বিসর্জিত—বোধকরি ভোটারদের উচ্চারিত 'নপুনরাগমনায়চ' মন্ত্রোচ্চারণ সহ। প্রথম দিকে বাঁকুড়া শহরবাসীর কাছে একটা আবেদন রেখেছিলাম, তাঁদের ডি. এম. শ্রীমতী রীনা বেঙ্কটরামনকে আগামী বারোয়ারী শারদীয়া পূজামণ্ডপে একটা সম্বর্ধনা জানাতে—এখন বুঝছি সেটা অসম্ভব। রাজনীতি-ব্যবসায়ী দেশসেবকদের প্রতিবন্ধকতায়। স্মাগলার-স্বর্গ শিলিগুড়ি থেকে যেভাবে নজরুল ইসলাম চব্বিশ ঘণ্টার নোটিসে 'রুটিন-ট্রান্সফারে' বিতাড়িত হয়েছিলেন, ব্যারাকপুর থেকে এস. ডি. পি. ও. সঞ্জয় মুখার্জীকে যেমন রাতারাতি ঐ 'রুটিন ট্রান্সফারের' মাধ্যমেই লর্ড সিন্‌হা রোডের বাতানুকূল করা কক্ষে ডাম্প করা হয়েছিল, ঠিক সেভাবেই বিনা মেঘে বজ্রপাতের 'রুটিন ট্রান্সফার' অর্ডার পেয়ে গেছেন রীনা বেঙ্কটরামন! দীর্ঘ তিনমাসের ছুটি নিয়ে তিনি বাঁকুড়া থেকে বিতাড়িতা। তাঁর ফেয়ারওয়েল হয়েছিল কিনা জানি না। হয়ে থাকলে জনগণের ভোটে নির্বাচিত সূর্পপাণি প্রতিনিধিরা সেখানে নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন কিনা, বিতাড়িতা জেলা সমাহর্তাকে একটু বিদায়ী-বাতাস খাওয়াতে—তাও জানি না।

এই মহীয়সী মহিলার সংগ্রামের কথা ইতিহাসে লিপিবদ্ধ হয়ে থাকা প্রয়োজন বলে মনে করি। তাই সাংবাদিক অজয় বিশ্বাস পরিবেশিত তথ্যের (আনন্দবাজার 18.2.95) উপর নির্ভর করে এটুকু লিখছি :

বাঁকুড়া 17.2.95— দিল্লিতে আই. পি. এস. কিরণ বেদী যেমন 'ক্রেন' (আপনার অবগতির জন্য জানাই— হে পাঠিকা! কিরণ বেদীও 17.2-এর পরে রাজনীতি-ব্যবসায়ীদের আদেশে দিল্লি থেকে বিতাড়িতা) বাঁকুড়ায় আই. এ. এস. রীনা বেঙ্কটরমন তেমনি হয়েছেন 'বুলডোজার লেডি'। পুরনো শহরের ঘিঞ্জি হয়ে যাওয়া রাস্তাঘাটকে জবরদখল মুক্ত করতে গোটা-তিনেক বুলডোজার নিয়ে সাফাই অভিযানে নামার পরেই সাধারণ মানুষ তাঁকে সাবাস জানিয়েছিল। অন্যদিকে তিনি ততটাই ত্রাসের কারণ হয়ে

উঠেছেন পুরসভার কর্তাদের কাছে। 'ত্রাস' এতটাই যে, পুর-চেয়ারম্যান কংগ্রেসের শান্তি সিংহ মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু থেকে পুরমন্ত্রী অশোক ভট্টাচার্য পর্যন্ত সকলের কাছেই চিঠি দিয়ে 'বুলডোজারের' গতি থামানোর জন্য আর্জি জানিয়েছেন। তা না জানিয়ে উপায়ও ছিল না। কারণ তাঁদের সম্মতির অপেক্ষায় না থেকেই বুলডোজার অভিযান চলেছে। লালবাজার-নতুনবাজার থেকে মাচানতলা পর্যন্ত সব রাস্তাঘাটেরই বে-আইনি শেড, সাইনবোর্ড, সিঁড়ি এমনকি গোদরেজ কোম্পানির রাস্তা জোড়া শো-রুমও ভাঙা পড়েছে। বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে পুরসভার তৈরী নেহরুপার্ক মার্কেট কমপ্লেক্স পর্যন্ত।"

কারণ আছে। এ সবই বেআইনি কাজ। ডি. এম. এ.-র বক্তব্য "ঐ নেহরু পার্কের জমি কোনও দিনই পুরসভার ছিল না। ওটা সরকারি জমি, এবং ঐ জমি ঐ-ভাবে বেদখল হয়ে যাওয়ায় অডিটেও যাতা ভাষায় অবজেকশান দেওয়া হয়েছে। কল্যাণী চৌধুরী ডি. এম. থাকার সময় থেকে বার বার পুরকর্তাদের চিঠি দেওয়া হচ্ছে। ওরা শুনছে না। ওরা স্টল-পিছু তিরিশ-চল্লিশ হাজার টাকা করে সেলামি নিয়েছে। সরকারকে এক পয়সা দেয়নি। আই ওয়ান্ট টু স্টপ দিস থিভারি। ওরা সব্জি বাজার করার জন্যে একশ জনের কাছ থেকে টাকা নিয়ে বসে আছে। অথচ ঐ সামান্য জায়গায় চল্লিশটার বেশি স্টল হতে পারে না। ... বিশ্বাস করুন, কোথাও ভাঙার কাজে আমাকে হাত লাগাতে হয়নি। আমি গিয়ে দাঁড়াতে ওঁরা নিজেরাই বেআইনি শেড ভেঙে দিয়েছেন। ...কাজটা যদি খারাপই করব, তবে ওঁরা একটা বন্‌ধ্ ডাকার সাহস পেলেন না কেন? আসলে কী জানেন? আমার পিছনে যে সাধারণ মানুষের সমর্থন রয়েছে, সেটা ওঁরা বুঝে গেছেন।"

নিষ্ঠাবান সন্দিগ্ধ সাংবাদিক ডি. এম.-এর ঘোষণা আপ্তবাক্যের মতো মেনে না নিয়ে অতঃপর ঐ সাধারণ মানুষদের দ্বারস্থ হন, এবং এই 'বুলডোজার লেডী' সম্বন্ধে তাঁদের মতামত সংগ্রহ করেন। যে হোটেলে সাংবাদিক তথ্য সংগ্রহ-মানসে উঠে ছিলেন সেই "তরুণ হোটেল মালিক প্রবীর দত্ত ঢুকতে না ঢুকতেই জানিয়েছেন, আমরা দারুণ একজন ডি. এম. পেয়েছি, জানেন! এতদিনের সরু নোংরা, হাঁটতে চলতে কষ্ট হওয়া বাজারের রাস্তায় উনি গাড়ি চালিয়ে দিয়েছেন। মাচানতলায় যান, চিনতে পারবেন না। রাস্তাগুলো এতদিনে রাস্তা মনে হচ্ছে। আমাকে বলেছেন, বাগান করে দিন। বলেছি, করে দেব।"

এর পর সাংবাদিক নুনগোলা রোডে স্টেশনারি দোকানে কেনাকাটায় ব্যস্ত গৃহবধূ রীতা বসুর কাছে জানতে চান, নতুন ডি. এম.-এর জমানায় কোন পরিবর্তন অনুভব করেছেন কিনা। রীতা জবাবে বলেন, "ম্যাডাম দারুণ কাজ করছেন। বাঁকুড়ার রাস্তায় এমন খোলামেলা ভাবে যে হাঁটাচলা করা যায় তা ভাবতেও পারতাম না এতদিন।" বামফ্রন্ট সরকারের সিনিয়ার পার্টি এই ডি. এম.-কে কী চোখে দেখছেন এ কথা স্থানীয়

বিধায়ক সি. পি. এম. নেতা এবং রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী পার্থ দে-র কাছে জানতে চেয়েছিলেন অজয়বাবু। পার্থবাবুর জবাব, "গভর্নমেন্ট কাউকে পাঠালে তাঁর কাজের বিরোধিতা আমরা করি না।"

বোধকরি যে কথাটা তিনি উহ্য রেখেছেন তা, 'বেজুতের হলে ফেরত পাঠাই।' আঠারই ফেব্রুয়ারী থেকে আটই এপ্রিল—ঊনপঞ্চাশ দিন। সাতই এপ্রিল বাঁকুড়া থেকে এবার জানালেন অমিতাভ ভট্টাচার্য : "... জেলা পরিষদের সঙ্গে দ্বন্দ্বের জেরে বাঁকুড়ার জেলা-শাসক রীনা বেঙ্কটরামনকে সরে যেতে হচ্ছে। আগামী দশই এপ্রিল থেকে তিনি দীর্ঘ তিন মাসের ছুটিতে চলে যাচ্ছেন। ... জবরদখলকারীদের উচ্ছেদ থেকে শুরু করে একের পর এক ইস্যুতে রীনা বেঙ্কটরামন ক্রমাগতই রাজনীতিকদের বিষনজরে পড়লেও তাঁর প্রতি সাধারণ মানুষের সমর্থন ছিল। ...উল্লেখ্য, ছাব্বিশে মার্চ থেকে বাঁকুড়ায় বাস ধর্মঘট চলছিল।"

বাঁকুড়ায় বাসের মাথায় বিপজ্জনকভাবে যাত্রী পরিবহণ বন্ধ করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন ডি. এম.। তাঁর যুক্তি ছিল, শুধুমাত্র ডিসেম্বর মাসেই তিন তিনটি পৃথক বাস দুর্ঘটনায় তিনজনের মৃত্যু হয় এবং তিপ্পান্নজন আহত হন। ফলে তিনি ডি. এম. থাকতে বাসের মাথায় যাত্রী তুলতে দেবেন না। বাস-মালিকেরা ধনকুবের। যথাযোগ্য স্থানে যথারীতি প্রণামী যোগায়। তারা নির্ভয়ে ডি. এম. এ.-র আদেশে কর্ণপাত করল না। রীনা নিজে দাঁড়িয়ে থেকে গ্যাস-কাটার দিয়ে বাসের ছাদে ওঠার সিঁড়ি কাটিয়ে দেন। একই সঙ্গে যানজট এড়াতে বাঁকুড়া শহরের কেন্দ্রে বাইরের বাস ঢোকা বন্ধ করে দেন। ফলে ধর্মঘট। অনির্দিষ্টকালের জন্য। সংবাদদাতা বলছেন, তিনি বেঙ্কটরামনকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করেছিলেন ; কিন্তু ডি. এম. কোনও মন্তব্য করেননি। ইতিপূর্বে যাঁর দৃঢ় ঘোষণা ছিল "আই ওয়ান্ট টু স্টপ দিস থিভারি" এখন তিনি বললেন, "ছুটি চেয়েছিলেন, ছুটি মঞ্জুর হয়েছে।"

"জেলা পরিষদের সভাধিপতি জ্ঞানশঙ্কর মিত্র জেলাশাসকের অতি দীর্ঘ ছুটিতে যাওয়ার বিষয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি। তিনি বলেন, বাস ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে একটা অদ্ভুত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল। জেলা-প্রশাসন ভেঙে পড়েছিল। জেলা পরিষদের মধ্যস্থতায় সেই অচলাবস্থা কাটাতে হয়েছে।"

ভাগ্যিস্ দেশে পঞ্চায়েতি শাসন প্রবর্তিত হয়েছে! তাই জনগণ-অভিনন্দিত আমলাদের সৎকর্মে যখন অচলাবস্থার সৃষ্টি হয় তখন রাজনীতিজীবী সভাধিপতিদের হস্তক্ষেপে অচলাবস্থাকে কাটানো যায়। প্রথমে কুলোর বাতাস দিয়ে দুষ্ট প্রভাবশালিনী ডাইনীদের বিতাড়ন করতে হয়। তার পর অন্যান্য 'দেশসেবা'র কাজ!

* * *

পঞ্চায়েতিরাজ!

এ সম্বন্ধে বর্তমান চীফ ইলেকশন কমিশনার শেষন কী বলেছেন শুনবেন?

আহ্‌মেদাবাদে ইন্ডিয়ান ইন্সটিট্যুট অব ম্যানেজমেন্ট আয়োজিত সভায় ছাব্বিশে জানুয়ারী, 1994 প্রজাতন্ত্র দিবসে উনি প্রসঙ্গত বলেছিলেন,

"... How many people will stand up to protect a civil servant doing an honest job today? In which part of India? So do I hold too many accusing fingers? Does it hurt? Does it make you angry?

The cleaning up process must start from ***Panchayet Raj*** which we had 3000 years ago. Panditji started a *Panchayati Raj* Movement in the late fifties. Within less than 10 years, it has been comprehensively snuffed out by a corrupt political set up aided and abetted by the civil service who saw their right of control going away. Another *Panchayati Raj* is beginning today. The result is obvious. What will it end up in? It will end up in small VIP suitcases. It will end up in vomitting liquor on the floor of Parliament. It will end up by people being purchased." (একজন সৎ আই. এ. এস. অফিসার, যিনি ভাল কাজ করছেন, তাঁকে রক্ষা করতে আপনাদের মধ্যে কজন এগিয়ে আসবেন? ভারতের কোন প্রান্তে তেমন মানুষকে দেখতে পাব আমি? আমি কি আপনাদের দিকে অভিযোগ-তর্জনীটা বড় বেশি করে দেখাচ্ছি? ব্যথা লাগছে? আমার উপর রাগ হচ্ছে?

সম্মার্জনী চালনার কাজটা শুরু করতে হবে পঞ্চায়েতি রাজ থেকে। এ একটি দীর্ঘ ঐতিহ্যবাহী ব্যবস্থাপনা—তিনহাজার বছরের পুরাতন। পণ্ডিত নেহরু পঞ্চাশের দশকে তা পুনরায় প্রবর্তন করতে চেয়েছিলেন। মাত্র এক দশকের ভিতর অসাধু রাজনীতিবিদদের নাসিকায় তা নস্যি হয়ে উড়ে গেল। রাজনীতি-ব্যবসায়ীদের মদৎ দিতে অবশ্য এগিয়ে এসেছিলেন সেকালীন একদল আমলা। তাঁরা মনে করলেন এতে ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ হবার আশঙ্কা। আজ আবার এক নতুন জাতের পঞ্চায়েতি রাজের সূচনা করা হচ্ছে। ফলাফল তো বোঝাই যায়। এর পরিণতি কী? ছোট-ছোট ভি. আই. পি. সুটকেস! মাত্রাতিরিক্ত মদ্যপানে অনভ্যস্ত মদ্যপ সংসদ কক্ষে হড়হড় করে বমি করে দেবে! আবার কী? কিছু লোককে এ-পার্টি সে-পার্টি থেকে নগদ টাকায় কেনা-বেচা করা হবে। ব্যস!")

পঞ্চাশের দশকে নেহরু প্রবর্তিত পঞ্চায়েতি-রাজ রাজনীতি-ব্যবসায়ীদের নাসিকা বিবরে নস্যি হয়ে উড়ে গিয়েছিল ঠিকই। কারণ পেশাদারী রাজনীতিকরা মনে করেছিলেন শাসন যন্ত্রে পঞ্চায়েত-রাজ একটি ভয়াবহ চতুর্থ শক্তি হতে চলেছে। এক-নম্বর শক্তি—বিধায়ক, সাংসদ, মন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী। দু-নম্বর শক্তি—আমলারা: আই. এ. এস., আই. পি. এস., ডাক্তার, এঞ্জিনিয়ার, বিজ্ঞানী, কেরানি, নানান জাতের

সরকারী কর্মচারী। তৃতীয় শক্তি — বিচার বিভাগ, যাঁরা প্রথম ও দ্বিতীয় দলের কাছে জবাবদিহি করেন না। রাজ্যপাল ও রাষ্ট্রপতিরা তো নৈবেদ্যচূড়ায় কড়াপাক সন্দেশ! তাঁদের দিক থেকে ক্ষতি হবার আশঙ্কা কম। তবে পঞ্চায়েতি-রাজ হতে পারে শাসন-ব্যবস্থার চতুর্থ-শক্তি। শোষণ-ব্যবস্থার চতুর্থ ভাগিদার। তাই নেহরু-প্রবর্তিত পঞ্চায়েতি-রাজকে সেবার 'নস্যাৎ' করা হয়েছিল। এবার পেশাদারী রাজনীতিকদের দৃষ্টিভঙ্গি বদলালো—পঞ্চায়েতি-রাজ শত্রু হতে যাবে কেন? ষাট বালাই! যেন-তেন-প্রকারেণ পঞ্চায়েত নির্বাচন জিততে পারলে ওরাই তো পার্টির এজেন্ট হয়ে গ্রামের প্রত্যন্তভাগে গিয়ে পার্টির হয়ে দোহন কাজটা করতে পারবে। প্রতিবাদী শক্তিকে কব্জা করতে পারবে! ফলে. তাঁরা স্বাগত জানালেন পঞ্চায়েতি-রাজকে।

রাজনীতিব্যবসায়ীদলের বশংবদ হিসাবে পঞ্চায়েতি-রাজ ঐ তৃতীয় শক্তির সঙ্গে কোনও বিরোধে গেলেন না—সে প্রশ্নও ওঠেনি। দ্বিতীয় শক্তি, আমলাদের, তাঁরা বোঝালেন ক্ষমতা বিকেন্দ্রিকরণের কোনও প্রশ্ন উঠছে না। কাজটা ভাগ করে নিলে সকলেরই কর্মভার কমবে। ডি. এম. রাজস্ব আদায়ের দিকটা দেখুন, এস. পি. শান্তি রক্ষার ব্যাপারটা (পার্টির নির্দেশানুসারে) ; ডাক্তারেরা হাসপাতালের তদারকি করতে থাকুন, চালাও প্রাইভেট প্র্যাকটিস করুন, আমরা বাধা দেব না। এঞ্জিনিয়াররা প্ল্যান বানান, রাস্তা-গভীর নলকূপ-বাড়িঘর-স্টেডিয়াম সব কিছু ইচ্ছামতো বানান, আমরা সিমেন্ট চুরি নিয়ে তদন্ত করতে যাব না। আমরা পঞ্চায়েতি রাজের তরফ থেকে শুধু ঠিকেদার ও সাপ্লায়ার নির্বাচন করে দেব, বাসের পারমিট ইসু করব আর সবার কাজের ড্রইং অ্যান্ড ডিস্‌বার্সিং দায়িত্বটা আমাদের থাকবে। ব্যাস! গুণকর্ম-বিভাগ-করা চাতুরাশ্রমধর্ম!

রীনা বেঙ্কটরামন একজন ব্যতিক্রম। অধিকাংশ আমলাই এটা মেনে নিলেন।

মুশ্‌কিল হচ্ছে এই : আমলা ও বিচারবিভাগের কর্মীদের অ্যাকাউন্টেবিলিটি আছে—প্রথম ও চতুর্থ দলের নেই।

আপনারা জানেন কি না জানি না, প্রতিটি সরকারী গেজেটেড অফিসারকে প্রতিবছর পয়লা জানুয়ারি একটা সীল-মোহর-করা খাম পাঠাতে হয় বিভাগীয় সচিবের কাছে। সরাসরি। নট থ্রু প্রপার চ্যানেল। আবার বলি : **সরাসরি**। উপরওয়ালার মাধ্যমে নয়। জলপাইগুড়িতে পোস্টেড পূর্তবিভাগের অ্যাসিস্টেন্ট এঞ্জিনিয়ার তা রেজিস্ট্রি ডাকে পাঠাবেন রাইটার্সে পূর্তসচিবের কাছে। সুন্দরবনের গভীরে কোন হেল্‌থ-সেন্টারের মেডিক্যাল অফিসার তা রেজিস্ট্রি ডাকে সরাসরি পাঠিয়ে দেবেন স্বাস্থ্যসচিবের দপ্তরে। কী থাকে তাতে? অফিসারের ব্যক্তিগত স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির খতিয়ান। টোটাল অ্যাসেট্‌স। ঐ বছরে কোন জমি, বাড়ি, গাড়ি কিনলে তার পূর্ণ বিবরণ দিতে হয়। এই সীল মোহর করা লেফাফাগুলি খোলা হয় না। পর-পর সাজানো থাকে। কারও বিরুদ্ধে

কোনও অভিযোগ এলে, ভিজিলেন্স থেকে এনকোয়ারি হলে, তবেই খোলা হয়। অফিসারকে প্রতিটি স্থাবর-সম্পত্তি বৃদ্ধির হিসাব দিতে হয়। তাঁর অ্যাকাউন্টেবিলিটি!

আমাদের জিজ্ঞাস্য : **কোনও নির্বাচিত মিউনিসিপ্যাল কমিশনার, পঞ্চায়েতি শাসক, বিধায়ক, সাংসদ বা মন্ত্রীমশাইকেই বা তা দিতে হবে না কেন?** আমলার তবু চাকরি যাবার ভয় আছে — ওঁদের তো তা নেই! ওঁরা তো অনায়াসে "দক্ষিণ কলকাতায় আড়াই হাজার স্কোয়ার ফুটের বাড়ি" বানিয়ে, অথবা "উত্তর চব্বিশ পরগণায় বিশাল বাগানবাড়ি ও তৎসহ পাঁচটি ফ্ল্যাট" বানিয়ে, অথবা ভূপালে মার্বেল প্যালেস বানিয়ে সংবাদপত্র মিডিয়াকে ম্যানেজ করে, হরিনামের মালা জপ্‌তে জপ্‌তে রজনীশ বা ধীরেন ব্রহ্মচারী জাতীয় কোনও মহাত্মার আশ্রমে গিয়ে দীক্ষা নিতে পারেন। ঠেকাচ্ছে কে?

শেষন বলেছেন, "... I am but a referee. Give me a new offside rule and I will blow the whistle for you. But don't ask me why there is no law. You get the law passed. You ask for it. You insist on it. Because no amount of pontification by me will produce one iota of result unless you rise up. But don't rise up and burn buses and smash glasses. Rise up and tell the people who matter, "this we wouldn't agree with".

[আমি একজন রেফারি বই তো নই! আমাকে অফসাইডের ঐ নতুন আইনটা পাস করিয়ে দিন—দেখুন তারপর : পান থেকে চুন খস্‌লে কেমন না হুইসিল বাজাই! কিন্তু 'আইন কেন নেই' এ প্রশ্ন আমাকে করতে আসবেন না। এটা আপনাদের কাজ। আপনারা দাবী জানান। কারণ আপনারা জেগে না উঠ্‌লে আমার এই শেষন-কথিত-সুসমাচারে কিস্‌সু হবে না! কিন্তু তার মানে প্রতিবাদে বাস পোড়াতে শুরু করবেন না যেন। সরকারি অফিসের কাচ ভাঙা কোনও সমাধান নয়। ঘুম থেকে জেগে উঠুন আর যারা ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত তাদের সাফ্ বলে দিন, 'এসব ধাপ্পামো আমরা মানব না।']

ঠিক এই কথাটাই না বলতে চেয়েছিলেন ক্ষুব্ধ বুদ্ধদেব গুহ তাঁর 'ঋভু'র দ্বিতীয় পর্যায়ে? কিন্তু প্রতিবাদটা আমরা কেমন করে জানাব? ওরা শুনবে কেন? সংবিধান প্রদত্ত ক্ষমতায় ওরা যে অসীম ক্ষমতার অধিকারী। ওদের তূণীরে আছে 'টাডা', আছে 'অফিশিয়াল সিক্রেসি অ্যাক্ট'। আমলারা—যাঁরা জানেন কোন্ রাজনীতি-ব্যবসায়ী কতটা চুরি করছে — তাঁরা মুখ খুলতে পারেন না—তাঁরা 'সার্ভিস কন্ড্যাক্ট রুল্‌সের' 'বন্ডেড-লেবার'! আর আমাদের অস্ত্র? ঐ তিন-চার বছর অন্তর 'জলের কুমির ও ডাঙার বাঘের' মধ্যে একজনকে বেছে নেওয়া! রাজনীতিব্যবসায়ীদের কব্জা করার মতো আইন আমরা কী করে বদলাব ঐ বাঘ-কুমিরদের দিয়েই? শেষনের মতে তিনি রেফারিমাত্র। স্বচক্ষে ফাউল হতে দেখলে তিনি হুইসল বাজাবেন। আইন তৈরি করায় তাঁর কোন

ভূমিকা নেই। সম্ভবত বুদ্ধদেব গুহ বা অন্যান্য সাহিত্যিকেরাও ঐ একই কথা বলবেন: কথাসাহিত্যিক সমাজ-সংস্কারক নয়। সমস্যাটা দেখিয়ে দেওয়া, বিশ্লেষণ করাতেই তাঁর দায়িত্ব শেষ। বাকি কাজ সংস্কারকের। সে-কথা ঠিক। তবে সংস্কারের কিছু ইঙ্গিত সাহিত্যিক রাখতে পারবেন না কেন?

* * *

কিন্তু তার পূর্বে একটা 'ব্যালেন্স শীট' টানা দরকার। দীর্ঘ আটচল্লিশ বছর স্বাধীন ভারতে বাস করার অভিজ্ঞতা। জীবনসায়াহ্নে একটা উদ্বর্তপত্র অপরিহার্য হয়ে পড়ছে। বিশেষ, আজকের এই আর্থ-সামাজিক চরম অবক্ষয়ের ভিতর থেকে মুক্তিপথের সন্ধানই যখন আমাদের মূল লক্ষ্য। স্বাধীনতার পর—কী পেয়েছি, কী পাইনি—কী চেয়েছি অথচ পাইনি, কী-পেয়েছি যা চাইনি—তার খতিয়ান।

পেয়েছি অনেক-অনেক কিছু! শতসহস্র শহীদের শোণিতস্নাত এ স্বাধীনতাকে কিছুতেই বলব না : 'এ আজাদী ঝুটা হ্যয়!' পেয়েছি এই ছয়টি অমূল্য সম্পদ —

এক, সংবিধান। সমাজতন্ত্র। যাকে এই অর্ধশতাব্দীকালের ভিতর কোনও স্বাধিকারপ্রমত্ত রাজনীতিক অবহেলা দেখাতে পারেনি। যারা সংবিধানকে কালিমালিপ্ত করে এ দেশে একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল—অসীম জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও—ভারত তাদের প্রত্যাখ্যান করেছে।

দুই, বাক্-স্বাধীনতা। মতপ্রকাশের নিরঙ্কুশ অধিকার। সমগ্র তৃতীয় বিশ্বে আর কোথায় আছে এমন মতপ্রকাশের ব্যক্তি-স্বাধীনতা?

তিন, রাজনৈতিক ক্ষমতালাভের উদ্দেশ্যে বেশ কয়েকটি গদি-লোভী সাম্প্রদায়িক দল দেশের বিভিন্নপ্রান্তে ক্রমাগত ভেদনীতি চালিয়ে যাচ্ছে। ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়িয়ে এরা দলভারী করতে চায়। দলে প্রতিষ্ঠা চায়। তা সত্ত্বেও স্বাধীনতা-উত্তর কালের সাধারণ ভারতবাসী অধিকাংশই অসাম্প্রদায়িক, সৎ, ধর্মভীরু (সদর্থে), শান্তিকামী এবং অন্য ধর্মাবলম্বী প্রতিবেশীর প্রতি সহানুভূতিশীল! এটাও স্বাধীনতার আশীর্বাদ।

চার, দেশের বিজ্ঞানাচার্যরা—ডাক্তার, এঞ্জিনিয়ার, প্রযুক্তিবিদ্, রসায়নবিদ, নানান জাতের বিজ্ঞানীর দল নিরলস পরিশ্রমে ভারতকে একটি প্রগতিশীল প্রথম সারির রাষ্ট্রে উন্নীত করেছেন। তাঁদের আবিষ্কার থেকে শিল্পপতিরা লাভের বৃকোদরভাগ উদরস্থ করছে—কিন্তু বিজ্ঞানীদের অবদান তাতে ব্যর্থ হয়নি। তার সুফল যে দেশবাসীর তৃণমূলে গিয়ে পৌঁছাতে পারছে না, তার জন্য দায়ী শিল্পপতিরা—যাঁদের মদতে নির্বাচনে জয়ী হন শাসক সম্প্রদায়।

পাঁচ, সৎ, সাহসী, দেশপ্রেমী একটি প্রতিরক্ষা বাহিনী। জল-স্থল-অন্তরীক্ষে তারা জীবনের শেষ শোণিতবিন্দু দিয়েও স্বাধীনতারক্ষায় উৎসর্গীকৃত প্রাণ। প্রতিবেশী রাজ্যে

এবং তৃতীয় বিশ্বের যত্রতত্রদৃষ্ট কুখ্যাত 'কু'-দৈত্যটা আমাদের প্রতিরক্ষা শিবিরে অর্ধশতাব্দীর ভিতর একবারও মাথা গলাবার সাহস পায়নি।

ছয়, গদী-আসীন এবং গদী-লোভীরা নিজ নিজ দলের স্বার্থে যে 'দর্শনধারী দেশসেবার' আয়োজন করে থাকেন—যার প্রচার মিডিয়া-মাধ্যমে বহু বিজ্ঞাপিত, তার বাহিরেও বাস্তবে আছে সত্যিকারের সমাজসেবী অসংখ্য প্রতিষ্ঠান। রামকৃষ্ণ মিশন, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ প্রভৃতি কিছু আছে সন্ন্যাসীদের পরিচালিত সংস্থা। এছাড়াও 'মানবাধিকার', 'স্ত্রী-স্বাধীনতা', 'ফুটপাথবাসীদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য' অনেক সেবা প্রতিষ্ঠান কাজ করে যাচ্ছেন। জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে এবং লোকচক্ষুর আড়ালে। মাদার টেরেসা, বাবা আমতে, সুন্দরলাল বহুগুণা, মেধা পটকর, জি. আর খেরনার প্রভৃতি কিছু নাম আমরা জানি যাঁরা নানা ভাবে দেশসেবা করছেন—কেউ আর্তদের সেবায়, কেউ কুষ্ঠাশ্রম পরিচালনায়, কেউ ভ্রষ্টাচার বিদূরীকরণমানসে। তার বাইরে যাঁরা সমাজসেবী তাঁদের কথা খুব কমই জানি আমরা—অথচ এ কাজ হচ্ছে মহানগরীতে, মফঃস্বল শহরে, গ্রাম-গঞ্জে এমনকি তথাকথিত নিষিদ্ধ পল্লীতেও—হাড়কাটা লেন বা রামবাগান বস্তিতেও।

এঁরাই প্রাকস্বাধীনতা-যুগের দেশপ্রেমের ঐতিহ্যপ্রদীপটা প্রজ্বলিত রেখেছেন। এই সব প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা রাজনৈতিক দল এবং সরকারি অনুদান থেকে শতহস্ত দূরে থাকেন। সহজবোধ্য হেতুতে।

* * *

লাভের চেয়ে লোকসানের পাল্লাটা বেশি ভারী। দুঃখ এটুকু নয় যে, 'মানবজীবন রইল পতিত', তার চেয়ে বড় ট্রাজেডি 'আবাদ করলে ফলত সোনা।' রাজনীতি-ব্যবসায়ীরা নিজেরাও আবাদ করল না, আমাদেরও করতে দিল না।

স্বাধীনতার পর প্রথম দুই-এক দশক তবু দেশশাসকদের মধ্যে কিছুটা আন্তরিকতা ছিল—বিগত দুই-তিন দশক ধরে রাজনীতি-ব্যবসায়ীরা—কী শাসক সম্প্রদায়, কী বিরুদ্ধবাদী—নির্লজ্জ নীতিহীনতায় অধিকাংশই তীব্র ঘৃণার্হ!

প্রাক-স্বাধীনতা যুগে কেউ 'রাজনীতি-করেন' শুনলে আমাদের মনশ্চক্ষে চার-জাতের মানুষের ছবি ভেসে উঠত। এক : যাঁরা রায়সাহেব, রায়-বাহাদুর অথবা খান সাহেব-খান বাহাদুর জাতীয় দৌড়ের প্রতিযোগী। দুই : মডারেট। তাঁরা শাসকদের বেশি উত্ত্যক্ত না করে দেশের জন্য কিছু ভাল কাজ করতে চাইতেন। তাঁদের অন্তিম লক্ষ্য ছিল ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাস। তিন : মূল লক্ষ্য পূর্ণ-স্বরাজ—তবে তা অহিংসপথে হওয়া চাই। চার : মূল লক্ষ্য একই, তবে পথ রক্তাক্ত হল কি না ভ্রূক্ষেপ নেই।

এই চারশ্রেণীর 'রাজনীতিক'ই কিন্তু নিজ নিজ বিশ্বাস ও বিবেকের নির্দেশে নিঃস্বার্থ

দেশসেবা করতেন। প্রথমদল নির্মাণ করে দিতেন বিদ্যালয়, হাসপাতাল, সাঁকো ; খনন করে দিতেন ইঁদারা বা দীঘি। হয়তো পিতৃমাতৃস্মৃতিতে। তা হোক। সেটাই তাঁদের দেশসেবা। মডারেট দল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েও পত্রিকা চালিয়ে যেতেন—'নষ্টনীড়ে'র ভূপতির মতো। সেটাই তাঁদের দেশসেবা। তৃতীয় ও চতুর্থ দলের রাজনীতিকেরা ভারতমাতাকে শৃঙ্খলমুক্ত করার উদ্যোগের অবকাশে নানান ধরনের দেশসেবায় আত্ম-নিয়োগ করতেন। দুর্ভিক্ষ, বন্যা, মহামারী, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা—জীবন তুচ্ছ করে তাঁরা ঝাঁপিয়ে পড়তেন। প্রত্যেকের বিবেক ছিল পরিষ্কার। সুভাষচন্দ্র বিবেকের নির্দেশেই পর্যায়ক্রমে মেনে নিয়েছিলেন—পিতামাতার, শিক্ষক বেণীমাধবের, দেশবন্ধুর এবং মহাত্মাজীর আদেশ ; আবার বিবেক-নির্দেশেই মহাত্মার বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন। প্রাকস্বাধীনতা যুগে তাই বলা যায় যে, রাজনীতির সঙ্গে অচ্ছেদ্যবন্ধনে সম্পৃক্ত ছিল : দেশপ্রেম, আত্মদানের প্রেরণা, কৃচ্ছ্রসাধন, এবং বিবেকের নির্দেশে পথ চলা।

তে হি নো হি সা দিবসাঃ গতাঃ!

আমাদের সেই পরাধীনতা-যুগের গৌরবোজ্জ্বল দিনগুলি বিগত!

বর্তমানে 'রাজনীতি'র সঙ্গে 'দেশসেবা, কৃচ্ছ্রসাধন' ইত্যাদির কোনও সম্পর্ক নেই। 'রাজনীতি-করা' বলতে ইদানীং বোঝায় : কোনও একটি রাজনৈতিক দলকে নির্বাচনে জয়যুক্ত করার জন্য যে-কোন পন্থায় সচেষ্ট হওয়া। রাজনীতিকেরা এখন দুই জাতের: গদী-আসীন আর গদী-লোভী। দুই দলেরই একটিমাত্র উপাস্য দেবতা : গদী! আগামী নির্বাচনে ভোটারসংখ্যা বৃদ্ধি করা। যেন-তেন প্রকারেণ। ন্যায়-অন্যায়, নীতি-দুর্নীতি; আইন-বে-আইন কোন পরোয়া না করে। ভোট বাক্সে ভোটটা ফেলে দেবার পর কে বাঁচল, কে মরল তা অবান্তর। চার-পাঁচ বছরের জন্য। শতকরা নিরানব্বইজন রাজনীতিকের কাছে 'বিবেক' শব্দটা অর্থহীন!

'বিবেক' বলে কিছু থাকলে পণ্ডিত জওয়াহরলাল কিছুতেই পারতেন না কেরলে নির্বাচনজয়ী কম্যুনিস্ট সরকারের ই. এম. এস. নাম্বুদ্রিপাদকে বিতারিত করে রাষ্ট্রপতির শাসন জারি করতে। অথবা চীনের কাছে চরম পরাজয়ের কালিমা কৃষ্ণ মেননের ললাটে লেপে দিয়ে গদী আঁকড়ে বসে থাকতে। 'বিবেক' বলে কোন বস্তু থাকলে জয়প্রকাশ নারায়ণকে 'দেশদ্রোহী' আখ্যা দিয়ে ইন্দিরা গান্ধী তাঁকে কারাগারে নিক্ষেপ করতে পারতেন না। এবং রাজীব গান্ধী শাহ্ বানুর সুপ্রীম কোর্টে-জেতা মামলা গায়ের জোরে হারিয়ে দিয়ে মুসলিম-ভোট সংগ্রহে আত্মনিয়োগ করতে পারতেন না। 'এমনটা তো হয়েই থাকে' বলুন না বলুন, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী পার্টির স্বার্থে বানতলা তদন্তের রিপোর্টটা, বিবেক বলে কিছু থাকলে, এভাবে লোকচক্ষুর আড়ালে আড়াই বছর ধরে লুকিয়ে রাখতেন না। অনেক দিনের কথা, আপনাদের স্মরণে হয়তো নাও থাকতে

মৌলবাদী মুসলমান নেতাদের প্ররোচনায় —আগামী নির্বাচনে মুসলমান ভোটের প্রত্যাশায় রাজীব গান্ধী শাহ্ বানুর সুপ্রীম কোর্টে জেতা মামলা নতুন আইন প্রণয়ন করে হারিয়ে দেন। স্ত্রীকে বিনা খোরপোষে তালাক দেবার অধিকার মুসলমান ভোটারদের বজায় রাখা হল।

অক্টোবর ১৯৯২তে ভারতবর্ষ থেকে কয়েকটি জাহাজ ভর্তি চাল, গম, ঔষধ পাঠানো হল বিশ্বের শেষ কমুনিস্ট-রাজ্য কিউবায়। যুক্তরাষ্ট্রের প্রচণ্ড আপত্তি সত্ত্বেও। যিনি উৎযোগী হয়ে পাঠালেন তাঁর বিবেকনির্দেশ তাঁর রাজ্যে খাদ্য বা ঔষধ উদ্‌বৃত্ত!!

পারে—'নব নির্মাণ' প্রবক্তা দেশপ্রেমিক জয়প্রকাশ নারায়ণ তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রীর স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে প্রচারকার্যে ভারত পরিক্রমা করেছিলেন। ভারতের একটিমাত্র বড় শহরে তিনি জনসভায় বক্তৃতা দিতে পারেননি। সে শহর এই কল্লোলিনী কলকাতা! একটি রাজনৈতিক দলের উচ্ছৃঙ্খল ক্যাডারবাহিনী জয়প্রকাশের গাড়ির বনেটের উপর উঠে উদ্দাম নৃত্য করেছিল। এই স্বেচ্ছাচারিতায় যিনি নেতৃত্ব দিয়েছিলেন—ইন্দিরার এমার্জেন্সির সমর্থনে জয়প্রকাশের বাকস্বাধীনতা অপহরণ করেছিলেন — তাঁর নাম, বাকস্বাধীনতার ধ্বজাধারিণী : মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

না! রাজনীতি যাঁরা করেন তাঁদের বিবেকের বালাই নেই। তবে কেন একটু আগে বলেছিলাম : নিরানব্বই শতাংশ? কারণ : Exception proves the rule.

ব্যতিক্রমই নিয়মের পরিচায়ক।

'আরিয়ালু'র একটি ট্রেন-দুর্ঘটনা বস্তুত কার দোষে ঘটেছিল সে তদন্ত শুরু হবার পূর্বেই সমস্ত দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে 'বিবেক-নির্দেশনায়' তৎক্ষণাৎ পদত্যাগ করেছিলেন তদানীন্তন রেলমন্ত্রী! বিশাল হৃদয়ের একজন ক্ষুদ্রদেহী মানুষ। স্বাধীন ভারতে বোধকরি এই প্রথম এবং সেই শেষ!

ডট্... ডট্... ডট্

সব জ্যোতিষী বার বার
শ্রীবিকর্ণ একবার।।

"জ্যোতিষার্ণব রাজ্যভাগ্যের বিচার করিয়া নিম্নোক্ত অভ্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী করিতেছেন: যেহেতু বর্তমান বঙ্গাব্দের ১৪০২ সংখ্যাগুলি যোগ করিলে যোগফল হয় সাত, এবং প্রথম দুইটি সংখ্যাকে দ্বিতীয়ার্ধের সংখ্যা দ্বারা বিভক্ত করিলেও ভাগফল হয় সাত, সুতরাং সহজেই বুঝা যাইতেছে যে, বর্তমান বঙ্গাব্দ অতিক্রান্ত হইবার পূর্বেই এত ভঙ্গ তবু রঙ্গে ভরা বঙ্গভূমে অবতীর্ণ হইবেন কল্কি-অবতার। কোন্ রাজনৈতিক দলের বৃহস্পতি তুঙ্গে, কাহারই বা শনি বক্রী, তাহা পরে বিচার করা হইবেক। বর্তমানে বলা যাইতে পারে : বঙ্গাব্দ পরিবর্তনের পূর্বেই পশ্চিমবঙ্গের আকাশে উড্ডীয়মান হইবেক উজ্জ্বল কপোতপাঁতি।"

আজ্ঞে হ্যাঁ। এ গণনা নির্ভুল। ত্রিক্ পদ্ধতিতে। "কপোতপাঁতি" শব্দের অর্থগ্রহণ হল না বুঝি? ও কিছু নয় : উজ্জ্বল এক ঝাঁক পায়রা!

জ্যোতিষের প্রতীকধর্মী বাক প্রয়োগ—অর্থ : ইলেকশন ম্যানিফেস্টো!

স্কুলপাঠ্য বই ছাপা যাচ্ছে না : কাগজের অভাবে। সংবাদপত্রের দাম মাসে মাসে বাড়ছে : কাগজের অভাবে। কিন্তু দেখবেন, আকাশকুসুমের বর্ডার দেওয়া লাখ্ লাখ্ মাল্টি-কালার্ড ইলেকশন ম্যানিফেস্টো আকাশে-বাতাসে ছড়িয়ে দেওয়া হবে। কিছুদিনের মধ্যেই!

উজ্জ্বল এক ঝাঁক পায়রা
সূর্যের উজ্জ্বল রৌদ্রে
চঞ্চল পাখ্নায় উড়ছে।
কালিমায় ঘন কালো অম্বর,
বিরোধীরা থাকে যদি থাক দূর শূন্যে—
মোরা রব গদি সেঁটে
শুধু তোমাদেরই ভোটে
শুধু তোমাদেরই ছাপ্পায়, তোমাদেরই পুণ্যে!
তোমাদেরই জন্যে!
সূর্যের রৌদ্রে উদ্দাম উল্লাসে
তুমি নেই, আমি আছি
ধেই ধেই তাই নাচি
কষ্টেই পাবে জেন' কেষ্ট ;
ঐ দেখ ওড়ে manifesto !

পায়রা আবার নানান জাতের, জানেন তো? — গেরোবাজ, গলাফুলা, গোলা, মুখ্‌খি, লক্কা, বোগদাদী, লোটন, সিরাজু, ইত্যাদি। তাদের বক্‌বক্‌মও নানান ঢঙের। কতকটা নমুনা শুনুন :

"আমরা জয়ী হইলে প্রতিশ্রুতি দিতেছি :

"1. পাঁচটাকা কুইন্টাল দরে চাউল অথবা টাকায় জোড়া ইলিশ, যাহা আপনার মন পসন্দ্ বাছিয়া লইবেন। আইদার চাউল অর ইলিশ।

"2. আপনার পুত্র-কন্যা—না থাকিলে ভাই, ভাইপো, ভাগ্নে, যেকোন একটি আত্মীয়কে মুখ্যমন্ত্রীর স্পেশাল কোটায় হয় মেডিকেল কলেজ অথবা এঞ্জিনিয়ারিঙে ভর্তি করাইয়া দিব। আইদার দিস্ অর দ্যাট!

"3. আপনার পুত্র কন্যা ডট..ডট..ডট যেকোন একটি আত্মীয়কে যেকোন একটি পরীক্ষায় আমাদের টিউটোরিয়াল ইন্সটিট্যুশান হইতে পরীক্ষার পূর্বদিন উত্তরসহ প্রশ্নপত্র সরবরাহ করা হইবে।

"4. আপনার কোনো শত্রু থাকিলে আমাদের গোপনে দেখাইয়া দিবেন। আমরা 'ছেলেধরা' বিশেষণে তাহাকে বিভূষিত করিয়া গণপিটুনির মাধ্যমে হাফিজ করিয়া দিব।

"5. আপনার এলাকায় মোছলমানদের যত মস্‌জিদ, দরগা জাতীয় ইমারৎ আছে তাহা 'বাব্‌রি-ফর্মূলায়' রাম-দুর্গা-বজরঙবলীর মন্দিরে রূপান্তরিত করিয়া দিব।

"6. আপনার এলাকায় কাফেরদের যত রাম-দুর্গা-বজরঙবলীর মন্দির আছে তাহা 'বোম্বে স্টক-এক্সচেঞ্জ-ফর্মূলায়' মস্‌জিদে রূপান্তরিত করিয়া দিব।

অতএব আসুন, দলে দলে ভোট দিয়া এই দেশসেবকদের বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করুন।"

* * *

আমাকে একটা আন্দাজ দিতে পারেন? নির্বাচন কমিশনার যতগুলি রাজনৈতিক দলকে প্রতীকচিহ্ন দিয়েছেন তাঁদের সম্মিলিত রাজনীতি-ব্যবসায়ীর সর্বভারতীয় সংখ্যাটি কত হতে পারে? যারা কোনও 'ইজম্'-এ বিশ্বাসী, কোন রাজনৈতিক দলকে আদর্শগত কারণে সমর্থন করে, তাদের হিসাবের মধ্যে ধরছি না। ধরছি শুধু তাদের, যারা এই ব্যবসায় অবতীর্ণ—আর্থিক লাভের আশায়। রাজনৈতিক নেতা, তাঁদের অর্থপুষ্ট ক্যাডার, গুণ্ডাবাহিনী, পার্টিমস্তান, ইত্যাদি, প্রভৃতি। পুলিশকেও হিসাবের বাহিরে রাখতে হবে। কারণ যে পার্টি যখন গদীতে ওরা তখন সে পার্টির আজ্ঞাবহ। রাজ্যপিছু গড়ে চার লাখ ভ্রষ্টাচারী হলে সর্বভারতীয় সংখ্যাটা মোটামুটি এক কোটি ধরতে পারি। সে ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে সারা ভারতে জনসংখ্যার এক শতাংশ ভোটার অবৈধভাবে নির্বাচন জিতে ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করতে পারে। কারণ সেটাই তাদের জীবিকা। বাকি নিরানব্বই শতাংশ ভোটার, যে কোন পার্টির সমর্থকই হোক না কেন, চাইবে সুষ্ঠু নিরুপদ্রব নির্বাচন—হয়তো প্রত্যক্ষভাবে গুণ্ডাদের বুথ দখলের দৌরাত্ম্যে

বাধা দিতে আসবে না। তারা দেশপ্রেমী, কিন্তু শহীদ হতে রাজি নয়।

গত তিন-চার দশক ধরে দেখে আসছি জনসংখ্যার মাত্র ঐ এক শতাংশ ভ্রষ্টাচারী রাজনীতিবিদ পুলিশ ও মস্তানদের সাহায্যে অসংখ্য নির্বাচনকে প্রহসনে রূপান্তরিত করেছে। দুর্ভাগ্যের কথা তদানীন্তন ইলেকশন কমিশনারেরা রাজনৈতিক নেতাদের বিরুদ্ধাচরণ না করে অধিকাংশ ক্ষেত্রে চাকরি বাঁচিয়ে গেছেন। অত্যন্ত সৌভাগ্যের কথা: বর্তমান চীফ ইলেকশন কমিশনার একটি ধূমকেতু! তিনি বিশ্বের বৃহত্তম ডেমক্রেসিকে তার স্বাভাবিক মর্যাদা দানে সক্ষম হয়েছেন। অতি সম্প্রতি পৌর নির্বাচনে (সেগুলি শেষনের তত্ত্বাবধানে ছিল না, ছিল রাজ্যের ইলেকশন কমিশনারের এক্তিয়ারে) নৈহাটি-ব্যারাকপুর অঞ্চলে যে কাণ্ডটা ঘটে গেল—আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, সে জাতীয় দুর্নীতির প্রশ্রয় নিতে সাহস পাবে না কোন রাজনৈতিক দল, আগামী সাধারণ নির্বাচনে। এবার ভোটারদের ফটোসহ আইডেন্টিফিকেশন কার্ড আছে। ইতিপূর্বে বেলা নয়টা-দশটায় কাউন্টারে পৌঁছে যেমন শুনেছি, আপনার ভোট সকালেই পড়ে গেছে, আশা করি, এবার তা শুনতে হবে না।

ইতিপূর্বে যে কথা বলেছি, আবার আমরা সেই প্রস্তাবই দেব: দেশের স্বার্থে, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বার্থে, 'চাপেকার-ব্রাদার্স থেকে সুভাষচন্দ্র' সহস্র শহীদের স্বার্থে আমাদের এখন থেকেই সঙ্ঘবদ্ধ হতে হবে। সমবেত প্রচেষ্টায় গড়ে তুলতে হবে একটি অরাজনৈতিক সর্বভারতীয় সংগঠন। 'অরাজনৈতিক' শব্দের অর্থ সে দলের কেউ কোনদিন নির্বাচনে প্রার্থী হবে না। তার এক মাত্র লক্ষ্য : 'ডেমক্রেসি'কে রক্ষা করা। দুর্নীতিহীন নির্বাচন বাস্তবায়িত করা।

বিশ্বাস করুন, এ কিছু আমার নিজস্ব উর্বরমস্তিষ্কপ্রসূত 'ব্রেন-ওয়েভ' নয়। এ-কথা অন্যান্য রাজ্যের বুদ্ধিজীবীরা চিন্তা করেছেন। তার সমাধান খুঁজে বার করেছেন। আমাদের প্রস্তাবিত 'অরাজনৈতিক রাজনৈতিক দল' গঠন করেছেন এবং কর্মযজ্ঞে ঝাঁপিয়েও পড়েছেন। দুর্ভাগ্য, নিতান্ত দুর্ভাগ্য আমাদের, বাংলা সংবাদপত্র মিডিয়া এতবড় খবরটাকে যথাযথভাবে প্রচার করতে অনিচ্ছুক। সহজবোধ্য হেতুতে। তবু 'টেলিগ্রাফ' সেটা কভার করেছে (2.6.95)।

বোম্বাইতে গড়ে উঠছে— Citizens for National Consensus (জাতীয় বিবেকবান নাগরিক সঙ্ঘ)। সেখানে তাদের সভায় বক্তৃতা করে এসেছেন টি. এন. শেষন (20.12.1993)। পুনে শহরের প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীরা গড়ে তুলেছেন 'জাগৃতি' (Jagruti) নামে একটি শক্তিশালী সংগঠন। যাঁদের মূল লক্ষ্য সংবিধান ও মানবিক অধিকারকে রক্ষা করা। তাঁরা একটি পত্রিকাও প্রকাশ করছেন। একটি ইংরেজি প্রচার পুস্তিকাও তাঁরা বিতরণ করেছেন, যার শিরোনাম "আগামী নির্বাচনে যাঁরা দাঁড়াতে চান তাঁদের অবগতির জন্য।"

থানেতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আর একটি শক্তিশালী গোষ্ঠী—'ভ্রষ্টাচার বিরোধী

ব্যাসপীঠ।' তাঁদের মূল লক্ষ্য যেখানে যেখানে রাজনীতি-ব্যবসায়ীদের 'ভ্রষ্টাচার' লক্ষ্য করা যাবে—তা সে লাল, নীল, সবুজ, গেরুয়া—যে কোন রাজনৈতিক দলেরই হোক —ওঁরা প্রতিবাদ করবেন। আন্দোলন করবেন।

এই সবগুলি সংগঠন সম্মিলিতভাবে কী জাতীয় কাজ করছেন তার একটু নমুনা শোনাই। কারণ পশ্চিমবঙ্গের সংবাদ-মিডিয়া এ খবর পাঠক-পাঠিকাকে জানাতে তেমন আগ্রহী নয়।

আপনারা জানেন, শারদ পাওয়ারের মহাপতনের পূর্বেই তথাকথিত 'অখ্যাত' মিউনিসিপ্যাল ডেপুটি কমিশনার জি. আর. খৈরনার সাস্‌পেন্ডেড হয়েছিলেন। তাঁর অপরাধ : তিনি কিছু সমাজবিরোধীর বে-আইনীভাবে নির্মিত বাড়ি-দোকান-ঝোপড়ি ভাঙতে চেয়েছিলেন। সবাই আশা করেছিল—নতুন সরকার ক্ষমতায় এসে সবার আগে এই সৎ সাস্‌পেন্ডেড অফিসারটিকে স্বপদে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবে!

'কিউরিঅসার অ্যান্ড কিউরিঅসার'! বাস্তবে তা হয়নি!

সে কী ! কেন?

থানের 'ভ্রষ্টাচার বিরোধী ব্যাসপীঠ'-এর জনৈক সাংবাদিকের তদন্তের ফলটা জানাই। শোনা কথা, তাই হলফ নিয়ে বলতে পারব না : ডেপুটি কমিশনার জি. আর. খৈরনার সাস্‌পেন্ডেড হবার পূর্বেই অসংখ্য গুণ্ডা-মস্তান-সমাজবিরোধীর তৈরী করা বাড়ি-দোকান ঝোপড়ি ভেঙে ফেলার আদেশ দিয়ে যান। সেই আদেশগুলি কার্যকরী করা যায়নি—স্বাভাবিক হেতুতেই। যেহেতু আদেশদানকারী অফিসার সাস্‌পেন্ডেড। অথচ আদেশগুলি প্রত্যাহার করাও সম্ভবপর হয়নি। কে করবে? সজ্ঞানে 'বেআইনি' বাড়ি ভেঙে ফেলার আদেশ প্রত্যাহার করে কে জনরোষ মাথায় নেবে? শোনা গেল, যাদের বাড়ি ভেঙে ফেলার আদেশ জারী করা হয়েছিল তারা এসে দরবার করল নয়া শাসকদলের সঙ্গে। পূর্ববর্তী সরকারকে তারা যে শর্তে মদৎ দিত, নয়া সরকারকে তারা তাই দেবে যদি তাদের বেআইনি ইমারৎগুলি '...মানে, বুঝতেই তো পারছেন স্যার!'

ডাক পড়ল সাসপেন্ডেড খৈরনারের।

: A.B.C.-র বাড়ি ভাঙা চলবে না কিন্তু D-র বাড়ি বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দিতে পার। তারপর E.F.G.-র বাড়ি যেমন আছে থাকবে। H.-এর বাড়িটা ভেঙে ফেল। ও ছিল ওদের পেট্রন। বল, এতে রাজি? তাহলে চাকরি ফিরে পাবে!

খৈরনার সম্মত হতে পারেননি। বলেছিলেন 'A to Z' কেউই আমার শত্রু নয়। আমার জেহাদ দুর্নীতির বিরুদ্ধে!

এঁরা বললেন : তবে মর! য়ু আর ডিস্‌মিসড্‌!

আজকের (2.6.95) টেলিগ্রাফের খবর : জাগৃতি,. ভ্রষ্টাচার বিরোধী ব্যাসপীঠ, নাগরিক বিবেক সমিতি প্রভৃতি দল প্রত্যক্ষ সংগ্রামে এগিয়ে এসেছেন : খৈরনারকে স্বপদে ফিরিয়ে নিতে হবে। এই আন্দোলনে যোগ দিয়েছেন বিখ্যাত আইনজ্ঞ ননি পালকিওয়ালা,

মহারাষ্ট্রের সর্বজনশ্রদ্ধেয় নাট্যকার বিজয় তেণ্ডুলকর, মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন মুখ্যসচিব ডি' সুজা, প্রাক্তন মিউনিসিপ্যাল কমিশনার এস. টিনাইকর। এঁরা গণ স্বাক্ষর সংগ্রহ করছেন বিচিত্র পদ্ধতিতে। পোস্টকার্ডে। প্রতিটি পোস্টকার্ডে টাইপ করা আছে এক লাইনের চিঠি, "Dear Sir, please reinstate the Dy. Municipal Commissioner Mr. G. R. Khairnar. We, the citizens of Bombay and India need him." এক দিনেই পাঁচ হাজার ঐ রকম পোস্টকার্ড পেয়েছেন সদ্য ইলেকশন জেতা বি. জে. পি. দলের মুখ্যমন্ত্রী মনোহর যোশী।

'দেয়ালের লিখন' কাকে বলে তিনি জানেন, কিন্তু পোস্টকার্ডের লিখনের প্রভাব কতদূর হয় বোধকরি জানেন না!

* * *

আজ্ঞে হ্যাঁ, পাঠক, আপনাকেই বলছি, এবং পাঠিকা, আপনাকেও। দ্বিধাবিভক্ত বাঙলা আজ অনেক পিছিয়ে পড়েছে। তবু অন্তত আসুন, আমরা এটুকু সার্থক করি : "What India thought yesterday let Bengal think today."

'চ্যারিটি বিগিনস্ অ্যাট হোম'। পাড়াতেই আমরা কাজটা শুরু করব। ছোট্ট করে। দুর্গাপূজায় যতদূর পর্যন্ত বারোয়ারী পূজার চাঁদা দিই অথবা আমাদের এলাকার মস্‌জিদের মুয়াজ্জিনের আজানটা যদ্দূর পর্যন্ত শোনা যায়। পাড়ায় হয়তো ক্লাব আছে, অথবা লাইব্রেরী কিংবা মেয়েদের একটা সংগঠন। জানি, এর অধিকাংশই পার্টির কব্জায়—কিন্তু মস্তান-দাদার সর্দারিতে কিছু কিছু অসন্তুষ্ট সদস্যকে পাবই। আছেন অবসরপ্রাপ্ত সরকারী অফিসার—চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট, অবসরপ্রাপ্ত জজদাদু, স্কুল-কলেজের ছাত্রগর্বে বিস্ফারিতবক্ষ মাস্টারমশাই ও অধ্যাপক। এবং খোঁজ নিলে নিশ্চয় সন্ধান পাবেন কিছু বীতশ্রদ্ধ প্রাক্তন রাজনীতিকের। (আজ্ঞে না, 'বিক্ষুব্ধ' শব্দটা ব্যবহার করিনি। ওর একটা যোগরূঢ় অর্থ সম্প্রতি পয়দা হয়েছে—যারা নতুন দল গড়ে ক্ষমতা দখল করতে চায়)। এঁরা বিরক্ত হয়ে রাজনীতি থেকে অবসর নিয়েছেন। 'বিক্ষুব্ধ' নয়, বীতশ্রদ্ধ!

এঁদের সকলের সঙ্গে কথা বলে গড়ে তুলুন একটা **ভোটার্স কনসেনশাস্ ফোরাম** [ভোটদানকারীদের বিবেক-পরিচালিত সঙ্ঘ]। কোন রাজনৈতিক দলের নয়। কিন্তু যে কোন রাজনৈতিক দলের সভ্য বা কর্মী আমাদের মিটিঙে আসতে পারেন। বক্তৃতা দিতে দেওয়া হবে না, তবে প্রশ্ন করতে পারেন। আমাদের সব কিছু খোলামেলা। আমাদের একটিমাত্র উদ্দেশ্য : ডেমক্রেসিকে রক্ষা করা। আমাদের একটিমাত্র প্রতিজ্ঞা : আমাদের কোন সভ্য নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেন না।

আগেই বলেছি—'আইন' আমার ভাল জানা নেই। যা লিখ্‌ছি তা সাধারণ বুদ্ধি থেকে। তেত্রিশ বছর সরকারি কাজ করার অভিজ্ঞতা থেকে। কোন ভুল হলে পাড়ার আইনজ্ঞ দাদা বা ছোটভাই আমাকে শুধরে দেবেন।

ধরুন, প্রথম মিটিঙে আমরা যদি **এক নম্বর প্রস্তাব** রাখি :

আগামী নির্বাচনে আমরা কোনক্রমেই রিগিং হতে দেব না।

আমার বিশ্বাস : সবাই তা মেনে নেবেন। কোন পার্টি-ক্যাডার—তা সে লাল, নীল, নাতিলাল, বিক্ষুব্ধলাল, গেরুয়া, সবুজ যে-কোন পার্টিরই হোক—দেখবেন, উঠে দাঁড়িয়ে প্রকাশ্যে বলবে না :

"আজ্ঞে না! তা হয় না। দাদা বলেছেন, রিগিং করতেই হবে।"

এক নম্বর প্রস্তাব তাই সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হবে।

দ্বিতীয় প্রস্তাব : আমরা ফল্‌স্‌-ভোট দিতে দেব না!

এ প্রস্তাবও বিনা বাধায় পাস হল। কারণ তার আশিভাগ কাজ কল্কি অবতার করে রেখেছেন : ফটো সমেত আইডেন্টিফিকেশন কার্ড।

তৃতীয় প্রস্তাব : আমরা আগে থেকেই একটা 'ইলেকশান ম্যানিফেস্টো গাইড' বানিয়ে রাখব। প্রতিটি রাজনৈতিক দলের প্রার্থী মনোনীত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। তিনি প্রচারে বের হবার আগেই আমরা আগ বাড়িয়ে গিয়ে তাঁর ডেরায় দেখা করব। বলব, দাদা, আপনাদের পার্টির ইলেকশন-ম্যানিফেস্টো পড়েছি, এবার আপনি আমাদের 'ভোটার্স ফোরাম' পার্টির ম্যানিফেস্টো পড়ে দেখুন। যে-কয়টি আইটেমে আপনি আমাদের সঙ্গে একমত তাতে 'টিক্'-চিহ্ন দিয়ে দিন। এ বিষয়ে পরে 'ভোটার্স ফোরার্ম'-এর সঙ্গে আপনার একটি দ্বিপাক্ষিক 'জেন্টেলমেন্টস্ এগ্রিমেন্ট' হবে। যে-কয়টা আইটেম আপনি অথবা আপনার পার্টি মানতে রাজি নন, তা নিয়ে আপনার সুবিধামতো সময়ে আমাদের সঙ্গে আলোচনায় বসুন। আপনি সে আলোচনায় আপনার পার্টি-নেতাকেও আনতে পারেন। যদি আপনার অসুবিধার যৌক্তিকতা বিষয়ে আমাদের সন্তুষ্ট করতে পারেন তাহলেও আপনার 'এলিজিবিলিটি' বা 'যোগ্যতা' আমরা মেনে নেব। মনে রাখবেন, আপনার পার্টি আপনাকে নমিনেশন দিয়েছে বলেই আপনি আমাদের কাছে 'এলিজিব্‌ল্' হয়ে যান্‌নি। ভোটার হিসাবে আমাদের বুঝে নিতে দিন যে, আমাদের প্রতিনিধিত্ব করার যোগ্যতা আপনার আছে।

বলা বাহুল্য : এ শুধু 'এলিজিবিলিটি'র প্রশ্ন। ফোরাম কাউকে কোনও নির্দেশ দেবে না : কাকে ভোট দিতে হবে সে গোপনীয়তা এই পবিত্র ডেমক্রেসির শেষ কথা।

আমাদের 'ভোটার্স ফোরার্ম'-এর দাবীপত্রে কী থাকবে তা আমাদের পাড়ার বিচক্ষণ দাদারা স্থির করবেন। মূল লক্ষ্য : সংবিধানকে কব্জা করে কিছু রাজনীতি-ব্যবসায়ী আমাদের জীবন নিয়ে বর্তমানে যেভাবে ছিনিমিনি খেল্‌ছে সেটা বন্ধ করা। পাড়ার আইনজ্ঞ দাদা ড্রাফ্‌ট্‌টা সংশোধন করে দেবার পর পার্শ্ববর্তী পাড়ার 'ফোরাম'-এর সঙ্গে আলোচনা করতে হবে। তারপর তার জেরক্স-কপি করিয়ে আমাদের দপ্তরে রাখা থাকবে। এক এক পার্টির প্রার্থী এলেই আমরা একে-একে তাঁকে চেপে ধরব।

ধরুন, দাবীগুলো এই জাতের হতে পারে :

● প্রার্থী যে-পার্টির ব্যানারে জয়ী হবেন তাঁকে সেই পার্টিতে পুরো টার্ম থাকতে হবে (নির্দল হলে নির্দলই)। এ বিষয়ে 'ডিফেকশন আইন'-এ যা বলা আছে তা ছাড়াও প্রার্থী তাঁর ইলেক্টরেটের কাছে লিখিতভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকবেন। পার্টির সঙ্গে ঝগড়া হলে পদত্যাগ করে পুনর্নির্বাচনে যেতে হবে। অর্থমূল্যে পার্টি বদলানো চল্‌বে না।

● প্রার্থী কন্সটিটুয়েন্সিকে নোংরা করতে পারবেন না। যেভাবে আর পাঁচটা সভ্য দেশে নির্বাচন হয়, ভারতেও সেভাবে করতে হবে। শহরে বা গ্রামে বাড়ির দেওয়ালে আলকাৎরার পোঁচড়া মারা বা আঠা দিয়ে পোস্টার সাঁটতে আমরা দেব না। 'ফোরাম'-এর পক্ষ থেকে আমরা নিজ ব্যয়ে একলাইনের একটি পোস্টার ছাপিয়ে রাখব

"**এই নোংরা প্রার্থীকে ভোট দেবেন না**"।

সেটা আমরা প্রার্থীর পোস্টারের উপর আঠা দিয়ে সেঁটে দেব। আপনি আপত্তি করতে পারবেন না কিন্তু!

● ইলেকশনে বিজয়ী হলে বছরে তিন বার — চার মাস অন্তর — আপনি একদিন আমাদের এলাকায় একটি জনসভা করে জানাবেন আপনি বা আপনার পার্টি ইতিমধ্যে কী করেছেন। তার চেয়েও বড় কথা, আমরা যেসব প্রশ্ন রাখব তার জবাবদিহি আপনাকে করতে হবে। পাঁচ বছর অন্তর চোরে-কামারে সাক্ষাৎ আমাদের মনপসন্দ্ নয়।

● আপনার কন্‌স্টিটুয়েন্সিতে কোন ফৌজদারী কেস হলে কোনও কার্ডধারী ভোটার যদি থানায় 'এফ. আই. আর.' লেখাতে গিয়ে বাধা পায় তাহলে আপনি টেলিফোনের মাধ্যমে বা স্বয়ং গিয়ে সেটা লেখাবার ব্যবস্থা করতে বাধ্য থাকবেন। আপনি অনুপস্থিত থাকলে আপনার তরফে কোন্ কোন্ ক্যাডারকে এ বিষয়ে আপনি দায়িত্ব দিয়েছেন তা আমাদের আগেই জানাতে হবে।

● ফুটপাথ বা সরকারী জমি বেআইনিভাবে দখল করার মৌখিক অধিকার দিয়ে আপনি নিজের বা পার্টির জন্য অর্থ সংগ্রহ করতে পারবেন না। সরকার থেকে বেআইনি কন্সট্রাকশান ভাঙার আয়োজন হলে আমাদের নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসাবে আপনি তাতে বাধা দিতে পারবেন না। **রীনা বেঙ্কটরমনের কেস আমরা পুনরভিনীত হতে দেব না।**

● আমরা মনে করি নিম্নলিখিত আইনগুলি রূপায়িত হওয়া বাঞ্ছনীয়। আমরা আরও মনে করি যে, প্রভাবশালী কিছু রাজনীতি-ব্যবসায়ী ব্যক্তিগত ও দলীয় স্বার্থের জন্য দেশের প্রয়োজনীয় এইসব আইন-কানুন জেনে-বুঝে বাস্তবায়িত হতে দিচ্ছে না। আপনি আমাদের কাছে প্রতিশ্রুতি দিন যে, আপনি পার্টি-মাধ্যমে চেষ্টা করবেন এ বিষয়ে সংসদে প্রয়োজনীয় 'বিল' আনতে এবং সেটা যাতে 'অ্যাক্ট'এ পরিণত হয় তার জন্য আমাদের প্রতিনিধি হিসাবে আপনি সচেষ্ট হবেন :

(ক) 'সার্ভিস কন্ডাক্ট রুল্‌স্' সংশোধন করতে হবে। কেন, তার দীর্ঘ আলোচনা ইতিপূর্বে করেছি। আমরা বিশ্বাস করি, নানান কায়দা-কানুনের মাধ্যমে ইলেকশান জিতে যাঁরা দেশটাকে শাসন করার নামে তিন-চার বছরের জন্য শোষণ করতে আসেন , তাঁদের

চেয়ে আমলাদের দেশপ্রেম অনেক বেশি। আই. এ. এস., আই. পি. এস., আই. এফ. এস, থেকে শুরু করে করণিক, ক্লাস-ফোর স্টাফ পর্যন্ত। এঁদের চাকুরির সিকিউরিটির প্রশ্ন আছে, পেনশন-গ্র্যাচুইটির চিন্তা আছে। নির্বাচিত দেশনেতাদের নীতিভ্রষ্টতার এঁরা প্রত্যক্ষদর্শী। বর্তমান 'সার্ভিস্ কন্ডাক্ট রুল্স্' এঁদের বন্ডেড লেবারে রূপান্তরিত করে রেখেছে।

(খ) 'অফিসিয়াল সিক্রেসি অ্যাক্ট' বাতিল করতে হবে। প্রতিরক্ষা বাদে প্রতিটি তদন্ত রিপোর্ট জনগণকে জানাতে সরকার বাধ্য থাকবেন। এ বিষয়ে শেষন এবং সি. বি. আই.-এর জয়েন্ট ডাইরেক্টার শ্রীশান্তনু সেন সম্প্রতি বলেছেন (আনন্দবাজার 26.4.95) —"দেশের অধিকাংশ রাজনৈতিক নেতাই এখন অপরাধজগতের সঙ্গে যুক্ত। আমলা ও রাজনৈতিক নেতাদের অশুভ আঁতাত ভাঙতে 'অফিশিয়াল সিক্রেসি অ্যাক্ট' বাতিল করা হোক।... নাম না করে জ্যোতিবাবুর বিরুদ্ধে আনা নৃপেন চক্রবর্তীর এবং জয়ললিতার বিরুদ্ধে আনা সুব্রহ্মণ্যম্ স্বামীর অভিযোগগুলির প্রতি ইঙ্গিত করেছেন তিনি।"

আপনি কথা দিন : নির্বাচিত হলে এই অ্যাক্ট বাতিল করার জন্য আপনি সর্বশক্তি নিয়োগ করবেন।

(গ) আপনি আপনার পার্টির মাধ্যমে নিম্নলিখিত প্রস্তাবটিকে 'বিল' হিসাবে আগামী সংসদ অধিবেশনে আনার ব্যবস্থা করুন এবং সেটি অ্যাক্টে পরিণত করার সর্বতোভাবে চেষ্টা করুন :

প্রতিটি নির্বাচিত সাংসদ ও বিধায়ক প্রথম অধিবেশনে যোগদানের পূর্বে একটি সীলমোহর করা লেফাফায় তাঁর 'অ্যাসেট স্টেটমেন্ট' যথাক্রমে সুপ্রীম কোর্টে এবং হাইকোর্টে জমা দেবেন। গেজেটেড-অফিসাররা যে ফর্ম ব্যবহার করেন সেই ফর্মে, অথবা সেই জাতীয় ফর্মে। তারপর প্রতি পয়লা জানুয়ারী তিনি নতুন বছরের অ্যাসেট স্টেটমেন্ট সরাসরি জমা দেবেন। **ইতিমধ্যে ঐ বছরে যদি ভূপালে কোনও মার্বেল প্যালেস বানিয়ে থাকেন, অথবা দক্ষিণ কলকাতায় আড়াই হাজার স্কোয়ার ফুটের প্রাসাদ, তবে কোন উপার্জনসূত্র থেকে তা বানিয়েছেন তা জানাতে হবে — ঠিক যেভাবে তা বছর-বছর জানান ঐ 'সার্ভিস-কন্ডাক্ট রুল্স্'-এর 'বন্ডেড লেবার' গেজেটেড আমলারা।**

(ঘ) সি. আর. পি. সি.-তে কিছু পরিবর্তন করে এমন আইন প্রবর্তন করতে হবে যাতে আদালতে উপস্থিত আসামীর জামিন দেওয়ার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করা যায়। আসামীর যদি ইতিপূর্বে কন্‌ভিকশন হয়ে থাকে, অথবা ইতিপূর্বে দুইবার বা ততোধিকবার অভিযুক্ত হবার পর জামিন পেয়ে থাকে, তাহলে তাকে কোন নিম্ন আদালতের বিচারক জামিন দিতে পারবেন না। আসামী পক্ষের আইনজীবীকে সে ক্ষেত্রে হাইকোর্ট থেকে জামিনের অর্ডার আনাতে হবে।

(ঙ) অগ্রিম জামিন নেওয়ার বিষয়ে যে আইন আছে তা আরও দৃঢ় করতে হবে। যাঁদের আয়কর দপ্তরে পার্মানেন্ট অ্যাকাউন্ট নম্বর আছে তাঁদের অগ্রিম জামিন হাইকোর্ট

ব্যতিরেকে কোন নিম্ন আদালত দিতে পারবেন না। পুলিশকে আমরা এ ক্ষেত্রে আরও ক্ষমতা দিতে চাই।

(চ) সার্চ-ওয়ারেন্ট ব্যতীত যেমন খানা-তল্লাসী করা যায় না তেমনি 'ইন্টারোগেশন ওয়ারেন্ট' ছাড়া অতঃপর কাউকে পুলিশ বাড়ি থেকে তুলে আনতে পারবে না। ছাপানো ঐ 'ইন্টারোগেশন ওয়ারেন্ট' ফর্মে থানার ও. সি.-র স্বাক্ষর থাকা চাই। দুইজন স্থানীয় সাক্ষীর স্বাক্ষর পুলিশ কাউন্টার-ফয়েলে রেখে ঐ ওয়ারেন্ট নিকটতম আত্মীয়/আত্মীয়াকে প্রদান করে তাঁর স্বাক্ষর বা টিপছাপ রেখে কাউকে থানায় এনে 'ইন্টারোগেশন' করা যাবে। পুলিশের ক্ষমতা আমরা এক্ষেত্রে হ্রাস করাতে চাই। **ভিখারী পাশোয়ানের কেস আমরা পুনরভিনীত হতে দেব না।**

(ছ) সুধীজনমাত্রেই জানেন : 'গণপিটুনি' দু জাতের :

প্রথমত, এলাকার সর্বজনপরিচিত কুখ্যাত ডাকাত-গুণ্ডা-সমাজবিরোধী : ডাকাতি করতে গিয়ে তারা ধরা পড়লে তারা অনেক সময় গণপিটুনিতে নিহত হয়। তাদের বিরুদ্ধে একাধিক পেন্ডিং কেস সচরাচর থাকে — খুন, ডাকাতি, বলাৎকারের। প্রায়ই অকুস্থলে বোমা, পিস্তল, পাইপগান উদ্ধার করা হয়।

দ্বিতীয়ত, কোন ফন্দিবাজ সমাজবিরোধী পুলিশ ও প্রশাসনের জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে ব্যক্তিবিশেষকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে 'ছেলেধরা' বা 'ডাইনী' জাতীয় বিশেষণ প্রয়োগ করে সদলবলে গণপিটুনিতে হত্যা করে।

আমাদের প্রস্তাব : গণপিটুনিতে কেউ নিহত হলে, তৎক্ষণাৎ একটি বিচার বিভাগীয় (প্রশাসনিক নয়) তদন্ত কমিশন বসাতে হবে। বিচারক দুই মাসের মধ্যে তদন্ত করে তাঁর রিপোর্ট দাখিল করবেন। যদি তদন্তে দেখা যায় যে, নিহত ব্যক্তির বিরুদ্ধে খুন, ডাকাতি বলাৎকারের কোন কেস ঝুলছে না, সে কুখ্যাত সমাজবিরোধী নয়, বোমা-পিস্তল ইত্যাদি অকুস্থলে পাওয়া যায়নি, তাহলে প্রাক-স্বাধীনতা যুগের 'পিউনিটিভ ট্যাক্স' আইন পুনঃ প্রবর্তন করতে হবে। একান্ত গোপন সাক্ষাতে মৌখিক জবানবন্দি দেবার সময়েও যদি কেউ বিচারকের কাছে স্বীকার না করেন হত্যাকারী কে কে, তাহলে তদন্তকারী ঐ এলাকার বাসিন্দাদের আর্থিক সামর্থ্য অনুসারে 'পিউনিটিভ ট্যাক্স' বসাবেন। আদায়ীকৃত অর্থ থেকে তদন্তের খরচ বাদ দিয়ে নিহত ব্যক্তির আত্মীয়দের মধ্যে কী হারে বণ্টন করা হবে তাও তদন্তকারী নির্ধারণ করে দেবেন।

স্বীকৃত ডাকাতদলের 'গণপিটুনি' সম্বন্ধে এখনি কোন মন্তব্য করা যাচ্ছে না। মানবাধিকারের প্রবক্তারা যাই বলুন। যতদিন না রাজনীতি-ব্যবসায়ী ও অসৎ পুলিশের আঁতাতটা নির্মূল করা যায়, ততদিন গ্রামবাসীর এই তাৎক্ষণিক উন্মাদনার উপর, এই একমাত্র প্রতিবিধান ব্যবস্থার উপর কীভাবে নিয়ন্ত্রণ আনব?

তদন্তের রিপোর্ট প্রশাসন জনসাধারণের কাছে প্রকাশ করতে বাধ্য থাকবেন। 'অফিশিয়াল সিক্রেসি অ্যাক্ট' অজুহাতে পার্টির স্বার্থে, তদন্ত রিপোর্ট গোপন করা চলবে

না। **বানতলার অনিতা দেওয়ানের কেস আমরা পুনরভিনীত হতে দেব না।**

* * *

হে মহামহিম নির্বাচনপ্রার্থী!

আপনি অনুগ্রহ করে জানান : আমাদের এই সব প্রস্তাবে আপনাদের লাল/বিক্ষুব্ধলাল/নাতিলাল/অতিলাল/নীল/গেরুয়া/সবুজ পার্টির আপত্তিটা কোথায়? কোন্‌খানে আপনাদের অসুবিধা হচ্ছে? আর অসুবিধা যদি না থাকে তাহলে এ জাতীয় আইন প্রণয়নে কেন আপনার পার্টি উদ্যোগী হবে না? স্পষ্ট করে বলুন!

* * *

যদি আপনি বা আপনার পার্টি মনে করেন যে, আপনাদের কোন বিরুদ্ধযুক্তি নেই—তবু আপনারা আপনাদের ইলেকশন ম্যানিফেস্টো মোতাবেকই চলবেন, আমাদের এই সব প্রস্তাবে 'হ্যাঁ-না' কিছুই বলবেন না, আমাদের পাত্তা দেবেন না, তাহলে মনে রাখবেন: আমাদের 'ভোটার্স ফোরাম'ও আপনার 'ক্যান্ডিডেচার' মেনে নিতে পারল না।

হ্যাঁ, পারেন। আরও একটা কাজ আপনি করতে পারেন, হে মহিমার্ণব নির্বাচনপ্রার্থী : তঞ্চকতা! বিনয়ে বিগলিত হয়ে আমাদের সব প্রস্তাব মেনে নিয়ে 'ভদ্রলোকের চুক্তিতে' স্বাক্ষর দিতে পারেন। তারপর বলতে পারেন : আমি ভদ্রলোক নই। এখন আমি একজন মন্ত্রী!

আদালতে গিয়ে মামলা লড়! দেখি, তোমাদের দৌড়টা!

সে ক্ষেত্রে স্মরণ রাখবেন : কলাগাছে কলার কাঁদি কিন্তু একবারই ধরে। আপনার বাকি জীবনের ঐ রাজনৈতিক-ব্যবসা নিষ্ফলা হতে বাধ্য!

আমাদের সংগ্রাম কিন্তু চলতেই থাকবে। কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারিকা, অরুণাচল থেকে দ্বারকা। ছোট ছোট 'ভোটার্স ফোরাম'—গ্রামে, গঞ্জে, শহরে, মহানগরে। 'গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি'র সুজাত ভদ্রের সঙ্গে হাত মেলাবে 'মানবাধিকার সমিতি'। তার সঙ্গে 'নারী-নির্যাতন প্রতিরোধ মঞ্চ'। ওদিক থেকে এগিয়ে আসবে 'জাগৃতি', 'বম্বে ন্যাশনাল কনসেনশাস', 'ভ্রষ্টাচার বিরোধী ব্যাসপীঠ'। মহাভারতের সাগরতীরে এসে একদিন উপস্থিত হবেন অবসরপ্রাপ্ত শেষন, পরের ডিসেম্বরে। আমাদের সংগ্রাম চল্‌তেই থাকবে, যতদিন না লাল-নীল-গেরুয়া-সবুজ স্বার্থসন্ধানীদের এই রাজনীতির ব্যবসা বন্ধ করতে পারি। যতদিন না দুঃশাসনের বস্ত্রহরণের অপচেষ্টা থেকে নির্যাতিতা অনিতা দেওয়ানদের রক্ষা করতে পারি। যতদিন না ক্যাডার পুত্রস্নেহে অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রকে গদীচ্যুত করে ক্ষুদিরাম থেকে সুভাষচন্দ্রের দান এই 'স্বাধীনতা' সার্থক করে তুলতে পারি।

যতদিন না প্রমাণ রাখতে পারি :

সত্যমেব জয়তে, নানৃতম্!

।। তামাম শুধ্ ।।

এক.দুই..তিন...

মুক্তি চাই
চাই স্বাধীনতা
Chandi

শৌভনিক প্রযোজিত নাটক

এক. দুই.. তিন...

প্রথম অভিনয় সন্ধ্যা : 16 নভেম্বর, 1974

মঞ্চ	: পান্নালাল মৈত্র	**রূপসজ্জা**	: মহম্মদ হেসিব
সঙ্গীত	: ভাস্কর মিত্র	**ধ্বনি নিয়ন্ত্রণ**	: বি. পি. এস.
আলো	: স্বরূপ মুখোপাধ্যায়	**নেপথ্য-সহযোগী**	: প্রদীপ ভট্টাচার্য

নির্দেশনা : সুধাংশু মণ্ডল

মঞ্চে

মানবী	— শিপ্রা চক্রবর্তী	রাসভনাথ	— ননী দাস
আদমী	— শিবু মজুমদার	সারমেয়	— চিনু দাস
দালালেশ্বর	— নিমু ভৌমিক	কুক্কুটস্বামী	— শক্তিদাস ঠাকুর
ইনসান	— অমল মুখোপাধ্যায়	হংসধ্বজ	— নির্মল কংসবণিক
বলিবর্দ	— সুধাংশু মণ্ডল	রমেষ	— মৃত্যুঞ্জয় আঢ্য
শূকরনাথ	— বীরেশ্বর মিত্র	অবতার	— পান্নালাল মৈত্র
হয়গ্রীব	— বিমলেন্দু মজুমদার	বরাহেশ্বর	— প্রদীপ ভট্টাচার্য
অনড্বান	— কাশীনাথ হালদার	কুমার	— বিমল বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রথম দৃশ্য

[প্রেক্ষাগৃহে আলো নিভে গেলেও পর্দা উঠবে না। বালতি হাতে মানবীর প্রবেশ। লালপাড় শাদা শাড়ি। সে আপনমনে গান গাইতে গাইতে আসছে।]

মানবী।। হুঁহুঁহুঁ হুঁহুঁ, হুঁহুঁহুঁ হুঁহুঁ, হুঁহুঁহুঁ হুঁহুঁ, ভাই। হুঁহুঁহুঁ নাহলে এই দুনিয়ায় কারও নিস্তার নাই।

[অপরদিক থেকে আদমীর প্রবেশ। চোঙা প্যান্ট, গুরু শার্ট, সূচালো জুতো। তার হাতে চাবুক]

আদমী।। মানবী!

মানবী।। কে? ও আদমী? চুরি করে গান শুনছিলে কেন?

আদমী।। হুঁহুঁহুঁ হুঁহুঁ! সামনাসামনি তুমি গাও না বলে।

মানবী।। বাপি কোথায়?

আদমী।। ভয় নেই। এ তল্লাটে নেই। [এগিয়ে এসে হাত ধরে] মানবী, তোমাকে সেই কথাটা বলা হয়নি। সেদিন হঠাৎ তোমার বাবা এসে গেলেন।

মানবী।। কী এমন কথা? তা বুঝি বাপির সামনে বলা যায় না?

আদমী।। না, যায় না। তাই তো নির্জনে এসে তোমাকে ধরেছি—

মানবী।। ও মা! নির্জন আবার কোথায় দেখলে? এখানে কত লোক বসে আছে দেখতে পাচ্ছ না?

আদমী।। লোক? মানে? [চারিদেকে তাকিয়ে] লোক আবার কোথায়?

মানবী।। [দর্শকদের দেখিয়ে] তুমি কি অন্ধ? ঐ দেখ না ...

আদমী।। [ফুটলাইটের কাছে এগিয়ে এল] তাই তো! আপনারা এখানে কেন?

দালালেশ্বর।। [অডিটোরিয়ামের ভিতর থেকে] সে কি মশাই? ডেকে এনে অপমান? আমরা সবাই চি-চিড়িয়াখানা দেখতে এসেছি।

আদমী।। চিড়িয়াখানা! এটা কি চিড়িয়াখানা?

দালালেশ্বর।। যা ব্বাবা! তাই তো সবাই বললে গেটে। তা চিড়িয়াখানার কোন অবতার আপনি? বাঁদর না শি-শিম্পাঞ্জি?

আদমী।। তোৎলামি করার জায়গা পাননি? চিড়িয়াখানা দেখতে চান তো এখানে কেন? আলিপুরে যান!

দালালেশ্বর।। মুখ সামলে কথা বলবেন মশাই! গেটে যে বল্‌লে ...

আদমী।। গ্যেটে! মহাকবি গ্যেটে আর লোক পেলেন না? স্বর্গ থেকে নেমে এসে আপনাকে বললেন ...

দালালেশ্বর।। দূর মশাই! কথা বোঝেন না? সে গ্যেটে নয়, গেটম্যান। সে বললে,

এখানে নাকি ধ-ধর্মঘট হচ্ছে। স্ট্রাইক—লক-আউট!

আদমী।। আপনার কি মাথা খারাপ? কে আপনাকে এখানে ঢুকতে দিল বলুন তো!

দালালেশ্বর।। মুখ সামলে কথা বলবেন মশাই! আমার নাম দালালেশ্বর দত্ত। আমি একজন রে-রেস্‌পেক্টেব্‌ল্‌ দালাল। বুয়েছেন?

আদমী।। বুঝেছি। আপনি কীসের দালালি করতে এসেছেন বলুন তো?

দালালেশ্বর।। খবরের। আমি ফ্রি-লান্সার। খবরের কাগজে খবর সাপ্লাই করি। আপনাদের ইয়ে কোথায়? মা—মা?

আদমী।। কার মামার কথা বলছেন? আমার মামা না এঁর মামা?

দালালেশ্বর।। দূর মশাই! কথা বোঝেন না? মামা নয়কো। মা-মালিক?

মানবী।। [নেপথ্যের দিকে] বাপি, ও বাপি! দেখ না, একটা উটকো লোক এসে এখানে ঝামেলা করছে। বলছে, ও দালাল ...

ইনসান।। [নেপথ্যে থেকে] বলে দে উট আমাদের দরকার নেই। আজ উট, কাল হাতি, পরশু গণ্ডার!

মানবী।। উট নয়, উট্‌কো লোক ...

[মাঝখানের পর্দা সরিয়ে ইনসানের প্রবেশ। তার সাজপোশাক সার্কাসের রিং-মাস্টারের মতো। মাথায় চোঙা টুপি, হাতে লম্বা চাবুক। কালো সুট। পিঠে বাঁধা রাইফেল।]

ইনসান।। [মানবীকে] তবে যে বল্‌লি উটের দালাল?

মানবী।। না, উটের নয়, বলছি না? উট্‌কো লোক, ঐ লোকটা ...

ইনসান।। কী করেছে?

মানবী।। বলছে, আমাদের ফার্মের পোষা জানোয়ারেরা নাকি ধর্মঘট করেছে।

ইনসান।। বুঝেছি, বুঝেছি। [দালালেশ্বরকে] এসব বাজে খবর কে রটাচ্ছে মশাই?

দালালেশ্বর।। পাঁ-পাঁচ জনে বলছে, এই আর কি।

ইনসান।। ফাল্‌তু গুজব শুনে অমনি ছুটে এসেছেন? আপনারা কী মশাই? এই আপনারাই আশ্‌কারা দিয়ে দিয়ে জন্তু-জানোয়ারগুলোকে মাথায় তুলেছেন। আপনি কি C. S. P. C. A.-র লোক?

দালালেশ্বর।। আজ্ঞে না। আমার নাম দালালেশ্বর দত্ত। আমি একজন রেসপেক্টেবল দালাল।

আদমী।। উনি খবরের কাগজের লোক। সংবাদ সংগ্রহ ...

ইনসান।। বিলক্ষণ! আগে বলতে হয়। তা ... ইয়ে ... ওখানে কেন? আসুন, আপনি উপরে উঠে আসুন। মানবী, একটু চায়ের বন্দোবস্ত কর। উনি মিডিয়া-র লোক, বুঝেছ না?

মানবী।। এখনো যে এদের কাউকে খাবার দেওয়া হয়নি।

ইনসান।। আহা-হা! সে-সব পরে হবে। ইনি মিডিয়ার লোক ... যাও! [বালতিটা তুলে নিয়ে মানবীর প্রস্থান। আদমী তাকে অনুসরণ করে। ইতিমধ্যে দালালেশ্বর মঞ্চে উঠে এসেছে।]

আসুন, স্যার। আমাদের এই চিড়িয়াখানা-ফার্ম ঘুরে দেখুন। কাগজে প্রবন্ধ লিখুন ; এই ফার্মের বিষয়ে অনেক কিছু লেখার আছে। এখানে duckery করেছি, poultry করেছি, sheep breeding farm আর dairy-তো আগে থেকেই ছিল। সম্প্রতি একটা ভাল piggery করেছি। ব্যবসা ভালই চলছে।

দালাল।। তবে যে শুনলাম ওরা বিদ্-বিদ্রোহ করেছে! হাঁস-মুরগি ডিম দিচ্ছে না। গ-গরু দুধ দিচ্ছে না। সবাই নাকি আপনার বিরুদ্ধে ...

গ-গরু দুধ দিচ্ছে না। সবাই নাকি আপনার বিরুদ্ধে ...

ইনসান।। বাজে কথা মশাই, সব বাজে কথা। এসব ঐ মালিকানন্দের প্রোপাগান্ডা।

দালাল।। মাম-মালিকানন্দটা আবার কে?

ইনসান।। আমার কম্পিটিটর। নদীর ওপারে ওর ফার্ম। এই যে এখুনি এখানে একটা ইয়াং-ম্যানকে দেখলেন না, আদমী—ও তো ঐ মালিকানন্দের ছেলে। বাপ-বেটায় আমার বিরুদ্ধে খুব কুৎসা রটাচ্ছে।

দালাল।। সে কি মশাই! আমার তো মনে হল আপনার মেয়ের সাথে ওর বেশ

'ইয়ে' আছে। তা সে যাগ্‌গে, মরুগ্‌গে ... ওসব খবরে আমার কী দ্‌দরকার? তাহলে আপনার ফার্ম-এর বিষয়ে যা শুনেছি তা সব ভ্‌ভুল বলতে চান?

ইনসান।। ঠিক কী শুনেছেন বলুন তো?

দালাল।। ঐ তো ব্‌বল্লাম! গরুগুলো ধ-ধর্মঘট করে দুধ দেওয়া বন্ধ করেছিল ...

ইনসান।। না, না, ধর্মঘট নয়। দেশের হাল তো দেখছেন? হয় অনাবৃষ্টি, নয় অতিবৃষ্টি। বিচালির দর আকাশ-ছোঁয়া। তাই মানে ... ইয়ে খালি পেটে কি দুধ হয়?

দালাল।। আর হাঁস-মুরগি নাকি ডিম দিচ্ছে না?

ইনসান।। সে আর এক কেলেচ্ছা মশাই। আমাদের ফার্মের গেটের সামনে পঞ্চায়েতের সভাধিপতি এক ইয়া পেল্লায় সাইনবোর্ড খাড়া করেছেন। আমি বারণ করেছিলাম, উনি শুনলেন না। তার পর থেকেই ...

দালাল।। কী লেখা আছে সেই সাইনবোর্ডে?

ইনসান।। ঐ যে সরকার এক নতুন ধুয়ো তুলেছেন না—'ছোট পরিবার সুখী পরিবার'? সেই লালত্রিকোণ-মার্কা সাইনবোর্ড খাড়া করার পর থেকেই হাঁস-মুরগি ডিম দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছিল।

দালাল।। আরে ছি-ছি! এ তো মহা-কেলেচ্ছা মশাই। ... তা আপনি আপনাদের ফার্মটাকে এমন আড়াল করে রেখেছেন কেন? সামনেই এক লৌহ-যবনিকা টাঙিয়ে-দিয়েছেন!

ইনসান।। [পিছনে দেখে] আরে তাই তো! এ পর্দাটা আবার কে খাটালো এখানে? এই! কে আছিস, পর্দাটা খুলে দে।

[যবনিকা উঠে গেল। মঞ্চের মাঝামাজি একটা পাটাতন। তাতে ওঠার উপযুক্ত কাঠের সিঁড়ি। নিচের দিকে দু-একটা পথনির্দেশক সাইন-বোর্ড। Poultry—অথবা Duckery—। বিপরীত দিকে—শুয়োরের খোঁয়াড় এই দিকে। পিছনে একটা প্রকাণ্ড সাইন-বোর্ড। তাতে লেখা :]

।। চিড়িয়াখানা ফার্ম ।।

GROW MORE FOOD

"এইসব মূঢ় ম্লান মূক মুখে দিতে হবে ভাষা"

"জীবে প্রেম করে যেই জন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর!"

"সবার উপরে মানুষ সত্য!"

[দালালেশ্বর চারদিক ঘুরে ঘুরে দেখে। নোটবইতে লিখে নেয়]

ইনসান।। আসুন স্যার, উপরে আসুন। ওখানে বেশিক্ষণ দাঁড়াবেন না।

দালাল।। কেন? এই তো বেশ আছি।

ইনসান।। আরে না, না! এটা হল মনুষ্যেতর জীবের সমতল! আসুন—

দালাল।। বুয়েছি। চলুন [দুজনে উপরে উঠে আসে]। তাহলে ধ-ধর্মঘট বিদ্‌দ্রোহ, ওসব বাজে কথা?

ইনসান।। রাম কহো! এখানে আমাদের সম্পর্কটা প্রায় আত্মীয়ের মতো। ব্যবসা is ব্যবসা! আসলে এটা এক ধরনের 'জীবে প্রেম'! বুয়েছেন না?

দালাল।। বুয়েছি বইকি! এ তো সোজা কথা। আমারও জিবে জল আসছে। তা ঐ জী-জীবজন্তুরা কোথায়?

ইনসান।। ওরা সবাই খেতে-খামারে কাজ করছে। এখনি এসে যাবে।

[দু কাপ চা হাতে মানবীর প্রবেশ]

মানবী।। 'এসে যাবে' না বাবা, এসে গেছে। ঐ তো ওরা আসছে।

দালাল।। শু-শুধু চা?

[নিচের তলায় উইংসের দুদিক দিয়ে ফার্মল্যান্ডের বাসিন্দাদের প্রবেশ। হয়গ্রীব, অনড়ান, রাসভ, বরাহেশ্বর, অবতার, শূকরনাথ, বরাহকুমার, সারমেয়, রমেশ, হংসধ্বজ আর কুক্কুটস্বামীর প্রবেশ। তাদের পরিধানে একরঙা টাইট প্যান্ট। পুরোহাতা গেঞ্জি। প্রত্যেকের মাথায় একটা করে মুখোসের টুপি। তাতে তাদের জান্তব পরিচয়। কোমরে বেল্ট। তা থেকে পেছনে ল্যাজ ঝুলছে। ওরা দু-পায়ে হাঁটছে বটে কিন্তু

আজ্ঞে ধোপাপাড়ার।

অধিকাংশ সময় হাতদুটো ঠুঁটো জগন্নাথের ভঙ্গিতে কব্জি থেকে বাঁকানো, অর্থাৎ হাতের ব্যবহার ওরা জানে না।]

ইনসান। এস, এস! এই দ্যাখো, তোমাদের দেখতে কে এসেছেন। এই যে তোমরা এত খাটছ তাই উনি কাগজে ফলাও করে লিখবেন।

অবতার।। মালিক [সেলাম করে] বড় দুঃসংবাদ আছে একটা।

ইনসান।। তা তো থাকবেই। কাজ থেকে ফিরে রোজই তোমাদের একটা না একটা বায়নাক্কা! ওসব কথা পরে হবে। এখন আগে তোমাদের পরিচয়টা করিয়ে নিই। [দালালেশ্বরকে] ও হল হয়গ্রীব, খাঁটি অ্যারেবিয়ান। আমাকে পিঠে নিয়ে ঘোরে। সেটাই ওর গৌরব। ঐ হল অনড়ান। হরিয়ানা ব্র্যান্ড। লাঙল টানে, গাড়িও টানে। এটি শ্রীমান সারমেয়, পেডিগ্রিড অ্যালসেশিয়ান। আমি আদর করে ডাকি : সার্ম! অত্যন্ত প্রভুভক্ত!

[চাবুকটা উপর থেকে ফেলে দেয়। সারমেয় সেটা মুখে তুলে সিঁড়ি বেয়ে দ্বিতলে উঠে আসে। ইনসান চাবুকটা তুলে নেয়। সে কিন্তু ইতিমধ্যে একনাগাড়ে বলেই চলেছে] হংসধ্বজ। দেড়শ হাঁসের অধিনায়ক। মাস্টার কুক্কুটস্বামী—লেগহর্ন জাতের। আড়াই শ' জাতভাইকে নেতৃত্ব দিচ্ছে। এটি অতি নিরীহ জীব—শ্রীমান Raw মেষ। ওঁরা তিনজন হচ্ছেন সর্বশ্রী বরাহেশ্বর, শূকরনাথ আর অবতার। অবতার ওঁর ডাক নাম, পোষাকি নাম তৃতীয়াবতার। ওটি মাস্টার বরাহকুমার, ঐ বরাহেশ্বরের সুযোগ্য পুত্র। [সকলে একে একে মাথা ঝুঁকিয়ে ঠুঁটো হাতে সেলাম করে চলেছে] আর এটা একটা নিতান্ত গর্দভ। নাম—এই কী নাম রে তোর?

রাসভনাথ।। আজ্ঞে রাস্‌ভ—

ইনসান।। রাস্‌ভ নয় রে মুখ্যু, রাসভ। কতবার শেখাবো? গর্দভ কোথাকার!

রাসভনাথ।। আজ্ঞে ধোপাপাড়ার।

ইনসান।। হ্যাঁ, ওর আদি নিবাস ধোপাপাড়ায়।

অনড়ান।। কিন্তু মালিক, আমরা যে-কথাটা বলতে এসেছি—

ইনসান।। [বিরক্ত হয়ে] আঃ! বললাম না, সেসব কথা পরে শুনব। আগে এঁকে তোমরা সেই গানটা শুনিয়ে দাও।

অবতার।। হুজুর! কথাটা বড় জরুরি ছিল—

[ইনসান চাবুক আস্ফালন করে। সবাই চুপ করে যায়। ইনসান দ্বিতীয়বার চাবুকের শব্দ করে—ওরা সার দিয়ে দাঁড়ায়। তৃতীয়বার চাবুকের শব্দ করার সঙ্গে সঙ্গে ওরা তালে তালে ডাইনে-বাঁয়ে দুলতে থাকে। ব্যান্ড-মাস্টারের মত চাবুকটাকে ধরে তাল দিতে দিতে]

ইনসান।। এক - দুই - তিন! Start!

[সমবেত সঙ্গীত]

সকলে।। ফসল বাড়াও, ফসল বাড়াও, ফসল বাড়াও ভাই।
খাদ্য না হলে এই দুনিয়ায় কারও নিস্তার নাই।।

মানবী।। Grow more food!
Gorw more food!!
Grow more more—

সকলে।। —খাবার!
খাবার না পেলে তোমরা-আমরা সবাই তো হব সাবাড়।।

অনড়ান।। আমরা জোগাবো দুধ।
আসল দুধ সে পয়দা করবে ক্ষীর-ছানা-দই সুদ্।।

হাঁস-মুরগী।। আমরা জোগাবো ডিম্ ;
নোট-বান্ডিল গুন্‌তে গুন্‌তে খাবে তুমি হিমসিম্।।

মানবী।। Grow more food!
Grow more food!!
Grow more more—

সকলে।। —খাবার!
তোমাদের পেট ভরে যদি তবে আমরা পাব যা-পাবার।।

ইনসান।। আমি তো দিচ্ছি খড় ও বিচালি, খোল চানা আর ভূষি।

সকলে।। মালিকের জয়। মালিকের জয়। আমরা তাতেই খুশি।।

ইনসান।। [সারমেয়কে] তোমাকে দিয়েছি বক্‌লেস্, আর
[অনড়ানকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে] তোমাকে দিয়েছি ঘণ্টা!

সারমেয়।। [গলার ঝুমঝুমি ও ঘণ্টা বাজিয়ে] আমাদের তাতে ভরপুর দিল
খুশি হয়ে আছে মনটা।।

ইনসান।। আর [হয়গ্রীবকে] তোমার জন্য জিন্ ও লাগাম—
[রাসভকে] তোমার জন্য এইটা [চাবুক দেখায়]

রাসভনাথ।। রাস্‌ভ তাইতো ভোলে না কিছুতে এখানে গানের খেইটা।।

সকলে।। ফসল বাড়াও, ফসল না হলে আমরা উপোস যাই।
সবার উপরে মালিক সত্য তাহার উপরে নাই।।

দালালেশ্বর।। বাঃ বাঃ বাঃ —গ্‌গ্রান্ড! [সিগারেট ধরায়, ইনসানকে অফার করে]

ইনসান।। No thanks! আমি পাইপ। [পাইপ ধরায়]

অবতার।। হুজুর!

ইনসান।। হ্যাঁ দিচ্ছে, দিচ্ছে। মানবী, এবার ওদের খাবার দাও।

অবতার।। না হুজুর। আমরা খাবারের কথা বলছি না। বলছি যে বড়দা, মানে বলিবড়দা—

ইনসান।। তাই তো। বলিবর্দকে দেখছি না যে?

অনড়ান।। সেই কথাটাই তো হুজুরকে নিবেদন করতে চাইছি তখন থেকে—

ইনসান।। [চাবুক আপসিয়ে] তাই বল না। তখন থেকে তো শুধু ভনিতাই করছ।

হয়গ্রীব।। আজ্ঞে বড়দা মাল টানতে গিয়ে খানায় পড়ে গেছে।

দালালেশ্বর।। ও—ম্মাল টানলে মাঝে মাঝে সবাই খা-নায় পড়ে। আম্মো ক্কতবার পড়েছি বলে—হ্যাঁ! এক কাজ কর। একটু তেঁ-তেতুল জল খাইয়ে দাও!

অনড়ান।। সে মাল টানার কথা বলছি না স্যার ; পিঠে করে যে মাল বইতে হয়—

দালালেশ্বর।। ও পেটের মাল নয়? পি-পিঠের মাল বুঝি!

ইনসান।। তা এতক্ষণে বল্‌ছিস!

রাসভনাথ।। আমারা তো হুজুর সেই তখন থেকে—

ইনসান।। তুই চুপ কর! গর্দভ কোথাকার!

রাসভনাথ।। আজ্ঞে ধোপাপাড়ার।

হয়গ্রীব।। [জনান্তিকে] চুপ কর। তোর আদি নিবাস জানতে চাইছেন না। হুজুর তোকে গালমন্দ করছেন, বুঝছিস না?

রাসভনাথ।। আমারও তাই সন্দ' হচ্ছিল!

[ইনসানের দ্রুত প্রস্থান। মানবী ও দালাল ছাড়া সকলে চলে যায়]

দালালেশ্বর।। তুমি বুঝি ওঁর মে-মেয়ে। কী নাম গ তোমার?

মানবী।। মানবী।

দালালেশ্বর।। মানবী? বাঃ বেশ নাম! তা তুমি কিছু খবর বলতে পার?

মানবী।। কী খবর জানতে চান?

দালালেশ্বর।। এই এরা যারা খাবারের যোগান দিচ্ছে তারা তাদের জী-জ্জীবন নিয়ে সুখী কি না?

মানবী।। আপনি আপনার জীবন নিয়ে সুখী?

দালালেশ্বর।। দূর! মানুষ কখনও নিজের জীবন নিয়ে সুখী হয়? বিশেষ করে যে খেটে-খাওয়া মানুষ।

মানবী।। এরাও তো খেটে খায়।

দালালেশ্বর।। কিন্তু ওরা তো মানুষ নয়, তাছাড়া তুমি যে ব-বললে : ওরা খুশি, ওরা খুব খুশি!

মানবী।। আপনি আপনার employer-কে কী বলে থাকেন?

দালালেশ্বর।। দূর। তুমি কী গো! ব্বারে-বারে আমার কথা তুলছ কেন? হ্যাঁ?

মানবী।। জন্তু-জানোয়ারের সঙ্গে তুলনা করছি বলে অপমান বোধ হচ্ছে?

দালালেশ্বর।। আচ্ছা, থাক বাবা, ওসব কথা থাক! ঐ-ছেলেটি কে গা?

মানবী।। কোন ছেলেটি?

দালালেশ্বর।। ছে-ছেলে তো একটাই দেখলাম গা। ঐ যে চো-চোঙা প্যান্ট পরা ... তোমাকে কী-যেন গো-গোপন কথা শোনাতে চাইছিল।

মানবী।। ও একটা বদ্ধ পাগল।

দালালেশ্বর।। তোমার প্রে-প্রেমে?

মানবী।। কী যে বলেন! আমি যাই, বলিবড়দা—

দালালেশ্বর।। ঐ বলি বড়দাটা কে গা?

মানবী।। আমাদের জোড়া-বলদের একটা। অনেক বয়স হয়েছে। সে খোঁড়া হয়ে গেলে ভারি কষ্ট পাবে। আমি যাই—

দালালেশ্বর।। চলো। আচ্ছা যাই—[উভয়ের প্রস্থান]

[মঞ্চের সাধারণ আলো নিভে যায়। ডানদিকে স্পট-লাইট। বরাহেশ্বরে আর শূকরনাথ]

বরাহেশ্বর।। তুই যাসনি দেখছি?

শূকরনাথ।। কী হবে গিয়ে? বড়দার 'হয়ে' গেছে!

বরাহেশ্বর।। সেটা বড় কথা নয় শূ। মরলে তো বড়দা বাঁচবে। আমাদের এ জীবনকে কি বেঁচে থাকা বলে? তা নয়। আমি ভাবছি বড়দাকে ওরা এখানে আনবেই না!

শূকরনাথ।। তবে কোথায় নিয়ে যাবে? পশু চিকিৎসালয়ে?

বরাহেশ্বর।। তুইও যে রাসভ-এর মত নিরেট হয়ে উঠছিস!

শূকরনাথ।। কেন, কেন?

বরাহেশ্বর।। তুই ভেবেছিস ঐ বুড়োবলদকে ওরা চিকিৎসা করে বাঁচাবে? বেঁচে ও কী করবে? আর মাল টানতে পারবে? ওখান থেকেই ওকে ঝেড়ে দেবে!

শূকরনাথ।। ঝেড়ে দেবে! ঝেড়ে দেবে মানে?

বরাহেশ্বর।। কসাই ডেকে বেচে দেবে!

শূকরনাথ।। কী বলছিস পাগলের মত? বড়দা এতদিন ছিল সতিকারের চিনির বলদ! ওদের জন্য এতদিন কী না করেছে! এখন বুড়ো বয়সে জ্যান্ত গরু কসাইকে বেচে দেবে?

বরাহেশ্বর।। তুই আজও মানুষদের চিন্‌লি না!

শূকরনাথ।। এর শোধ আমরা একদিন নেব।

বরাহ।। হুঁ! কবে?

শূকর।। যেদিন আমরা বিদ্রোহ করব!

বরাহ।। হুঁ! কবে?

শূকর।। আমি তো মনে করি এখনই সময় হয়েছে। সবাই মনে মনে প্রস্তুত। একজন যদি আজ নেতৃত্ব দেয়, সবাইকে ডাক দেয়, তাহলে সবাই সামিল হবে। ঐ মালিকটাকে খতম করে আমরাই এই চিড়িয়াখানা-ফার্মের দখল নিতে পারি। ... আমরা না খেয়ে মরছি আর ওরা ডিনার টেবিলে খাবারের অপচয় করছে!

বরাহ। হুঁ। সেই নেতৃত্বটা কে দেবে?

শূকর। কেন, তুমি আর আমি! আমি বলে দিচ্ছি, তুমি দেখে নিও—বিদ্রোহ যদি কোনদিন হয় তবে তার নেতৃত্ব দেব এই আমরাই—এইসব সাচ্চা সূয়ার কা বাচ্চা! ঐ গরু-ভেড়া-ছাগলের-দ্বারা সেটা হবার নয়।

বরাহ।। মানলাম, কিন্তু—

শূকর।। ওসব কিন্তু-টিন্তু এখন শিকেয় তুলে রাখ বরাদা। এখনই সুযোগ এসেছে! এমন সুযোগ আর আসবেনা। আজ যদি সত্যিই ওরা বড়দাকে কসাইখানায় পাঠায় তবে সকলেরই রক্ত গরম হয়ে উঠবে।

বরাহ।। আর কেউ যদি বিশ্বাসঘাতকতা করে?

শূকর।। কেউ করবে না। এরা মানুষ নয় কেউ!

বরাহ।। যদি আমাদের বিপ্লব ফেঁসে যায়? তাহলে?

শূকর।। তাহলে কী?

বরাহ।। তাহলে তোমাকে আর আমাকেই যে ওরা ডিনার-টেবিলে নিমন্ত্রণ করবে!

শূকর।। বুঝলাম না।

বরাহ।। হ্যাম আর পোর্ক সেজে আমরা ওদের খাবার টেবিলে পৌঁছাবো!

শূকর।। স্‌স্‌স! ... কে? ওখানে?

[অন্ধকার থেকে এগিয়ে আসে অবতার আর বরাহকুমার]

বরাহ।। তোমরা দুজন ওখানে অন্ধকারে কী করছিলে?

কুমার।। তোমরা যা করছিলে। বিদ্রোহের ষড়যন্ত্র!

বরাহ।। আমাদের সব কথা শুনেছ?

অবতার।। হ্যাঁ, আমার মাথায় একটা ফন্দি এসেছে। আজ যদি বড়দাকে ওরা এখানে নিয়ে আসে, তবে তাকে দিয়েই কথাটা সকলকে জানাতে হবে। বড়দাতো

এমনিতেই মরছে ...

কুমার।। এভাবে বিপ্লব হয় না। মৃত্যুভয় যদি অত বেশি থাকে—

বরাহ।। খোকা, তুই চুপ কর।

কুমার।। না! এভাবে চিরকাল আমাকে চুপ করিয়ে রাখতে পারবে না!

বরাহ।। খোকা!

শূকর।। আহাহা! এই কি গৃহবিবাদের সময়? বরাদা, তুমি একটু থাম'। কুমার, একটু ঠাণ্ডা হ ভাই। এমন সুযোগ আর দ্বিতীয়বার আসবে না।

বরাহ।। শ্‌শ্‌শ্‌! [ডান দিকের স্পট-লাইট নিভে যায়। বাঁ-দিকের স্পট-লাইট জ্বলে ওঠে। দেখা যায় এপ্রান্তে ইনসান ও মানবী কথা বলছে]

ইনসান।। কাজটা তুই ভাল করলি না।

মানবী।। কী বলছ বাপি! তুমি কি ওকে ওখান থেকেই পশু চিকিৎসালয়ে পাঠাতে চাইছিলে?

ইনসান।। তুই এখনও ছেলেমানুষ।

মানবী।। তবে ওকে এখানে আনতে আপত্তি করছিলে কেন?

ইনসান।। আরে বাপু, আমি ইদ্রিস-মিঞাকে খবর পাঠিয়েছি!

মানবী।। বাপি!!

ইনসান।। এই তো জগতের নিয়ম, মানবী। মানুষ মরলে হয় মাটির তলায় যায়, নয়, চিতায় ওঠে। আর গরু বুড়ো হলে যায় কসাইখানায়।

মানবী।। কিন্তু মানুষকে কি কেউ জ্যান্ত অবস্থায় কবর দেয়? জ্যান্ত পোড়ায়?

ইনসান।। তুই বড় তর্ক করিস্‌!

মানবী।। না বাপি। এ তুমি কিছুতেই করতে পারবে না। ছি ছি ছি! এত অমানুষ তুমি হতে পার? যতদিন ক্ষমতা ছিল বলিবর্দ আমাদের কী না করেছে? আর আজ সে পঙ্গু হয়ে গেছে বলে—

ইনসান।। ওপরে আয়। আদমী কোথায় গেল? [প্রস্থানোদ্যত]

মানবী।। [ইনসানের হাত চেপে ধরে] না! আগে তুমি কথা দাও—ওর চিকিৎসা করাবে—

ইনসান।। আচ্ছা রে বাপু, আচ্ছা। আয়। ঐ ওরা এসে গেছে। [দ্বিতলে উঠে দাঁড়ায়] [স্পটলাইট। দেখা যায় বলিবর্দকে দুদিক থেকে ধরে হয়গ্রীব আর অনড়ান ভিতরে নিয়ে আসছে। বলিবর্দের পায়ে প্রকাণ্ড একটা ব্যান্ডেজ। রাসভনাথ সিঁড়ির পাশে একটা চেয়ার এনে রাখে। ওরা ধরাধরি করে বলিবর্দকে বসিয়ে দেয়]

ইনসান।। মানবী, খোঁয়াড় বন্ধ করে দাও। হাঁস-মুরগীর ঘরগুলো ভাল করে বন্ধ

কর। শেয়ালের উপদ্রব হয়েছে। [প্রস্থান। মানবী নিচে নেমে আসে]

মানবী।। এখন কেমন বোধ করছ, বলিবড়দা?

বলিবর্দ।। আমি আর বাঁচব না, দিদিমণি।

মানবী।। ছিঃ! ও কথা বলে না। সব ঠিক হয়ে যাবে। কাল সকালেই ফের উঠে দাঁড়াতে পারবে।

বলিবর্দ।। কিন্তু আমি তো আর মাল বইতে পারব না। মালিক কি এর পরেও আমাকে খেতে দেবেন? অকর্মণ্য বুড়ো বলদকে?

মানবী।। বুড়ো হলে বাপ-মাকে কি খাওয়ায় না মানুষে?

বলিবর্দ।। আমি তো মানুষ নই, দিদিমণি।

মানবী।। কিন্তু আমরা তো মানুষ।

বরাহ।। ইদ্রিস মিঞা কার নাম আপনি জানেন?

মানবী।। ইদ্রিস মিঞা?

অবতার।। হ্যাঁ, কসাই সর্দার ইদ্রিস মিঞা!

অনড়ান।। কসাই!!

শূকরনাথ।। আপনার বাবা ঐ ইদ্রিস মিঞাকে খবর দিতে চাননি? কী? বলুন?

মানবী।। (ইতস্তত করে) আমি কথা দিচ্ছি তোমাদের, বলিবর্দার চিকিৎসা এখান থেকেই করা হবে।

বলিবর্দ।। মরতে আমি ভয় পাইনা, দিদি। আমরা নীলকণ্ঠ শিবকে পিঠে নিয়ে ঘুরি—আমার জাতভাই যমরাজের বাহন! মৃত্যুকে কে পরোয়া করে?

হয়গ্রীব।। ঠিক আছে। এবার আপনি শুতে যান দিদিমণি, রাত অনেক হল।

মানবী।। আমি রাতটা বরং এখানেই থেকে যাই না?

অবতার।। এখানে? না না, মালিক তা হলে রাগ করবেন।

বরাহ।। কেন ব্যস্ত হচ্ছেন আপনি? আমরা তো রইলামই। আপনি যান।

মানবী।। আচ্ছা। [হাঁস-মুরগীকে ঘরে ঢুকিয়ে সিঁড়ি দিয়ে দ্বিতলের পথে প্রস্থান। স্টেজে একা বলিবর্দ ঝিমোচ্ছে, অন্য সকলে একে একে চলে যায়। দ্বিতলে স্পট-লাইট পড়ল। সেখানে ইনসান আর আদমী।]

ইনসান।। ওরা ঘুমিয়েছে?

আদমী।। হুঁ।

ইনসান।। ইদ্রিস মিঞাকে খবর দিয়েছ?

আদমী।। ইদ্রিস আসবে না। মানবী তাকে মাঝপথ থেকে ফিরিয়ে দিয়েছে।

ইনসান।। আঃ! মানবী! মেয়েটাই আমাকে ডোবাবে!

আদমী।। না! মানবী ঠিকই করেছে! এভাবে বলিবর্দকে বেচে দেওয়া অন্যায়!

ইনসান।। বটে! তোমরাই এই জন্তু-জানোয়ারদের মাথায় তুলছ।

আদমী।। না! আপনিই ভুল করছেন! মাথায় আমি ওদের তুলছি না। আপনিই বরং ওদের পায়ের তলায় রাখবার চেষ্টা করছেন। এভাবে চিরদিন চলবে না কিন্তু!

ইনসান।। সে আমি বুঝব। আর কোন কসাইকে চেন?

আদমী।। না, চিনি না। চিনলেও আপনাকে আমি সাহায্য করতাম না! [প্রস্থান]

আদমী।। এরা মানুষ না কী?

দালালেশ্বর।। [প্রেক্ষাগৃহের দ্বিতীয় সারি থেকে] শুস্, শুনছেন স্যার? আমাকে দিয়ে হবে?

ইনসান।। কে? কে কথা বলল?

দালালেশ্বর।। আমি! দা-দালালেশ্বর!

ইনসান।। আপনি কি কসাই?

দালালেশ্বর।। আজ্ঞে ঠিক কসাই নই, তবে, দাদা—দালাল মানুষ তো! বুয়েছেন না!

ইনসান।। তা ওখানে কেন? উঠে আসুন [দালালেশ্বর মঞ্চে উঠে আসে] আপনি পারবেন? ব্যাপারটা হচ্ছে—

দালালেশ্বর।। ব্যাপার আমার জানা আছে! আপনি কিচ্ছু ভাববেন না স্যার, এখনই গরুর গাড়ির ব্যবস্থা করছি। ক্-কাকপক্ষীতে টের পাবেনা। তবে হ্যাঁ—হাফ প্রাইসে ছাড়তে হবে কিন্তু!

ইনসান।। তাই সই। বসিয়ে বসিয়ে বুড়ো বলদকে খাওয়াতে তো হবে না। আপনি আজ রাত্রেই ওটাকে পাচার করুন। দেখবেন, মানবী যেন টের না পায়—

[ইনসান ও দালালেশ্বর বিপরীত দিকে চলে যায়। এবার নিচেকার মহলটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। সেখানে জানোয়ারেরা সবাই আবার সমবেত হয়েছে। সকলেই উত্তেজিত। শুধু বলিবর্দ ঝিমোচ্চে।]

শূকরনাথ! শয়তানের বাচ্চা!

বরাহ।। [শূকরনাথকে] কী, আমি বলিনি? ওরা জ্যান্ত গরু কসাইকে বেচে দেবে?

হয়গ্রীব।। এখন কী করব আমরা?

শূকরনাথ।। কী করব তাও কি বলে দিতে হবে?

রাসভ।। কেন? কী হয়েছে ভাই?

কুমার।। তুমি চুপ কর রাসভদা।

অনড়ান।। [বলিবর্দকে ঠেলা দিয়ে] বড়দা, বড়দা তুমি এখনও ঘুমোচ্ছ? এদিকে যে সর্বনাশ হয়ে গেল!

বলিবর্দ।। আমি ঘুমাইনি। ঘুমাচ্ছ তোমরাই। আমি সব জানি।

অনড়্বান।। তুমি জান। জান' ওরা তোমাকে কসাইখানায়—

বলিবর্দ।। জানি! আগেই বলেছি, মরতে আমি ভয় পাই না। এই তো আমাদের নিয়তি রে! আমার বাপ-ঠাকুরদার বরাতেও ঠিক এমনটিই ঘটেছিল। আমিই বা কি এমন পয়গম্বর যে, আমার বেলা ব্যতিক্রম হবে?

বরাহ।। তার মানে এই অত্যাচার আমরা মুখ বুঝে সহ্য করব?

হয়গ্রীব।। প্রতিবাদ করব না?

শূকরনাথ।। রুখে দাঁড়াব না?

বলিবর্দ।। [উঠে দাঁড়ায়] দাঁড়াও ভাই, আমার সময় কম। যা বলার আছে এই বেলা বলে নিই। তোমরা আরও কাছে এস। [ওরা ঘনিয়ে আসে] বন্ধুগণ! বিদায়! এই আমার শেষ ভাষণ। এখনই কসাইটা এসে পড়বে। শোন, আমার অনেক বয়স ; অনেক দেখেছি, অনেক জেনেছি। তাই আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলে যাই : মানুষ যেদিন থেকে দু-পায়ে উঠে দাঁড়াতে শিখেছে সেদিন থেকে পৃথিবীতে দুটি দলের সৃষ্টি হয়েছে। এক দলে মানুষ, আর একদলে আমরা সবাই—মানুষ, অস্তিদল আর আমরা, নাস্তিদল। ওরা ভোগ করে, আর আমরা জোগান দিই। কী অত্যাচার, কী অকথ্য অত্যাচার ওরা করে চলেছে আমাদের উপর লক্ষ লক্ষ বছর ধরে। অথচ একদিন আমরা সবাই স্বাধীন ছিলাম। আজ মানুষের হাতে আমরা ক্রীতদাস।

রাসভ।। আমি কিছুই বুঝতে পারছি না, বড়দা।

বলিবর্দ।। বেশ, সহজ ভাষাতেই বলি : হাঁস-মুরগী পাড়ায় গিয়ে খোঁজ নিয়ে দেখ গত বছরে কত সন্তানবতী প্রসব যন্ত্রণা ভোগ করেছে আর কতজন মা হতে পেরেছে। গোশালায় গিয়ে খোঁজ নিয়ে দেখ দৈনিক ক-বালতি বাৎসল্য রস ওরা সন্তানের মুখে ধরে দিতে পেরেছে। শুয়োরের খোঁয়াড়ে গিয়ে খোঁজ নিয়ে দেখ, দলে দলে ওরা দৈনিক কী নৃশংস মৃত্যু বরণ করছে! কেন আমাদের এত দুর্দশা? খোঁজ নিয়ে দেখ, তার একটি মাত্র কারণ : মানুষ! সব সর্বনাশের হেতু ঐ মানুষ! 'তাহার উপরে নাই!'

হংসধ্বজ।। কিন্তু আমরা যে অসহায়। ওরা যদি জোর ক'রে—

বলিবর্দ।। কে বলেছে তোমরা অসহায়? নৈতিক জোর তোমাদেরই।

হয়গ্রীব।। কিন্তু ওদের হাতে যে চাবুক?

বরাহ।। আমরা এতজন আছি, ওরা তো মাত্র দুজন। চাবুক আমরা ছিনিয়ে নেব।

অনড়ান।। কিন্তু ওদের হাতে যে বন্দুক!

সারমেয়।। আমাদেরও আছে নখ, আছে দাঁত।

বরাহ।। তুমি?

সারমেয়।। হ্যাঁ, আমিই। সহ্যের একটা সীমা আছে।

হয়গ্রীব।। শাবাস সারমেয় ভাই, তোমাকে দলে পাব ভাবিনি—

অবতার।। আমি একটা কথা বলব?

শূকর।। কী?

অবতার।। মানে, ইয়ে, একেবারে রুখে দাঁড়ানোটা কি ঠিক হবে? মানে, মালিক আসলে লোক তো খারাপ না। একটু যদি বুঝিয়ে ওঁকে বলা যায় ...

বরাহ।। তুই কী রে! অমন মালিকের গুণগান গাইছিস্।

কুমার।। না। বোঝানোর যুগ পার হয়ে গেছে। আমরা আর সহ্য করব না।

বলিবর্দ।। তাহলে তোমাদের সকলেরই ঐ মত? একবার শেষ চেষ্টা করতে চাও?

সমস্বরে।। আলবাৎ।

বলিবর্দ।। ভয়ে কেউ পেছিয়ে আসবে না? কথা দিচ্ছ?

বরাহ।। কীসের ভয়? সর্বহারার শেষ সম্বল তো শৃঙ্খল। খোয়াব কী?

শূকর।। মরার বড়া গাল নেই। তা মরেই তো আছি। স্লটার হাউসে গিয়ে মরার চেয়ে লড়ে মরি না কেন?

বলিবর্দ।। আঃ। কী তৃপ্তি! আজ আমার স্বপ্ন সার্থক। যদি এ বিপ্লব ফলপ্রসূ হয়, তবে লক্ষ লক্ষ বছর পরে আবার আমরা স্বাধীন হব। আমরা একটা না-মানুষ রাজ্য স্থাপন করব। সেখানে সবাই সমান খাবে। সমান সুবিধা পাবে। সারা পৃথিবীর না-মানুষ সে খবর পেয়ে মাথা তুলে দাঁড়াবে। এ আগুন সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে।

বরাহ।। ইন্‌কিলাব—

সকলে।। জিন্দাবাদ!

[দ্বিতলে লাইট। ইনসান দাঁড়িয়ে, তার ডাইনে দালালেশ্বর, বাঁয়ে আদমী]

ইনসান।। কী ব্যাপার? এত হৈ-চৈ কিসের? [স্তব্ধতা] রাসভ! তোমার গলাটাই কানে গেল মনে হচ্ছে?

রাসভ।। আজ্ঞে না! ইয়ে ... মানে, আমার গলার স্বরটা বেসুরো বলে কানে বাজে! নইলে স্লোগান আমরা সবাই দিইছি! না রে?

ইনসান।। হংসধ্বজ। রাত করে খাঁচা থেকে বেরিয়েছ কেন? শেয়ালের পেটে যাবার সাধ হয়েছে? [সকলে নীরব] কী, কথা বলছ না কেন কেউ? [নীরবতা] সার্ম!

তোমার গলাটাও যেন কানে গেল মনে হচ্ছে?

সারমেয়।। ঠিকই শুনেছেন! বেগানা লোক ফার্মে ঢুকছে। তাই আমি চিৎকার করে জানান দিয়েছিলাম। সেটাই তো আমার ডিউটি!

ইনসান।। বেগানা লোক! কই? কোথায়?

সারমেয়।। আপনার ডান দিকে!

ইনসান।। [নরম সুরে] ও! এই ইনি? আরে না, না, ইনি বন্ধু লোক। সার্ম! চাবুকটা তুলে দাও। [উপর থেকে চাবুকটা ফেলে দেয়। সারমেয় গোঁজ হয়ে বসে থাকে] Sharm! Don't be naughty!

সারমেয়।। ও লোকটা আপনার বন্ধু হতে পারে, কিন্তু ও কসাই!

ইনসান।। Sharm!

সারমেয়।। আমরা সব জানি! আপনি বড়দাকে—

ইনসান।। You! Son of a bitch! [সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসতে থাকে। হঠাৎ সারমেয় আক্রমণের ভঙ্গিতে গুঁড়ি মেরে বসে। তার কণ্ঠে একটা জান্তব গর্জন]

আদমী।। মেসোমশাই, যাবেন না! It's very dangerous ...

ইনসান।। যাব না? এরা ভেবেছে কী? ... সার্ম। চাবুকটা তুলে দাও।

কুমার।। না দেবে না! কেন দেবে? আপনিই বা ভেবেছেন কি?

ইনসান।। You! Swine! [ইনসান পদাঘাত করতে একটি পা শূন্যে তোলে। ঠিক তখনই সারমেয় ঝাঁপিয়ে পড়ে। ইনসান পড়ে যায়। তৎক্ষণাৎ সকলে তাকে আক্রমণ করে। দালালেশ্বর ও আদমী রুদ্ধশ্বাসে পালায়। কুমার সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে তাদের তাড়া করে। তিনজনেরই প্রস্থান। ইতিমধ্যে 'গণ আঁচড়-কামড়ে' ইনসান জর্জরিত]

সকলে।। মার বেটাকে! খতম করে ফেল!

[দ্বিতলে আদমী ফিরে এসেছে। তার হাতে দ্বিতীয় আর একটি চাবুক। সে চাবুক আস্ফালন করে। সকলে ইনসানকে ছেড়ে সরে দাঁড়ায়। ইনসান গায়ের ধুলো ঝাড়ছে আর আদমী চাবুক আস্ফালন করতে করতে সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছে। সকলে ক্রমশ দূরে সরে যাচ্চে।]

আদমী।। You brutes! You swine!! You son of a bitch!!! [আদমী নেমে আসছে] [সকলে ঠুঁটো-জগন্নাথের ভঙ্গিতে হাত তোলে। দূরে সরে দাঁড়ায়]

ইনসান।। চাবুকটা আমাকে দাও তো আদমী!

[আদমী চাবুকটা হস্তান্তর করতে যায়]

কুমার।। খবর্দার!! [দ্বিতলে স্পট-লাইট। কুমার উপরে এসে দাঁড়িয়েছে। তার হাতে বন্দুক। আদমী ও ইনসান ঘুরে দাঁড়ায়]

চাবুক ফেলে দাও। না হলে—[আদমী ইতস্তত করে] আমি তিন গুণব! এক.দুই..

[ইনসান মাথার উপর হাত তোলে। দেখাদেখি আদমীও চাবুক ফেলে মাথার উপর হাত তোলে। বরাহ ও শূকরনাথ তৎক্ষণাৎ চাবুক দুটো তুলে নিয়ে ওদের দুজনকে এলোপাথাড়ি মারতে থাকে। দুজনেই পড়ে যায়।]

[অন্ধকারে আলো ক্রমাগত জ্বলবে-নিববে। মনে হবে চাবুকে আদমী-ইনসান জর্জরিত]

বলিবর্দ।। ব্যস! খামোশ! [সবাই থমকে দাঁড়ায়। ইনসান ও আদমী উঠে দাঁড়ায়। গা ঝাড়ে।]। আদমী ঔর ইনসান! যে অত্যাচার তোমরা এতদিন করেছ, তাতে তোমাদের মৃত্যুদণ্ডই আমাদের দেওয়া উচিত। কিন্তু আমার স্বপ্নরাজ্যের

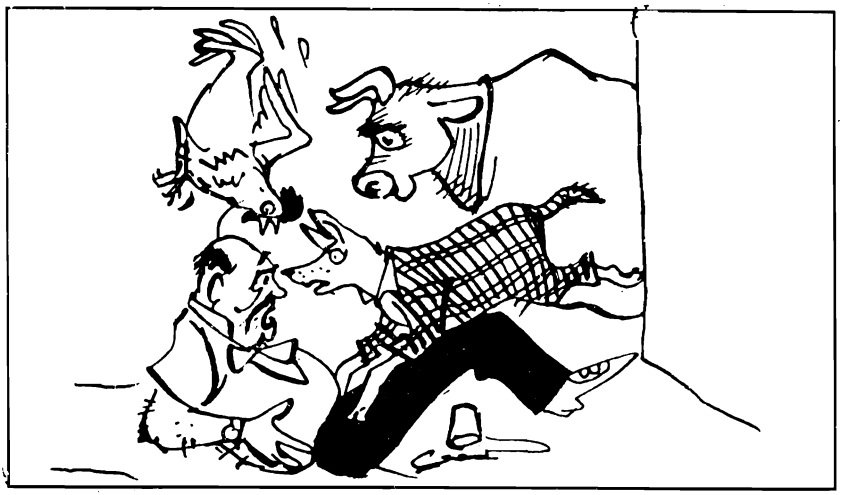

প্রতিষ্ঠা-মুহূর্তে আমি রক্তপাত চাই না। তোমাদের ক্ষমা করলাম। যাও, বেরিয়ে যাও এখান থেকে। Quit না-মানুষ স্থান! আর কোনদিন এদিকে মাথা গলাবার চেষ্টা কর না।

ইনসান।। যাচ্ছি, যাচ্ছি। কিন্তু—

বরাহ।। আবার বলে 'কিন্তু'! [বরাহ চাবুক আস্ফালন করে। ইনসান থমকে যায়। শূকরনাথ চাবুকের শব্দ করে—ইনসান আর আদমী পাশাপাশি অ্যাটেনশান ভঙ্গিতে দাঁড়ায়। দুজনে একত্রে তৃতীয়বার চাবুক আস্ফালন করামাত্র আদমী আর ইনসান তালে তালে দুল্‌তে থাকে]

বরাহ।। এক.

শূকর।। দুই..

বরাহ ও শূকর।। তিন...Start! [আদমী ও ইনসান রুদ্ধশ্বাসে ছুটে পালায়]

[সকলে হেসে গড়িয়ে পড়ে। আনন্দোৎসব। ইতিমধ্যে কুমার নিচে নেমে এসেছে। তাকে সকলে মাথায় তুলে নাচতে থাকে]

বলিবর্দ।। বন্ধুগণ! আমাদের লড়াই ফতে! আর কোনদিন ওরা ফিরে আসবে না। এ রাজ্য এখন আমাদের!

সকলে।। আমাদের?.

বলিবর্দ।। আলবৎ! এটা 'না-মানুষস্থান!' এখানে আমরাই সব কিছু চালাব। আমরা আজ থেকে স্বাধীন।

সকলে।। স্বাধীন? আমরা স্বাধীন! কী আনন্দ! আমরা স্বাধীন!

বলিবর্দ।। এ রাজ্যে ছোট-বড় কেউ নেই। সবাই সমান! এটা সাম্যরাজ্য!

সকলে।। সমান? আমরা সবাই সমান!

বলিবর্দ।। আলবৎ! ফসল যা হবে আমরা সবাই সমান সমান ভাগ করে নেব। এখানে আজ থেকে সবাই ভরপেট খাবে! যার যতটা প্রয়োজন।

সকলে।। সবাই ভরপেট খাবে?

হয়গ্রীব।। তাহলে এখন আমরা কী করব?

বলিবর্দ।। অনেক—অনেক—অনেক কিছু করব। সবাই কাজ ভাগ করে নেব। সবাই খাটব, সবাই খাব, তবে আজ রাতে শুধু নাচব আর গাইব!

রাসভ।। আমিও গাইতে পারি। গাইব? [সুরে] রাসভ তাইত ভোলেনা কিছুতে এখানে গানের খেইটা। [সকলে হেসে উঠে]

বলিবর্দ।। না রাসভনাথ। [চাবুকটা দেখিয়ে] "এইটে" আর নেই—খেইটাও তোমাকে এবার ভুলতে হবে। এখন থেকে আমরা নূতন গান গাইব। আমাদের জাতীয় সঙ্গীত। এস, সবাই আমার সাথে গাও দেখি : এক-দুই-তিন—Start!

[সকলে সার দিয়ে দাঁড়ায়। গান গায়] (সমবেত জাতীয় সঙ্গীত)

কোরাস।। সামিল হও গো দুনিয়ার যত জন্তু ও জানোয়ার হে।
রুধিবে যে পথ নির্মম হাতে বধিব যে প্রাণ তার হে।।

ডানদিক।। অত্যাচারের হল অবসান, উঠিছে নূতন সূর্য।

বামদিক।। চতুষ্পদ ও পক্ষীরা মিলে বাজাও হে রণতূর্য।।

হংসধ্বজ ও কুক্কুটস্বামী।। } পেটের ভিতর যত আছে ডিম
সবই তো বাচ্চা হবে। —

অনড়ান।। বাছুরে খাওয়াব সবটুকু দুধ
মিষ্টি হাম্বা রবে।।

রমেষ।। গায়ের পশম গায়েতেই রবে
যাবে না ক' বলিদানে—

শূকর/বরাহ।। হ্যাম আর পর্ক শব্দযুগল
মুছে যাবে অভিধানে—
কোরাস।। লাঙ্গুল যাহার লাঙল তাহার—এই কথা যেন' সার, হে।
এক হও ভাই দুনিয়ার যত জন্তু ও জানোয়ার হে।।
শূকর/বরাহ।। কাণ্ডারী! আজি করহে মোদের সন্দেহভঞ্জন।
তিমির রাত্রে কে রয়েছে পাশে, মিত্র সে কোন জন?
এই দুনিয়ায় কে মোর বন্ধু? নামটি কি জান' তার, হে?
বলিবর্দ।। কাণ্ডারী বলে : জানি! সে জন্তু, পাখি আর জানোয়ার!
কোরাস।। কাণ্ডারী! বল : দুষ্‌মন কে বা? মুণ্ড কাহার চাই?
বলিবর্দ।। সবার উপরে মানুষ শত্রু! তাহার উপরে নাই।।

দ্বিতীয় দৃশ্য

[ফার্ম-ল্যান্ড! সকালবেলা। একই পরিবেশ! পরিবর্তন হয়েছে শুধু সাইনবোর্ডের লেখাগুলিতে। সেই পরিবর্তন নিম্নোক্তরূপ : Poultry = কুক্কুটাবাস। গোশালা = গোমাতাভবন। Duckery = বলাকানীড়। শুয়োরের খোঁয়াড় এই দিকে = শূকর নিকেতন এই দিকে। আস্তাবল = মন্দুরা। পিছনের বড় সাইনবোর্ডে বর্তমানে লেখা :

দুনিয়ার না-মানুষ এক হও
না-মানুষস্থানের অধিবাসীগণের—
- **জামা গায়ে দেওয়া চলবে না।**
- **মাদকদ্রব্য স্পর্শ করা চলবে না।।**
- **ভেদাভেদজ্ঞান রাখা চলবে না।।**

সব না-মানুষ জন্মগতভাবে সমান
ভুলিও না : সবার উপরে মানুষ শত্রু!

মাঝের চেয়ারে পায়ে ব্যান্ডেজবাঁধা বলিবর্দ বসে আছে। তার দক্ষিণে বরাহেশ্বর এবং বামে শূকরনাথ। পিছনে বন্দুক-কাঁধে কুমার। চারিদিক ঘিরে আর সবাই।]

বলিবর্দ।। বন্ধুগণ! আজ একমাস হল আমরা স্বাধীন হয়েছি। এই একমাসে আমরা অনেক-অনেক-অনেক কাজ করেছি। পরপর তিনটি 'পঞ্চমাসিক' পরিকল্পনা ফেঁদে ফেলেছি। এবং কাজে হাত দিয়েছি। আজ মাসিক 'মাস্‌তামামি' হবে। আমরা জানতে চাই, কোন্ বিভাগে কতটা কাজ হয়েছে।

বন্ধুবর শূকরনাথ! তুমিই পঞ্চমাসিক পরিকল্পনার চেয়ার্যানিম্যাল। তুমি তোমার রিপোর্ট দাখিল কর।

শূকরনাথ।। আমরা স্বাধীন হয়েই যেখানে মানুষদের যা কিছু চিহ্ন ছিল সব ভেঙে তছনছ করে দিয়েছি!

সকলে।। হিয়ার! হিয়ার!

শূকরনাথ।। ইনসানের বাড়িতে দেওয়ালে যত ছবি আর ফটো ছিল সব পুড়িয়ে ফেলেছি।

সকলে।। হিয়ার! হিয়ার!!

শূকরনাথ।। পরাধীনতার প্রতীক প্রতিটি রাস্তার নাম, স্থানের নাম আমরা বদল করেছি। আমাদের মূলনীতি দেওয়ালের লিখনে ঘোষণা করেছি। ঐ দেখুন!

সকলে।। হিয়ার! হিয়ার!!

বলিবর্দ।। বুঝলাম, এ তো তোমাদের উচ্ছ্বাসের প্রকাশ! আসল কাজ কী হয়েছে বল?

শূকরনাথ।। সব রিপোর্ট এখনও আমার দপ্তরে এসে পৌঁছায়নি। আমি অ্যাজেন্ডা অনুযায়ী একে একে বিভাগীয় প্রধানদের ডাকছি। তাঁরাই রিপোর্ট দাখিল করবেন। প্রথমে বন্ধুবর অনড়ান!

বন্ধুগণ! আজ একমাস হল আমরা স্বাধীন হয়েছি।

অনড়ান।। Yes sir!

শূকরনাথ।। আপনি কৃষি-উন্নয়ন-বিভাগের সর্বাধিনায়ক। আপনার রিপোর্ট?

অনড়ান।। আমাদের মূলমন্ত্র হচ্ছে [সুরে] "লাঙ্গুল যাহার, লাঙল তাহার — এই কথা যেন সার, হে।" — আমরা সদলবলে প্রথমেই ইনসানের ফুলের বাগানে ঢুকে সব তছনছ করে দিয়েছি। সব কটি ফুলের চারা চিবিয়ে শেষ করেছি!

সকলে।। হিয়ার! হিয়ার!

বলিবর্দ।। ইস্! ফুলগাছগুলো কী দোষ করল? অমন চমৎকার ফুলবাগিচা তোমরা তছনছ করে দিয়েছ!

শূকরনাথ।। আপনি থামুন বড়দা! ফুল কোন পশুর খাদ্য নয়। তছনছ করেছে বেশ করেছে! ফুল হচ্ছে মানুষের বিলাস-ব্যসনের উপকরণ!

বলিবর্দ।। তা হোক! বাগানটা বড় সুন্দর ছিল হে! তাছাড়া ফুল থেকেই তো ফল হয়।

শূকরনাথ।। এসব আপনার বুড়োজোয়া মনোবৃত্তি!

বলিবর্দ।। কী মনোবৃত্তি?

শূকরনাথ।। বুড়োজোয়া।

বলিবর্দ।। 'বুড়োজোয়া' কী ?

শূকরনাথ।। বুড়োর চিন্তাধারায় যা জন্মায় তাই বুড়জ। আপনি বৃদ্ধ হয়েছেন। আপনার বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি নেই...। বন্ধুবর অনড়ান! চাষ কেমন হচ্ছে বলুন?

অনড়ান।। [ফাইল দেখে] আমরা ফার্মের সমস্ত জমি থার্টি-সেভেন পয়েন্ট থ্রি-সিক্স হেকটেয়ার এবং ফুলবাগিচার পয়েন্ট নাইন-এইট হেকটেয়ার অর্থাৎ একুনে থার্টি-এইট পয়েন্ট ত্রি-ফোর হেকটেয়ার জমি চাষের আওতায় এনেছি। সমস্ত জমিতে মষনে, ছোলা, যব ইত্যাদি বপন করেছি। এ বছর ফসল অনেক ভাল হবে।

রাসভ।। হেকটেয়ার কী ভাই?

শূকরনাথ।। Very good ! এরপর বন্ধুবর কুক্কুটস্বামী!

কুক্কুটস্বামী।। প্রেজেন্ট স্যার!

শূকরনাথ।। আপনি ডিম্বোৎপাদন সমিতির চেয়ারবার্ড। আপনি আপনার বিবরণ দিন।

কুক্কুটস্বামী।। আপনারা সকলেই জানেন ডিম্বোৎপাদন সমিতির মূলমন্ত্র হচ্ছে :

[হংসধ্বজকে কুনুইয়ের গোত্তা মারে]

হংসধ্বজ।। [সুরে] "পেটের ভিতর যত আছে ডিম সবই তো বাচ্চা হবে!"

কুক্কুটস্বামী।। — Correct! সেই প্রতিশ্রুতি আমরা রক্ষা করেছি। গত একমাসে কুক্কুটাবাসে 742টি কুক্কুটাণ্ড এবং বলাকানীড়ে 687টি হংসডিম্ব উৎপাদিত হয়েছে। তন্মধ্যে যথাক্রমে 721টি কুক্কুটাণ্ড এবং 653টি হংসডিম্ব

প্রস্ফুটিত হয়েছে। অর্থাৎ যথাক্রমে 97.30 পারসেন্ট এবং 95.05 পারসেন্ট। ভূতপূর্ব চিড়িয়াখানা ফার্মের রেকর্ডে কখনও এমন অভূতপূর্ব রেজাল্ট হয়নি। পূর্ববর্তী রেকর্ড ছিল যথাক্রমে 62.39% এবং 52.17%। অর্থাৎ আমাদের ডিম্বোৎপাদন প্রকল্পের ক্রমোন্নতির পারসেন্টেজ হার দাঁড়ালো—

শূকরনাথ।। থাক থাক। অত সূক্ষ্ম হিসাবের দরকার নেই। বেশ বোঝা যাচ্ছে ডিম্বোৎপাদন প্রকল্পের সাফল্য আশাতীত হয়েছে। ধন্যবাদ। এবার শ্রীযুক্ত হয়গ্রীব। আপনি Neo-literate Scheme সম্বন্ধে কী রিপোর্ট দিচ্ছেন? কতজন সদ্যসাক্ষর হয়েছে ইতিমধ্যে?

হয়গ্রীব।। মাননীয় চেয়ার্যানিম্যাল-সাহেব, এবং সমবেত বন্ধুগণ! সদ্যসাক্ষর প্রকল্পের সাফল্য আকাশচুম্বী! গত একমাসে এই না-মানুষস্থানে শতকরা 99.99 ভাগ জীবজন্তু, পশুপক্ষীর অক্ষর পরিচয় হয়েছে। তারা বর্ণমালা চিনতে শিখেছে। নিজ নিজ নাম সই করতে শিখেছে। বস্তুত সারা দেশে একজন, মাত্র একজন, সেটা এখনো শিখে উঠতে পারেননি। স্বরবর্ণের উচ্চারণ তাঁর কণ্ঠে ধরা দিচ্ছে না। সেই একমাত্র ব্যতিক্রমটি হচ্ছেন আমাদের বন্ধু—

শূকরনাথ।। থাক থাক। সর্বসমক্ষে সেটা ঘোষণা করা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু সব না-মানুষ যখন জন্মগতভাবে সমান তখন সেই একমাত্র ব্যতিক্রমটিও নিশ্চয় অচিরে সাক্ষর হয়ে উঠবেন। কী বলেন?

হয়গ্রীব।। আমিও তাই আশা রাখি।

রাসভনাথ।। ঠিক পারব। আপনারা দেখে নেবেন!

শূকরনাথ।। আহ্! বন্ধুবর রাসভনাথ! প্লিজ! আপনি সেই বিশেষ না-মানুষটিকে কোনভাবেই চিহ্নিত করবেন না।

বলিবর্দ।। আমাদের প্রসিডিংস থেকে বন্ধুবর রাসভনাথের ঐ শেষ উক্তিটি বাদ দেওয়া হক। ওটা রেকর্ড করার দরকার নেই। তাহলে দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন বিভাগে কাজ ভালই হয়েছে। যাঁরা সাফল্য দেখিয়েছেন আমরা তাঁদের পুরস্কৃত করতে চাই। তাঁদের খেতাব দিতে চাই। পশুকুলে তিমিমাছ এবং পক্ষীকুলে গরুড় হচ্ছে বিশালত্বের প্রতীক। তাই আমি...বন্ধুবর অনড়ান!

অনড়ান।। Yes sir!

বলিবর্দ।। আপনাকে আমি "তিমিভূষণ" উপাধিতে ভূষিত করলাম [সভায় হর্ষধ্বনি]।

বন্ধুবর কুক্কুটস্বামী!

কুক্কুটস্বামী।। প্রেজেন্ট স্যার!

বলিবর্দ।। আপনাকে আমি "গরুড়শ্রী" উপাধি দিয়ে বরণ করলাম [পুনরায় হর্ষধ্বনি] বন্ধুবর রাসভনাথ!

রাসভ।। আজ্ঞে—?

বরাহ।। রাসভনাথ! হায় ভগবান!

বলিবর্দ।। মাপ করবেন। আমার ভুল হয়েছে। সদ্যসাক্ষর প্রকল্পের কর্ণধার বন্ধুবর হয়গ্রীব!

হয়গ্রীব।। উপস্থিত।

বলিবর্দ।। আপনার উপাধি হল "তিমি-বিভূষণ"। [পুনরায় হর্ষধ্বনি] আর আমার প্রিয় বন্ধু শূকরনাথ!

শূকরনাথ।। বান্দা হাজির!

বলিবর্দ।। সার্থক আপনার শূকরজন্ম! আপনাকে "তিমিরত্ন" উপাধি দিতে পারায় আমি নিজেকেই ধন্য মনে করছি।

সকলে।। সাধু! সাধু!

বলিবর্দ।। বন্ধুবর শূকরনাথ একমাসের মধ্যে যে বিপুল উন্নতি করেছেন তাতে আমি মনে করি তাঁকে আমাদের সম্মান দেখানো উচিত। তাই আমি প্রস্তাব করছি : শুয়োরের খোঁয়াড় যাবার রাস্তাটার নাম দেওয়া হক "শূকরনাথ সরণি"। আপনারা কী বলেন?

সকলে।। তাই হোক, তাই হোক!

বরাহ।। একটা কথা—

বলিবর্দ।। বরাহেশ্বর ভায়ার কি এ প্রস্তাবে আপত্তি আছে?

বরাহ।। না, আমি অন্য একটা কথা বলছিলাম।

বলিবর্দ।। তাহলে এটা শেষ হক। [অবতারকে] তুমি ব্যবস্থা কর। [অবতার বাইরে যায় এবং তৎক্ষণাৎ একটি কাগজ এনে পূর্বের সাইন-বোর্ডে এঁটে দেয়। পরিবর্তনটা হল: শূকর-নিকেতন এই দিকে-র স্থলে "শূকরনাথ সরণি।"] বল, বরাহ-ভায়া, কী বলছিলে?

বরাহেশ্বর।। এই খেতাব বিতরণ ব্যাপারটা আমার ভাল লাগছে না। না-মানুষস্থানে সবচেয়ে বড় কথা—আমরা সমান। জন্মগতভাবে সমান। আমাদের একটা করে লেজ থাকাই ভাল।

বলিবর্দ।। বরাহভাই! 'সাম্যবাদ' কথাটাকে এত আক্ষরিকভাবে নিও না। সব কিছু

কখনও সমান হতে পারে? জন্মগতভাবে সারমেয় আর হংসধ্বজ ভায়ার দৈহিক ক্ষমতা কি সমান? তোমার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, আর ঐ না-মানুষটি, যে আজও নিজের নামটা পর্যন্ত সই করতে পারে না—

রাসভনাথ।। আমার কথা বলছেন, বড়দা?

সারমেয়।। আঃ! রাসভদা! চুপ করুন।

বলিবর্দ।। তার বুদ্ধি কি সমান? All animals are equal, but remember, some animals are always more equal! বুঝলে?

বরাহ।। বেশ, মেনে নিলাম। আরও একটা কথা। দেশ স্বাধীন হয়েছে, এইমাত্র শুনলাম গত একমাসে তিমিরত্ন শূকরনাথের তত্ত্বাবধানে খুব উন্নতিও নাকি হয়েছে, কিন্তু আমাদের সংবিধান এখনও রচনা করা হয়নি। এখানে কি একনায়কতন্ত্রই চলতে থাকবে?

বলিবর্দ।। একনায়কতন্ত্র! তুমি কি...তুমি কি...আমাকে?...

বরাহ।। হ্যাঁ, তাই তো চল্‌ছে এ দেশে। একনায়কতন্ত্র! ডিক্‌টেটরশিপ!

বলিবর্দ।। আমারই ভুল। বেশ, বেশ—তোমরা কী তন্ত্র না-মানুষস্থানে চালু করতে চাও বল?

কুক্কুটস্বামী ।। গণতন্ত্র।

হংসধ্বজ।। গণভোট হোক বড়দা।

বরাহ।। আমার তাতে আপত্তি আছে।

শূকরনাথ।। আমারও আপত্তি আছে।

অবতার।। আমিও আপত্তি পেশ করছি।

হংসধ্বজ।। কেন? গণতন্ত্র মন্দ কি?

বরাহ।। তোমরা তো বলবেই। পঁচানব্বই পার্সেন্ট বাচ্চা ফোটাচ্ছ! ভারী আনন্দ, নয়? [সুরে] "পেটের ভিতর যত আছে ডিম সবই তো বাচ্চা হবে!"

কুক্কুটস্বামী।। তোমাদের শুয়োরের পালও তো মা ষষ্ঠীর কৃপায়, শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে—

শূকর।। কী! কী বললে?

বলিবর্দ।। ব্যস! খামোস! [সবাই থেমে যায়] শোন। এই বুড়োর কথাটা মেনে নাও। আমি অনেক দেখেছি। আমি জানি—অশিক্ষিত দেশে গণতন্ত্র একটা প্রহসন!

হংসধ্বজ।। প্রহসন?

বলিবর্দ।। হ্যাঁ। এ রাজ্যে প্রায় সবাই অশিক্ষিত—সদ্যসাক্ষর মাত্র। তারা যদি সবাই

ভোট দিয়ে সেই বিশেষ প্রাণীটিকেই প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত করে, যে নিজের নামটা পর্যন্ত সই করতে পারে না—

রাসভনাথ।। আমি? আমার কথা বলছেন বড়দা?

হয়গ্রীব।। তুই থাম্!

রাসভনাথ।। ঈস্! থামব কেন? হে হে .. বড়দা বলেছে .. আমি মন্ত্রী হব!

বরাহ।। শাট্ আপ!

শূকর।। সাইলেন্স!

বলিবর্দ।। নামটা পর্যন্ত সই করতে পারেনা, তাহলে কি সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে?

বরাহ।। তাহলে আপনি কী করতে চান?

বলিবর্দ।। আমি না-মানুষ-সংগঠনের স্বার্থে শাসনভার ত্যাগ করছি। আমি প্রস্তাব করছি : এ রাজ্য এরপর থেকে যৌথভাবে চালাবে বন্ধুবর শূকরনাথ আর বরাহেশ্বর।

বরাহ।। যৌথভাবে?

শূকর।। ক্ষতি কী?

বরাহ।। না। দ্বৈতশাসনে কখনও ভাল ফল হয় না।

রাসভ।। [হয়গ্রীবকে] এই! দৈত্যশাসন মানে কী রে?

হয়গ্রীব।। তুই বুঝবি না। চুপ কর।

বলিবর্দ।। তবে তুমি কী করতে চাও বরাহেশ্বর?

বরাহ।। আমি যৌথ দায়িত্ব নিতে অপারগ। শূকরনাথই এ রাজ্য শাসন করুক।

বলিবর্দ।। আর তুমি? তোমার সেবা দেশ কী ভাবে পাবে?

বরাহ।। বর্তমান যুগ শূকরনাথের। আমি ভবিষ্যতের দায়িত্ব নিচ্ছি। আমি আগামী প্রজন্মের দায়িত্ব নিচ্ছি। বন্ধুবর সারমেয়, তোমার সদ্যোজাত দুটি সন্তান— কালু-ভুলুকে আমি ভিক্ষা চাইছি। নূতনমন্ত্রে তাদের আমি দীক্ষিত করতে চাই! আগামী প্রজন্মের স্বার্থে!

সারমেয়।। সানন্দে বরাহেশ্বর, সানন্দে! তুমি ওদের দায়িত্ব নাও। নূতন মন্ত্রে দীক্ষিত করে তোল।

বলিবর্দ।। [উঠে দাঁড়ায়] আমি আজ থেকে অবসর নিলাম। আমি বুড়ো হয়ে গেছি, আমার কথাবার্তা নাকি 'বুড়োজোয়া' হয়ে পড়েছে। বেশ! এ রাজ্য শূকরনাথই শাসন করুক। তিমিরত্ন শূকরনাথ! তুমি এখানে বস!

শূকরনাথ।। বলছেন?

সকলে।। জয়! শূকরনাথের জয়! তিমিরতম শূকরনাথের জয়।

বলিবর্দ।। তিমিরতম নয়, তিমিরত্ন। [শূকরনাথ গদিতে বসে]

বরাহ।। আমার আরও একটি বক্তব্য আছে। আমাদের নয়া দলপতি অনুমতি দিলে—

শূকর।। বিলক্ষণ! বল', বল', কী বলতে চাও?

বরাহ।। আমাদের পূর্ববর্তী শাসক এই না-মানুষস্থানে একটি মানুষের বাচ্চাকে থাকবার অনুমতি দিয়েছিলেন। যদিও তাকে আমরা এই সভায় আসতে দিইনি, তবু সে এ রাজ্যেই আছে। এটা না-মানুষস্থানের নীতিবিরুদ্ধ।

[সভায় গুঞ্জনধ্বনি। চাঞ্চল্য।]

শূকর।। তুমি কী বলছ বরাহেশ্বর! দিদিমণি তার বাপকে ত্যাগ করে আমাদের সঙ্গে আছে। আমাদের সেবাযত্ন করছে! তাকে তুমি ....

বরাহ।। আমার কাছে সেন্টিমেন্টের কোন দাম নেই। মানবী লাঙ্গুলহীন, মানবী উলঙ্গ হতে রাজি নয়। মানবী চারপায়ে হাঁটে না। উড়তে পারে না। নীতিগতভাবে তাকে আমরা না-মানুষ রাজ্যে থাকতে দিতে পারি না। এটা শুধু নীতির প্রশ্ন!

শূকর।। বেশ! এ বিষয়ে ভোট নেওয়া হক। তোমরা সকলে কী চাও?

সকলে।। না না, দিদিমণি থাকবে। দিদিমণি আমাদের বন্ধু!

বরাহ।। থাম তোমরা! এখনই বলা হয়েছে গণভোট একটা প্রহসন! "সবার উপরে মানুষ শত্রু" এই নীতির উপর না-মানুষস্থান দাঁড়িয়ে আছে! ঐ দেখুন দেওয়ালের লিখন!

বলিবর্দ।। লোকে বলে : ব্যতিক্রমই নিয়মের পরিচায়ক!

বরাহ।। লোকে বলে! অর্থাৎ মানুষ বলে থাকে! আমরা না-মানুষ! লোকের কথায় চলি না। এ-বিষয়ে বর্তমান দলপতি শূকরনাথ তিমিরত্নের চূড়ান্ত Ruling চাই!

শূকরনাথ।। মানবী এখানেই থাকবে!

বরাহ।। [শূকরনাথকে অভিনন্দন করে] খোকা! চলে আয়। [কুমারকে নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে যায়। সেখানে মানবী এসে দাঁড়িয়েছে]

মানবী।। বাব্বা! এতক্ষণ সভা হচ্ছিল তোমাদের? [বরাহকে] একি? তোমরা কোথায় যাচ্ছ? [বরাহ অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করে কুমারসহ চলে যায়] ব্যাপার কী? বরাহভাই রাগ করে চলে গেল কেন?

শূকর।। সভা এখানেই ভঙ্গ হল।

মানবী।। তোমাদের ঘরে ঘরে খাবার দিয়ে এসেছি। যাও, খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়।

[বলিবর্দ, মানবী ও শূকরনাথ ছাড়া সকলের প্রস্থান]

মানবী। বরাহেশ্বর কি আমার উপর রাগ করেছে? [ওরা দুজনে নিরুত্তর] কী? কথা বলছ না কেন?

বলিবর্দ।। সে ঠিক তোমাকে....মানে....আসলে তুমি তো মানুষ!

মানবী।। বুঝেছি! তা লজ্জা কিসের? তোমরা সবাই যদি চাও আমি না হয় এ রাজ্য ছেড়ে চলেই যাব।

শূকরী।। না, মানবী, না। আমরা সবাই চাই তুমি এখানে থাক। কী? থাকবে তো?

মানবী।। কী জানি! সত্যই তো না-মানুষস্থানে আমি একেবারে বেমানান।

বলিবর্দ।। না। তোমাকে আমরা সবাই চাই! তুমি না-মানুষস্থানের বন্ধু। এস—

মানবী।। তোমরা এগোও, আমি আসছি। এগুলো একটু গুছিয়ে রাখি।

[বলিবর্দ ও শূকরনাথের প্রস্থান। মানবী চেয়ারটা ঠিক করতে যায়। আদমীর প্রবেশ]

আদমী।। মানবী।

মানবী।। কে? একি? তুমি! তুমি আবার এসেছ?

আদমী।। আমি আবার তোমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছি মানবী। এই পশুদের মধ্যে তোমার স্থান নেই। তুমি ফিরে এস। আমরা সশস্ত্র আক্রমণ করে শীঘ্রই এ রাজ্য ছিনিয়ে নেব। তার আগেই—

মানবী।। না। আমি এদের সঙ্গে থাকব। দরকার হয় এদের হয়ে তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করব।

আদমী।। কী বলছ তুমি! এই পশুদের তোমার ভাল লাগে?

মানবী।। লাগে।

আদমী।। Strange! তোমার বাবা—

মানবী।। বাবার কথা থাক। আমি তাঁর কাছে ফিরে যাব না। তুমি যাও।

আদমী।। আর আমার কাছে?

মানবী।। তোমার কাছে? কিন্তু ফিরে যাব বলে তো আমি এগিয়ে আসিনি।

আদমী।। ও কথাটা তো আমিও বলতে পারি।

মানবী।। কিন্তু তোমার ফিরে যাওয়া ছাড়া উপায় কী? তুমি তো এদের স্বাধীনতায় বিশ্বাস কর না। তুমি যে এদের বিপক্ষ দলের।

আদমী।। তুমি যে দলে আছ, আমি সেই দলের।

মানবী।। বোকার মত কথা বল না। তুমি পশুদের এই স্বরাজ কোনদিনই মেনে নিতে পারবে না।

আদমী।। তোমার জন্য আমি সব পারি।

মানবী।। এরাই বা সেটা মেনে নেবে কেন?

আদমী।। যদি নেয়, তোমার আপত্তি নেই তো? তখন তুমি আমাকে—

মানবী।। তুমি প্রচণ্ড ভুল করছ, আদমী! ওরা যদি বা তোমাকে মেনে নেয়, তুমি ওদের প্রভুত্ব মেনে নিতে পারবে না।

আদমী।। তোমার জন্য আমি সব পারি। I can lay down my life for you!

মানবী।। জীবন দেওয়াটা কঠিন নয় আদমী। নতুন পারিপার্শ্বিকে নিজের বৈশিষ্ট্য নিয়ে বেঁচে থাকাটাই কঠিন! তোমার বিশ্বাসের জোর নেই। শুধু উচ্ছ্বাসের জোরে এতবড় পরিবর্তন সারা জীবন তুমি সহ্য করতে পারবে না। কিন্তু আর নয়, তুমি যাও এবার। ওরা তোমাকে দেখতে পেলে খুন করে ফেলবে।

আদমী।। আমার যে অনেক কথা বলার ছিল—

মানবী।। তাহলে এস। আমার ঘরে গিয়ে বসবে চল। এমন প্রকাশ্য রাস্তায় তোমার পক্ষে দাঁড়িয়ে থাকা নিরাপদ নয়।

[দুজনে সিঁড়ি দিয়ে দ্বিতলের পথে প্রস্থান করে। নিচের তলায় বরাহ আর কুমারের প্রবেশ। কুমারের হাতে বন্দুক।]

বরাহ।। কথা শোন্ খোকা। বন্দুকে দুটো নল আছে। দুটোকেই শেষ কর্!

কুমার।। কী বলছ বাবা? দিদিমণিকে? .. ও যে আমাকে মায়ের মত করে না-মানুষ করেছে।

বরাহ।। তাহলে বন্দুকটা আমাকে দে।

কুমার।। তুমি .. তুমি দিদিমণিকে গুলি করে মারবে?

বরাহ।। আমার কাছে সেন্টিমেন্টের কোন দাম নেই। পার্টির চেয়ে বড় কিছু নেই। বাপ-মা-ভাই-বোন আমি কিছু মানি না। শত্রুর শেষ আমি রাখব না।

কুমার।। কিন্তু মানুষ হলেও দিদিমণি তো এদেশের শত্রু নয়।

বরাহ।। সে আমি বুঝব। [সে বন্দুকটা ছিনিয়ে নেয়]

কুমার।। বাবা!

বরাহ।। বললাম তো? ওসব সেন্টিমেন্ট আমি মানি না। এখন আমার কাছে সবচেয়ে বড় কথা না-মানুষদের নিরাপত্তা, পার্টির নিরাপত্তা ...

[বন্দুক তুলে টিপ করে। দ্বিতলের পাটাতনে কথা বলতে বলতে আদমী আর মানবী এগিয়ে আসে। বরাহ বন্দুক তুলে নিয়ে টিপ করে। ঘোড়া টেপে। খট্ খট্ করে দুবার শব্দ হয় কিন্তু গুলি বার হয় না। ওরা দুজন অপর দিক দিয়ে বেড়িয়ে যায়]

কী হল বল দেখি? ফায়ার হল না কেন?

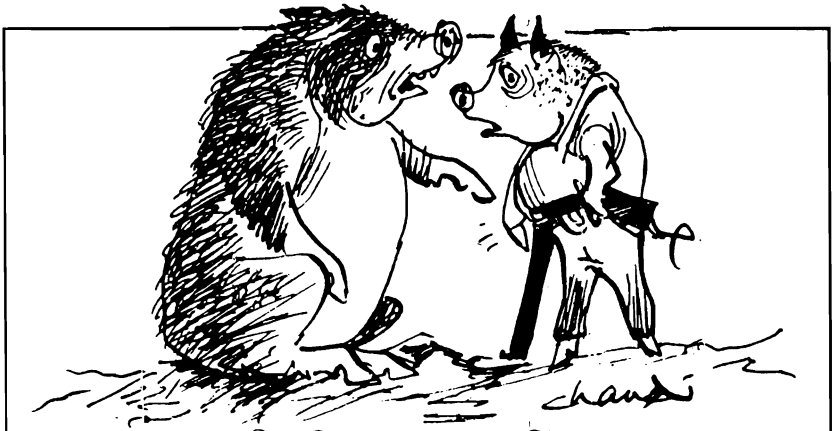

কী জানি! বন্দুকে হয়তো গুলিই নেই।

কুমার।। কী জানি! বন্দুকে হয়তো গুলিই নেই।

বরাহ।। গুলি নেই? বলিস কী? তাহলে খুলে দেখ। এখনও ওরা বেশীদূর যায়নি।

কুমার।। ওটা কেমন ক'রে খুলতে হয় তাই কি আমি জানি ছাই?

[বরাহ অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। তারপর দুজনে বন্দুকটাকে ভাঁজ করবার বহু চেষ্টা করে। পারেনা। ফুটো দিয়ে দেখবার চেষ্টা করে]

বরাহ।। গুলি কি সত্যিই নেই?

কুমার।। ভগবান জানে!

বরাহ।। খোকা!

কুমার।। বল?

বরাহ।। খবর্দার, এ কথা যেন প্রকাশ না পায়।

কুমার।। আমি তো এতদিন দিব্যি চেপে রেখেছিলাম, তুমি ফাঁস করে দিও না যেন।

বরাহ।। যা বাব্বা! এ তো থাকাও যা, না থাকাও তাই!

[আলো কমে আসে। ক্রমে মঞ্চ অন্ধকার। অন্ধকারে ঘোষণা]

নেপথ্য ঘোষণা :

ডক' ডক' ডঙ্কা ঢকাঢক বা—জে।
দেশবাসী সাজহ উৎসব সা—জে।।
আজকে ছুটির দিন ঘরে থেক না।
যা-খুশি করহ মনে খেদ রেখ না।।
একটি ঘোষণা শুধু করে যাই আমি :
পঞ্চ-মাসিকীর আজ সাল্‌তামামি।।

সামিল হও হে সবে রাজসভাতে।
নিশান পতাকা লয়ে আজকে রাতে।।
প্রণতি জানাও 'তিমিরত্ন' রাজে।
ডক' ডক' ডঙ্কা ঢকাঢক বা—জে।।

[আলো জ্বলে ওঠে। একই দৃশ্যপট। কাল : সন্ধ্যারাত্রি। পশ্চাৎপটে একটি মাত্র পরিবর্তন লক্ষণীয়। পিছনের সাইন-বোর্ডে বর্তমানে লেখা আছে : "না-মানুষস্থানে অধিবাসীদের অপ্রয়োজনে জামা-গায়ে দেওয়া চলবে না।" ঐ "অপ্রয়োজনে" শব্দটি মাত্র যোগ করা হয়েছে। বলিবর্দ রাসভনাথের কাঁধে ভর দিয়ে ঢুকলেন। চারিদিকে দেখতে দেখতে ঐ সাইনবোর্ডের দিকে তাঁর লক্ষ্য পড়ল]

বলিবর্দ।। রাসভনাথ!

রাসভ।। আজ্ঞে?

বলিবর্দ।। তুমি তো আজকাল একটু-আধটু পড়তে পার, তাই নয়?

রাসভ।। আজ্ঞে হ্যাঁ। 'রাসভ' নাম সই করতেও পারি।

বলিবর্দ।। আমি চশমাটা ফেলে এসেছি। দেখ তো, ওখানে কী লেখা আছে? ঐ "জামা গায়ে দেওয়া চলবে না" কথাগুলোর ঠিক আগে।

রাসভ।। [বানান করে] অ-প-র-জ-নে!

বলিবর্দ।। অপরজনের? অপরজনের জামা গায়ে দেওয়া চলবে না? এমন কথাতো আমি লিখেছি বলে মনে পড়ে না। অমন কথা আমি কেন লিখব?

রাসভ।। আজ্ঞে আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে। অপরজনের জামা গায়ে দিলে অপরজনের এঁটুলি গায়ে চলে আসবে। তাই বোধ হয় আপনি ওটা লিখেছিলেন।

[বলিবর্দ চিন্তাগ্রস্ত। ইতিমধ্যে একে একে সকলে সমবেত হচ্ছে। হয়গ্রীবের প্রবেশ। তার গায়ে একটা জ্যাকেট। তাতে একটি মেডেল ঝুলছে।]

বলিবর্দ।। একি হয়গ্রীব, তুমি .. তুমি গায়ে জামা দিয়েছ?

হয়গ্রীব।। তিমিরতম তো আমাকে অনুমতি দিয়েছেন, না হলে এ মেডেলটা আঁটব কিসে?

বলিবর্দ।। তিমিরতম নয়, তিমিরত্ন। ও মেডেল কিসের?

হয়গ্রীব।। বাঃ। ভুলে গেছেন? আপনিই তো সব খেতাব দিয়েছিলেন।

[দেখা গেল কুক্কুটস্বামীও জামা পরেছেন, অনড়ানও পরেছেন। তাদের বুকে মেডেল ঝুলছে রিবন দিয়ে বাঁধা। শূকরনাথের প্রবেশ। তাঁর পরনে ভেলভেটের জ্যাকেট, তাতে সেফ্‌টিপিন দিয়ে আঁটা সোনার মেডেল।]

বলিবর্দ।। তিমিরত্ন! আমি অত্যন্ত মর্মাহত। না-মানুষস্থানে কেউ জামা পড়বে না এমন আইন করা হয়েছিল, তুমি—

শূকরনাথ।। না তো! আইন ছিল 'অপ্রয়োজনে' কেউ জামা পরবে না। আমাদের কজনের নিতান্ত প্রয়োজনে হয়েছে বলেই ... , বুঝলেন না, না হলে মেডেল আঁটব কী করে? আপনিই তো এসব খেতাব দিয়েছিলেন।

বলিবর্দ।। 'অপ্রয়োজনে'! এমন কথা আমি লিখেছিলাম?

শূকরনাথ।। দেওয়ালের লিখন তো মিছে বলে না! ঐ দেখুন। আপনিই লিখেছেন।

[বরাহ এবং কুমারের প্রবেশ। কুমারের হাতে বন্দুক]

এস, এস, বরাহেশ্বর এস। এইবার আমাদের কার্যসূচী আরম্ভ হবে। বন্ধুবর তৃতীয়াবতার, তুমিই বর্তমানে পঞ্চমাসিক পরিকল্পনার চেয়ার্যানিম্যাল! প্রথম পাঁচমাসে এ-রাজ্যে—

বলিবর্দ।। নাঃ! ঐ 'অপ্রয়োজনে' কথাটা আদিতে ছিল না!

শূকরনাথ।। Silence! সভার কাজে কেউ বাধা দেবেন না। হ্যাঁ ... প্রথম পঞ্চমাসিকে কী কী কাজ হয়েছে শোনা যাক্।

অবতার।। ইয়ে... সব রিপোর্ট আমার অফিসে এখনও Compile করা হয়ে ওঠেনি। তাতে অবশ্য কোন ক্ষতি নেই। আমি অ্যাজেন্ডা অনুযায়ী একে একে বিভাগীয় প্রধানদের ডাকছি। তাঁরাই সভাকে জানাবেন। প্রথমে তিমিরভূষণ অনড়ান।

অনড়ান।। কৃষি-উন্নয়নের কাজ টার্গেটে পৌঁচেছে। গত বছরের তুলনায় এ বছর ফলন 85.37 পারসেন্ট বেশী হয়েছে। মশনে 75.82 পারসেন্ট, ছোলা 68.82 পারসেন্ট, যব 46.72 পারসেন্ট বেড়েছে।

অবতার।। যাক যাক। অত বিস্তারিত বলতে হবে না। দুধের সরবরাহ কত বেড়েছে বলুন?

অনড়ান।। গোমাতা ভবনে ইতিপূর্বে, অর্থাৎ প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে, 1,537 লিটার দুধ উৎপন্ন হত। বর্তমানে সেটা বেড়ে 2,759 লিটার হয়েছে। অর্থাৎ উৎপাদনবৃদ্ধির হার দাঁড়িয়েছে 79.09 পারসেন্ট!

বলিবর্দ।। বাঃ! বাঃ!

অনড়ান।। কিন্তু একটা কথা! উৎপাদন বৃদ্ধি পেলেও আমাদের বাছুরেরা দুধ এখন কম পাচ্ছে

শূকরনাথ।। থাক থাক। এসব বিস্তারিত আলাচনা নিষ্প্রয়োজন।

বলিবর্দ।। না, থাকবে কেন? ব্যাপারটা জানা দরকার। কেন? উৎপাদন বৃদ্ধি সত্ত্বেও বাছুরেরা দুধ পাচ্ছে না কেন? অঙ্কের হিসাবে এমনটা তো হবার কথা নয়?

অনড়ান।। তিমিরত্ন মশাই বেশ কিছুটা দুধ দৈনিক শূকর নিকেতনে পাঠিয়ে দিতে বলেছেন, তাই—

বলিবর্দ।। তিমিরত্ন?

শূকরনাথ।। হ্যাঁ বলেছি। শূকর-নিকেতনে সকলকে ব্রেন-ওয়ার্ক করতে হয়। ওদের কিছুটা বেশী দুধ না খাওয়ালে ওরা অত মাথার কাজ করতে পারে না। ঠিক আছে। তারপর?

অবতার।। গরুড়শ্রী কুক্কুটস্বামী?

কুক্কুটস্বামী।। আমাদের ডিম্বোৎপাদন প্রকল্পের অবস্থাও একই রকম। অস্ফুটিত অণ্ডে'র 43.23 শতাংশ আমরা হুকুমমতো শূকর নিকেতনে পাঠিয়ে দিচ্ছি। বাকি শুধু 56.77 শতাংশ বাচ্চা হচ্ছে।

বলিবর্দ।। বাঃ বাঃ তিমিরত্ন! তোমরা কি আজকাল ডিমের পোচও খাচ্ছ নাকি? ব্রেনওয়ার্ক করবার জন্য কি ডিমেরও প্রয়োজন আছে?

শূকরনাথ।। মিস্টার বলিবর্দ! আপনি বারে বারে এভাবে সভার কাজে বাধা সৃষ্টি করবেন না। প্লিজ! .. না, আমরা নিরামিষাশী। ডিম খাই না। ডিম আমাদের মনুষ্যরাজ্যে export করতে হচ্ছে। Foreign exchange earn করতে হচ্ছে ডিম দিয়ে।

হয়গ্রীব।। Foreign exchange বস্তুটা কী?

শূকরনাথ।। ও আপনারা বুঝবেন না। আমাদের অনেক যন্ত্রপাতি কিনতে হচ্ছে। আধুনিক কলকব্জা। সে-সব এদেশে তৈরি হয় না। ডিম-বেচা টাকায় তা আমরা কিনেছি।

হংসধ্বজ।। আমাদের ডিম দিয়ে কী কী যন্ত্রপাতি কেনা হয়েছে সেটা কি জানতে পারি?

শূকরনাথ।। নাম শুনে বুঝতে পারবে? যদি বলি Suspended Air-circulator কেনা হয়েছে চার জোড়া—কী বুঝবে? যদি বলি Wireless Broadcast Receiving apparatus কিনেছি একটা—তার মানে বোঝ? খুব তো পাকামি করছ!

সারমেয়।। আমি বুঝেছি! শূকর নিকেতনের জন্য চার জোড়া সিলিং ফ্যান কিনেছেন, আপনার শোবার ঘরে একটি রেডিও-সেট বসিয়েছেন। এই তো?

শূকরনাথ।। হ্যাঁ, তাতে কী হয়েছে? আমাকে মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হয়—তাই ফ্যানের দরকার। আমাকে দুনিয়ার সব খবর রাখতে হয়—

বলিবর্দ।। বুঝেছি! আমারই ভুল! আমার মনে হয়—

শূকরনাথ।। আপনার কী মনে হয় সে কথা আমরা জানতে চাই না। মিস্টার বলিবর্দ, আপনি বৃদ্ধ হয়েছেন, আপনি পঙ্গুও হয়ে পড়েছেন। স্বাধীনতা সংগ্রামে আপনার অবদানের কথা স্মরণে রেখে আপনাকে আমরা পেনশন দিলাম। এর পর থেকে আর আপনাকে সভায় উপস্থিত থাকার পরিশ্রম স্বীকার করতে হবে না! রাসভনাথ, ওঁকে হাত ধরে ঘরে পৌঁছে দিয়ে এস—

বলিবর্দ।। আমারই ভুল! আমারই ভুল! হায় রাম! অগর আজ হমারা 'বেটি' ইহাঁ রহ্‌তা... [রাসভনাথের হাত ধরে প্রস্থান]

শূকরনাথ।। মিস্টার বরাহেশ্বর, আপনার কাজ-কর্ম সম্বন্ধে আমরা কোন রিপোর্ট পাই না। রুদ্ধদ্বার কক্ষে আপনি দিবারাত্র কী করেন?

বরাহ।। আমার আশ্রমে বসে না-মানুষস্থানের ভবিষ্যৎ রচনা করি—

শূকর।। আশ্রম-ফাশ্রম বুঝি না। না- মানুষস্থানে কোন গোপনীয়তা আমরা বরদাস্ত করব না। সারমেয় পুত্রদ্বয়ের শিক্ষা কতদূর হয়েছে তা আমরা জানতে চাই। কী পদ্ধতিতে, তাদের কী শেখানো হচ্ছে তার রিপোর্ট আপনি দাখিল করেন না কেন?

বরাহ।। সময় হলেই তা জানতে পারবেন।

শূকর।। এভাবে পাশ কাটিয়ে যেতে দেব না। আপনি আশ্রমে বসে কী ষড়যন্ত্র করছেন আমরা জানতে চাই। কালু-ভুলুকে এখানে নিয়ে আসুন। যথেষ্ট সময় অপেক্ষা করেছি আমরা...

বরাহ।। আমারও তাই মনে হয়। সময় হয়েছে! কুমার?

[কুমার অভিবাদন করে বেরিয়ে যায়। পরমুহূর্তেই ফিরে আসে। তার হাতে দুটি কুকুরের চেন—উইংসের দিকে টান্-টান হয়ে আছে। তখনই আলো দ্রুততালে জ্বলতে নিভতে থাকবে। ঐ সঙ্গে নেপথ্যে tape-এ শোনা যাবে সারমেয় গর্জন, তার সঙ্গে শূকরনাথের আর্তকণ্ঠ। আলো-ছায়ার খেলায় মনে হবে শূকরনাথ কুকুরের আক্রমণ থেকে যেন আত্মরক্ষার চেষ্টা করে লাফালাফি করছে] Stay কালু-ভুলু! স্টে! [সারমেয় গর্জন থেমে যাবে]

শূকর।। [কপালের ঘাম মুছতে মুছতে] এ কী করেছেন আপনি! কালু-ভুলুকে বকলেস্ পরিয়েছেন কেন? জানেন না, বকলেস্ না-মানুষস্থানে prohibited?

বরাহ।। অপ্রয়োজনে prohibited! তাই তো দেওয়ালের লিখনে লেখা আছে তিমিরত্ন!!

সারমেয়।। [নেপথ্যের দিকে তাকিয়ে] কীরে কালু-ভুলু! চিনতে পারিস? [নেপথ্যে সারমেয় কণ্ঠে : গররররর্] কী রে, এ কী! ওরা কী ভাষা বলছে?

বরাহ।। মাতৃভাষা। আপনার অন্তত বোঝা উচিত।

শূকর।। মিস্টার বরাহেশ্বর। আপনি অত্যন্ত অন্যায় করেছেন। এদেশে সবাই স্বাধীন। ওদের চেন খুলে দিন। অনেকদিন থেকেই আপনার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবার কথা ভাবছিলাম। মনে হচ্ছে, আর দেরি করা ঠিক নয়। আমি আপনাকে বরখাস্ত করলাম। দিন, ওদের চেন খুলে দিন।

বরাহ।। আমিও ঠিক একই কথা ভাবছিলাম তিমিরত্ন। চেন খুলে দিচ্ছি! [উইংসের দিকে এগিয়ে যায়। তৎক্ষণাৎ সারমেয় গর্জন এবং শূকরনাথের প্রাণভয়ে দৌড়াদৌড়ির আলো-ছায়ার খেলা]

Stay! কালু-ভুলু Stay! [সারমেয় গর্জন থেমে যায়। আলো জ্বললে দেখা যায় শূকরনাথ ভূপতিত।]

মিস্টার তিমিরত্ন! এবার আমিই বরং আপনাকে পদচ্যুত করছি! এবং সেই সঙ্গে নির্বাসনদণ্ডও দিচ্ছি। না-মানুষস্থানের বাইরে চলে যেতে হবে, আপনাকে। Get out! I say, get out! [শূকরনাথ উঠে দাঁড়ায়। গায়ের ধুলো ঝাড়ে। ভয়ে ভয়ে প্রস্থানোদ্যত।] দাঁড়াও! মিস্টার তিমিরত্ন! আপনার ঐ মেডেলটা খুলে রেখে যান!

[শূকরনাথ বুক থেকে মেডেলটা খুলে মাটিতে ফেলে]

Yes! এবার যেতে পারেন।

শূকরনাথ।। তোমার... তোমার ... এতবড় স্পর্ধা ...

বরাহ।। কালু-ভুলু! [নেপথ্যে পুনরায় সারমেয় গর্জন : গর্‌র্‌র্‌]

[শূকরকে] আমি তিন গুন্‌ব! এক. দুই..

[শূকরনাথের প্রস্থান। বরাহেশ্বর মেডেলটা নিয়ে কালু-ভুলুর চেন থেকে ঝুলিয়ে দেয়। সভাকে সম্বোধন করে]

বন্ধুগণ! না-মানুষ স্থানের স্বার্থেই আমাকে এই অপ্রিয় কাজটুকু করতে হল এটুকু আশাকরি আপনারা বুঝেছেন। শূকরনাথ এ-দেশকে কোথায় নিয়ে চলেছিল! সে দুধ খেত, জামা পরত, ডিম বেচত, তাই নয়?

সবাই।। ঠিক কথা! শূকরনাথ মুর্দাবাদ!

বরাহ।। শুধু তাই নয়, ডিম-বেচা টাকায় শূকরনাথ নিজের জন্য রেডিও কিনেছে, ঘরে ফ্যান পর্যন্ত টাঙিয়েচে। সে দেশের শত্রু! ঠিক কি না?

সবাই।। ঠিক! ঠিক!

বরাহ।। দেশের সিংহাসন আবার খালি হয়ে গেল। দেশের এখন অত্যন্ত দুর্দিন। আপনারা জানেন, আমাদের মন্ত্র হচ্ছে না-মানুষস্থানে সবাই সমান। শূকরনাথের শাসনে আবার তৈরি হয়েছিল সেই দুটি শ্রেণী—আমীর

আর গরীব। আমাদের নতুন মন্ত্র হবে "আমীরী হটাও!" আমীরিআনা বরদাস্ত করব না আমরা। বলুন, সে দায়িত্ব দিয়ে কাকে আমরা সিংহাসনে বসাবো? জন্তুগণের রায় আমি মাথা পেতে নেব।

সবাই।। আপনিই বসুন। আপনিই উপযুক্ত না-মানুষ!

বরাহ।। এ বড় কঠিন দায়িত্ব! আমি সাহস পাই না। আমি আপনাদের দীন সেবক হয়েই থাকতে চাইছিলাম। গদীতে বসতে সঙ্কোচ হয়!

সবাই।। সে আমরা শুনছি না। আপনিই দুঃশাসনের হাত থেকে দেশকে রক্ষা করেছেন। "আমীরী হটাও" মন্ত্র আপনিই সার্থক করবেন। আপনিই বসুন ঐ গদীতে।

বরাহ।। বলছেন? এ গদীর প্রতি আমার কিন্তু কোনো মোহ নেই। শুধু আপনাদের অনুরোধেই...

দালালেশ্বর।। [প্রেক্ষাগৃহের সারি থেকে] সুস্‌শুনছেন স্যার? গ-গণআদালতের রায় উপেক্ষা করতে নেই!

বরাহ।। আপনারাও তাই বলছেন? অগত্যা! [দুদিকে অভিবাদন করে গদিতে বসে পড়ে]

অবতার।। শূয়ারকা বাচ্ছা ... বরাহেশ্বর—

সকলে।। যুগ যুগ জিও! যুগ যুগ জিও!!

[দালালেশ্বর নিজ আসনে বসে খুব জোরে জোরে হাততালি দিতে থাকে]

বিরতি

তৃতীয় দৃশ্য

[দৃশ্যপট অপরিবর্তিত। শুধুমাত্র একটি পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। পশ্চাদপটের বিজ্ঞপ্তিতে প্রথম পংক্তিটি ইতিপূর্বেই বদল হয়েছিল। বর্তমানে দ্বিতীয় পংক্তিতে একটি শব্দ যোগ হয়েছে। দ্বিতীয় পংক্তিতে এখন লেখা আছে : "মাত্রাতিরিক্ত মাদকদ্রব্য স্পর্শ করা চল্‌বেনা।" ঐ "মাত্রাতিরিক্ত" শব্দটি যোগ হয়েছে। এ ছাড়া দেখা যাচ্ছে শূকরনাথ সরণির নাম হয়েছে "বরাহনাথ অ্যাভিনু"। হয়গ্রীব, রাসভনাথ, কুক্কুটস্বামী, হংসধ্বজ, রমেষ এবং অবতারের প্রবেশ]

হয়গ্রীব।। স্বাধীন হবার পর বছর ঘুরে এল, দু-দুটো পঞ্চমাসিকী পরিকল্পনা পাড়ি দিলাম আমরা। অথচ আমাদের অবস্থার তো কোন পরিবর্তন হল না।

রমেষ।। কেন বাবা, তুমি তো দিব্যি আছ। মাস-মাস মাইনে পাচ্ছ, কোয়ার্টার পেয়েছ—

রাসভনাথ।। তোমার তো মজাই। আমিই বরং লেখাপড়া শেখার পরেও একটা চাকরি পাচ্ছি না।

অবতার।। চাকরি না পাও, খেতে তো পাচ্ছ।

রমেষ।। সে তো ইনসানের আমলেও পেতাম।

অবতার।। কিন্তু তখন তো স্বাধীন ছিলে না। এখন নিজের জমি নিজে চাষ করছ। নিজের দেশ নিজে শাসন করছ। কষ্ট প্রথমটা হবেই, কিন্তু আমাদের ছেলেপিলেরা নিশ্চয় ভবিষ্যতে সুখের মুখ দেখবে।

হংসধ্বজ।। কী জানি, এখন আশা করতেও ভরসা হয় না।

অবতার।। এমন কথা বলতে নেই ভাই! ওতে দেশের স্বাধীনতা বিপন্ন হতে পারে।

হংসধ্বজ।। তোমাদের কাছেই বলছি—বাইরের লোকের কাছে কি আর বল্‌তে যাব?

কুক্কুটস্বামী।। জানাজানি হলে তিমিঙ্গিল কালু-ভুলুকে লেলিয়ে দেবে।

রাসভনাথ।। তিমিঙ্গিল কে ভাই?

হয়গ্রীব।। তুই জানিস না? বরাহেশ্বর খেতাব নিয়েছে 'তিমিঙ্গিল'।

রাসভনাথ।। তিমিঙ্গিল কী ভাই?

হয়গ্রীব।। আমি চোখে দেখিনি। শুনেছি সে পেল্লায় একটা জন্তু। তিমিমাছকে আস্ত গিলে খায়।

হংসধ্বজ।। নামটা ওঁকে খুব মানিয়েছে কিন্তু। তিমিরত্ন শূকরনাথকে আস্ত গিলেই তো খেয়েছিলেন তিনি।

রমেষ।। শূকরনাথ সত্যিই দেশের শত্রু ছিল। ডিম বেচে সেই টাকায় ফ্যান কিনেছিল, রেডিও কিনেছিল—

অবতার।। সে হিসাবে তিমিঙ্গিল-মশাই অনেক অনেক ভাল।। তাই নয়? দেখ ঐ রেডিওটা উনি আমাদের বারোয়ারিতলায় দান করেছেন।

রমেষ।। দাদা, একটা কথা বলব?

অবতার।। কী?

রমেষ।। আমি দেখছি, যে-যখন গদীতে বসে আপনি তখন তারই প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে পড়েন। ব্যাপারটা কী?

অবতার।। কেন? আমি কি মিছে কথা বলছি? রেডিওটা উনি বারোয়ারীতলায় দান করেননি?

রমেষ।। করেছেন। তার কারণ তিনি নতুন মডেলের একটা টু-ইন ওয়ান কিনেছেন। কেন, আপনি জানেন না?

হংসধ্বজ।। তাই নাকি!

অবতার।। ওসব কথা আলোচনা না করাই ভাল। কোথা থেকে কার কানে যাবে!

রাসভনাথ।। আমার মতে বড়দাই ছিল ভাল।

হয়গ্রীব।। কেন?

রাসভনাথ।। বড়দা গদীতে থাকলে আমার একটা হিল্লে হয়ে যেত। জানিস, বড়দা একদিন বলেছিল ভোট দিয়ে সবাই আমাকে মন্ত্রী করে দেবে!

কুক্কুটস্বামী।। দূর! গাধা কোথাকার!

রাসভনাথ।। জানিসই তো বাপু—ধোপাপাড়ার।

রমেষ।। সব ব্যাটা সমান। যে আসে লঙ্কায় সেই হয় রাবণ।

অবতার।। না না, তা ঠিক নয়। তিমিঙ্গিল মশাই এসে গরীব আর আমীরদের ফারাকটা অনেক কমিয়ে ফেলেছেন ... না, না তর্ক কর না! তোমাদের শুধু শুধু তর্ক করা একটা স্বভাব! এসব কথা আলোচনা না করাই ভাল। কে কোথায় শুনতে পাবে—ঐ দেখ। কে যেন এদিকেই আসছে। চল, কেটে পড়ি! [সকলের প্রস্থান। মানবীর প্রবেশ]

মানবী।। কী ব্যাপার? আমাকে দেখে ওরা ওভাবে পালিয়ে গেল কেন?

[বিপরীত দিক থেকে আদমীর প্রবেশ]

আদমী।। মানবী!

মানবী।। আবার এসেছো তুমি? বলেছি তো আমি ফিরে যাব না।

আদমী।। না, আজকে অন্য একটা কথা বলতে এসেছিলাম।

মানবী।। কী কথা?

আদমী।। তুমি যখন ফিরে যাবেই না, তখন আমিই এখানে এসে থাকব।

মানবী।। এরা থাকতে দেবে কেন?

আদমী।। দেবে, আমার কথা হয়েছে।

মানবী।। আমি আবার বলছি আদমী, তুমি এদের স্বাধীনতায় বিশ্বাস কর না। শুধু আমার জন্য তুমি এটা করছ—এ তোমার সহ্য হবে না।

আদমী।। আমাকে মানিয়ে নিতেই হবে। তোমাকে ছেড়ে আমি থাকতে পারব না।

মানবী।। একটা কথা বল তো? তুমি খুশী হয়েছে এদের স্বাধীনতায়?

আদমী।। না হইনি! কারণ এদের অবস্থার কোন উন্নতি হয়নি। এরা কাজটা ভাল করেনি।

মানবী।। ঐখানেই তোমার সঙ্গে আমার মতের অমিল। এদের স্বাধীনতা পাওয়াটা ভুল নয়। কিন্তু তার পরের পর্যায়টা এরা ভুল করছে।

আদমী।। সে তো একই কথা।

মানবী।। না, এক কথা নয় ; কিন্তু এ নিয়ে এখন তর্ক করা চলবে না। তুমি যাও, ওরা তোমাকে দেখতে পেলে—

আদমী।। জানি। বেশ এখন চলে যাচ্চি। দুদিন পরেই কিন্তু ফিরে আসব আমি। পাকাপাকিভাবেই। তোমার ঘরে তখন থাকতে দেবে তো?

মানবী।। ঐ কে আসছে এদিকেই। যাও, পালাও! [আদমীর প্রস্থান]

[বন্দুক হাতে কুমারের প্রবেশ]

কুমার।। দিদিমণি! এতক্ষণ কার সঙ্গে কথা বলছিলে?

মানবী।। সে তোমার শুনে কাজ নেই।

কুমার।। আমি জানি! সে এদেশের প্রাণী নয়! ঠিক নয়?

মানবী।। তুমি কেমন করে জানলে?

কুমার।। আমাকে খবর রাখতে হয়। এ রাজ্যের নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্ব আমার। কেন তুমি আদমীকে আসতে দাও বল তো?

মানবী।। আমি বারণ করি। ও শোনে না।

কুমার।। তুমি বিশ্বাসঘাতকতা করছ।

মানবী।। না না, বিশ্বাস কর।

কুমার।। এবারকার মত ছেড়ে দিলাম। ভবিষ্যতে যদি কোনদিন ও লোকটাকে এভাবে লুকিয়ে আসতে দেখি তবে তোমাদের দুজনকেই কিন্তু শেষ করে দেব।

[মানবী মাথা নিচু করে চলে যেতে চায়]

দিদিমণি! শোন।

মানবী।। কী?

কুমার।। ইয়ে ... একটা কথা জিজ্ঞাসা করছিলাম। তুমি বন্দুক চালাতে পার?

মানবী।। হ্যাঁ, কেন?

কুমার।। এমনিই। আমার বিশ্বাস হয় না। কই ছোঁড় দেখি বন্দুকটা।

মানবী।। শুধু শুধু কেন একটা গুলি নষ্ট করবে?

কুমার।। তার মানে তুমি জান না। হুঁ হুঁ! গুল মারছিলে!

মানবী।। বেশ তাই। জানি না।

কুমার।। সত্যি, দেখাও না তোমার টিপ কেমন?

মানবী।। [একটু চুপ করে থেকে] একটা কথা বলব?

কুমার।। কী?

মানবী।। তোমাকে আমি জন্মাতে দেখেছি, এতটুকু বয়স থেকে তোমাকে পালন করেছি,—তবু তুমি ভাবছ আমার কাছে চাল মেরে পার পাবে?

কুমার।। বাঃ! আমি কী চাল মারলাম আবার?

মানবী।। কুমার, আমি জানি আজ একবছর ধরে তুমি ঐ বন্দুকটা খামোখাই বয়ে বেড়াচ্ছ। ওটা ছুঁড়তে তুমি জান না।

কুমার।। আমি? মানে ... আমিই জানি না? বাঃ কী বুদ্ধি তোমার!

মানবী।। হ্যাঁ, তুমি কিংবা তোমার বাবা, কেউই বন্দুক ছুঁড়তে জান না।

কুমার।। বাঃ বাঃ বাঃ! কী চমৎকার! আমিও জানি না, বাবাও জানে না! তোমার মাথা খারাপ!

মানবী।। যেদিন তোমরা আমাকে গুলি করে মারতে চেয়েছিলে সেদিন আমি তা দেখতে পেয়েছিলাম। এস, খামোকা একটা গুলি নষ্ট করতে হবে না। আমি শিখিয়ে দিচ্ছি—কী ভাবে ওটা খুলতে হয়, কী-ভাবে গুলি ভরতে হয়। [কুমার স্তম্ভিত] Safety catch-টা লাগানো অবস্থায় ফায়ার করলেও গুলি বের হয় না। টোটা ওতে ভরাই আছে। দেখি, দাও দেখি ওটা। [বন্দুকটা নিয়ে] এই দেখ, এইটা Safety catch. এইখানে টিপলে ভাঁজ হয়। কী হল, মুখের দিকে তাকিয়ে কী দেখছ?

কুমার।। দিদিমণি!

মানবী।। বল?

কুমার।। তুমি .. তুমি সব জানতে? তুমি জানতে যে, আমরা কেউ বন্দুক ছুঁড়তে জানি না?

মানবী।। জানতাম বইকি! এক বছর ধরেই জানি।

কুমার।। তুমি জানতে ... বাবা আর আমি তোমাকে ...

মানবী।। সেটা তো নিজে চোখেই দেখেছি।

কুমার।। তাহলে ... তাহলে কেন তুমি আমায় আজ শিখিয়ে দিলে?

[মানবী ওর মাথায় একটা চাঁটি মারে]

মানবী।। সে তুমি তোমার এই শুয়োরের বুদ্ধিতে বুঝবে না। [প্রস্থানোদ্যতা]

কুমার।। [এগিয়ে এসে ওর হাত ধরে] না, এড়িয়ে গেলে চলবে না, বলে যাও।

মানবী।। কী বলব?

কুমার।। কেন তা সত্ত্বেও আমাকে এটা শিখিয়ে দিলে?

মানবী।। না হলে কেমন করে তুমি রক্ষা করবে এ দেশ?

কুমার।। দিদিমণি, আর একটা কথা। আমাকে বুঝিয়ে দেবে, কেন তুমি এখানে আছ?

মানবী।। ওমা! এখানে থাকব না তো কোথায় যাব?

কুমার।। কেন? যেখানে মানুষেরা থাকে।

মানবী।। সাচ্চা মানুষ যে সেখানে দেখতে পাই না।

কুমার।। এখানে দেখতে পাও? সাচ্চা না-মানুষ?

মানবী।। না। তাও পাই না।

কুমার।। তবে এখানে পড়ে আছ কেন?

মানবী।। দেখছি, যদি এখানে কেউ সাচ্চা না-মানুষ হতে পারে।

কুমার।। তোমার সব কথাই হেঁয়ালি! কিছুই বোঝা যায় না।

মানবী।। সেটাই তো আমার দুঃখ। আমার ভাষাটা কেউই বুঝল না। আমি না ঘরকা, না পরকা।

কুমার।। আচ্ছা দিদিমণি, একটা কথা সত্যি করে বলবে?

মানবী।। মিথ্যে করে আবার কোন কথাটা বললাম?

কুমার।। স্বাধীন হয়ে এ রাজ্যের কোন উপকার আমরা করেছি?

মানাবী।। এ কথার জবাব কি আমার দেবার?

কুমার।। আমার তো মনে হয় এর চেয়ে তোমার বাপির আমলেই আমরা সবাই সুখে ছিলাম। আমাদের স্বাধীন হবার চেষ্টা ভুল হয়েছে।

মানবী।। আমি তা মনে করি না। সে চেষ্টাটা ভুল ছিল না—তার পরের পর্যায়ের অপচেষ্টাটা ভুল।

কুমার।। আমার উপর যদি এ-দেশের পরিচালনার ভার থাকত তাহলে শূকরনাথ যে ভুল করেছে, আর—হ্যাঁ, তোমার কাছে স্বীকার করতে আর কী দোষ—বাবা যে ভুল করে চলেছে—আমি তা করতাম না।

মানবী।। ঐটাই তো মজা ভাই। তুমি যেভাবে ভাবছ, ওরাও সেই ভাবেই

ভাবত। কিন্তু ক্ষমতার এমন মোহ যে গদীতে বসলেই সবাই পালটে যায়!

কুমার।। তুমি কি মনে কর—শূকরনাথ, আর ইয়ে ... আমার বাবা সাচ্চা বিপ্লবী?

মানবী।। প্রথমে কি তাই মনে হয়নি? কিন্তু ঐ যে বললাম—গদীর এমন মোহ—

কুমার।। না! আমি অন্তত অমন বদলে যেতাম না।

মানবী।। সেই দিনটার দিকে তাকিয়েই আমি যে প্রহর গুনছি কুমার! তুমি যে আমার হাতে গড়া!

কুমার।। কিন্তু আমি তো সে সুযোগ কোনদিনই পাব না।

মানবী।। কে বলতে পারে?

কুমার।। আর একটা কথা—

মানবী।। না। আর একটা কথাও নয়। আমি যাই। অনেক কাজ বাকি আছে—

[বলিবর্দের প্রবেশ]

বলিবর্দ।। আরে কে ও? দিদিমণি না?

মানবী।। আরে বুড়োবড়দা যে? আপনি আজ বেরিয়েছেন দেখছি।

আরে কে ও? দিদিমণি না?

বলিবর্দ।। কত আর শুয়ে থাকা যায়, বল?

কুমার।। কেমন আছেন বড়দা?

বলিবর্দ।। বুড়ো হয়ে গেছি, দাদা। শরীরে জোর পাই না। সে-কথা নয়,—এই পা-টা—

মানবী।। ভাল একজন পশুচিকিৎসককে দিয়ে দেখাতে পারলে হত। তা—আপনারা তো আবার মানুষের সঙ্গে সব সম্পর্ক ত্যাগ করেছেন!

কুমার।। সব সম্পর্ক নয়। তুমি বাদ।

বলিবর্দ।। ব্যতিক্রমই নিয়মের পরিচায়ক।

মানবী।। কিছু মনে করবেন না বড়দা—এখানে ক্রমে ক্রমে সেই ব্যতিক্রমগুলোই খুব বেশি করে নজরে পড়ছে না কি?

বলিবর্দ।। [দীর্ঘশ্বাস ফেলে] জানি দিদি! যে আসে লঙ্কায়, সেই হয় রাবণ। এরা স্বাধীন হয়ে আবার মানুষদের কু-অভ্যাসগুলোই একে একে ফিরিয়ে আনছে।

কুমার।। সে আগে হত—এখন নয়।

বলিবর্দ।। এখন নয়? ঐ আইন আমি করেছিলাম?

কুমার।। কোন্ আইন?

বলিবর্দ।। ঐ যে — "মাত্রাতিরিক্ত" মাদকদ্রব্য স্পর্শ করা চলবে না?

কুমার।। আপনিই তো সব আইন করেছেন!

বলিবর্দ।। কী জানি ভাই, বুড়ো হয়ে গেছি—সব কথা আর স্মরণ হয় না। যাক ও কথা।

কুমার।। হ্যাঁ যে কথা হচ্ছিল—আপনি ইতস্তত করবেন না। মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক রাখব না মানে এ নয় যে, মানুষের ভালটুকুও নেব না। আপনাকে একবার ভেটেনারি সার্জেনকে দিয়ে দেখাতে কারও আপত্তি হবে না। আমি আজই বাবাকে বলব।

বলিবর্দ।। বলতে হবে না। তোমার বাবা নিজে থেকেই সে ব্যবস্থা করেছে। আমি আপত্তি করেছিলাম, ও শুনল না। আজই একজন ডাক্তার এসেছিলেন আমাকে দেখতে।

মানবী।। ভালই হয়েছে—কী বললেন তিনি?

বলিবর্দ।। বললেন, এখানে তো যন্ত্রপাতি নেই, আমাকে তাঁর হাসপাতালে ভর্তি হতে হবে।

মানবী।। খুব ভাল কথা। যান, একেবারে শরীরটা সারিয়ে নিয়ে আসুন।

বলিবর্দ।। তাই যাব ভাবছি। তোমাকে কিন্তু একটা কাজ করতে হবে দিদিমণি।

মানবী।। কী কাজ?

বলিবর্দ।। বুড়োর খেয়াল! আমি তো ঘরে বসে এতদিন পেনশন খাচ্ছিলাম। তাই সময় কাটাতে এই আমাদের স্বাধীনতা-আন্দোলনের একটা ইতিহাস লিখছিলাম। সেই পাণ্ডুলিপিটা তোমার কাছে রেখে যাব। আমি যদি ফিরে না আসি তো ওটা শেষ কোরো।

মানবী।। ফিরে আপনি নিশ্চয় আসবেন। তবে ওটা আমার কাছেই রেখে যান। আমি যত্ন করে রেখে দেব।

[বরাহেশ্বরের প্রবেশ। তার গায়ে ভেলভেটের জ্যাকেট, টাইট জাঙিয়া। পায়ে সূচালো জুতো।]

বরাহ।। এই যে বড়দা, আপনি এখানে। আর আমি আপনাকে গরু-খোঁজা খুঁজে বেড়াচ্ছি।

বলিবর্দ।। গরুকে খুঁজতে তো গরু-খোঁজাই খুঁজতে হবে ভাই। কিন্তু কেন? এভাবে আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছ কেন?

বরাহ।। ডাক্তারবাবু গাড়ি নিয়ে এসে গেছেন। অনেকটা পথ তো, এখনই আপনাকে রওনা হতে হবে। ঐ যে উনি আসছেন। আসুন, আসুন ডাক্তারবাবু।

[ভেটেনারি ডাক্তারের প্রবেশ। চাপ দাড়ি ও গোঁফ, মাথায় টুপি, চোখে গগ্‌ল্‌স্‌।]

আপনার রোগি তো দিব্যি হেঁটে চলে বেড়াচ্ছে।

মানবী।। আপনাকে কোথায় দেখেছি বলুন তো? [ডাক্তার shrug করেন]

বরাহ।। তোমার বাবার আমলে দেখেছ বোধহয়।

মানবী।। তা হবে। আপনার হাসপাতালটা কোথায় ডাক্তারবাবু?

[ডাক্তার জবাব দেন না। মাথার টুপিটা খুলে 'বাও' করেন শুধু]

বরাহ।। নদীর ওপারে। অলীক নগরে। মস্ত হাসপাতাল—মানে পশু চিকিৎসালয় আর কি।

মানবী।। বড়দাকে পরীক্ষা করে কী বুঝলেন ডাক্তারবাবু? পা-টা সারবে?

[ডাক্তার পুনরায় shrug করেন। মানবী অবাক হয়]

বরাহ।। হ্যাঁ, এতক্ষণ সেই কথাই তো হচ্ছিল। উনি তো খুবই ভরসা দিচ্ছেন।

মানবী।। [ডাক্তারবাবুকে আপাদমস্তক দেখে নিয়ে] আমার নাম মানবী। আপনাকে বিশেষ করে বলছি, ডক্টর ...

[ডাক্তার নীরবে টুপি খুলে 'বাও' করেন এবং একটি ভিজিটিং কার্ড বার করে দেন।] [কার্ড দেখে]

ডক্‌টর তলাপাত্র, দেখবেন ওঁর যেন কোন কষ্ট না হয়।

ডাক্তার।। না। না।।

মানবী।। [স্বগত] যাক, বোবা নয় তাহলে।

বরাহ।। এস কুমার, আমরা ব্যবস্থাটা করে ফেলি। আসুন বড়দা।

বলিবর্দ।। চল।

মানবী।। আসুন ডাক্তারবাবু, একটু চা খেয়ে যাবেন।

বরাহ।। আবার চায়ের হাঙ্গামা করার কী দরকার?

মানবী।। বাঃ। উনি অতিথি। উনি বিদেশী। না-মানুষস্থানের বদনাম হবে না তাতে? আমার হাতের মিষ্টি খেয়ে যাবেন একটু। পুলিপিঠে বানিয়েছি যে!

ডাক্তার।। পু-পুলিপিঠে? [নিজেই নিজের মুখ হাত চাপা দেয়]

বরাহ।। [ডাক্তারের দিকে ভ্রূকুটি করে, মানবীকে] তাহলে এখানেই নিয়ে এস [মানবীর প্রস্থান] ডাক্তারবাবু! এখানে পুলিপিঠে না খেলেই চলছিল না? যাক্, চট করে খেয়ে নিয়ে চল আসুন। দেরি করবেন না [প্রস্থানোদ্যত, ফিরে এল] আর কথাবার্তা একেবারেই বলবেন না। বুঝেছেন? [ডাক্তার ঘাড় নাড়ে] এস তোমরা।

[বরাহ, কুমার ও বলিবর্দের প্রস্থান।]

ডাক্তার।। [দর্শকদের] পোষমাসে পু-পুলিপিঠে! লাভলি! না, না, কথা বলব না বাবা!

[এক কাপ চা হাতে মানবীর প্রবেশ]

মানবী।। এই নিন।

ডাক্তার।। শু-শুধু চা? পু-পুলিপিঠে কই?

[মানবী এক পা পিছিয়ে যায়]

মানবী।। ডাক্তারবাবু!

ডাক্তার।। অ্যাঁ?

মানবী।। আপনি ভেটেনারি ডাক্তার নন।

ডাক্তার।। যাঃ! [shrug করেন। টুপি খুলে বাও করেন। নানাভাবে ম্যানেজ করবার চেষ্টা করতে থাকেন]

মানবী।। বুঝেছি। তাই এতক্ষণ কথা বলছিলেন না! পাছে আমি চিনে ফেলি!

ডাক্তার।। বাঃ! ক-কথা বলব না কেন? পু-পুলিপিঠে কই গ?

মানবী ।। আপনি দালালেশ্বর!

ডাক্তার।। এই যাঃ, সব ভেস্তে দিও না মাইরি!

মানবী।। আপনি বলিবর্দাকে কসাইয়ের কাছে বেচে দেবেন!

ডাক্তার।। কী হচ্ছে মাইরি! চা-চারদিকে জন্তু-জানোয়ার। জানতে পারলে আমায় গুঁ-গুঁতিয়ে শেষ করে ফেলবে না? হ্যাঁ!

মানবী।। চলে যান বলছি এখুনি! এই মুহূর্তে!

ডাক্তার।। স্-শালার পুলিপিঠেই আমাকে খেলে! [প্রস্থানোদ্যত]

মানবী।। যান বল্‌ছি!

[কালু-ভুলুকে নিয়ে বরাহের প্রবেশ]

বরাহ।। কী হয়েছে?

ডাক্তার।। ক্যা-ক্যাচ-কট্-কট্!

বরাহ।। মানবী!

মানবী।। তুমি ভেবেছ কী? আমরা থাকতে বলিবর্দাকে কসাইখানায় পাঠাবে?

বরাহ।। [দাঁতে দাঁতে চেপে] অনেকদিন তোমাকে সহ্য করেছি! আর নয়। এখনই চলে যাও তুমি। যেমন আছ, এক বস্ত্রে! যা-ও!

মানবী।। না আমি যাব না। তুমি আমাকে তাড়াবার কে?

বরাহ।। যাবে না? বটে! তোমার ঘাড় যাবে! [নেপথ্যের দিকে তাকিয়ে] কালু-ভুলু — লিশ! লিশ!

মানবী।। আমি চিৎকার করে সবাইকে বলে দেব—বলিবর্দাকে তুমি কসাইখানায় পাঠাচ্ছ! [নেপথ্যে কালু-ভুলুর গর্জন]

বরাহ।। সে চিৎকার করার আগেই তোমার কণ্ঠনালী ছিঁড়ে ফেলবে কালু-ভুলু।

মানবী।। না, ফেলবে না! কালু-ভুলুও বুঝবে কে দেশের শত্রু, কে বন্ধু!

বরাহ।। সে ভাবে শিক্ষা পায়নি ওরা। দেখবে?

[চেন খুলে দিতে যায়। বন্দুকহাতে কুমারের প্রবেশ]

কুমার।। বাবা, ওটা কী হচ্ছে?

বরাহ।। সবার উপরে মানুষ শত্রু! না-মানুষস্থানের শেষ কলঙ্ক মোচন করছি আমি। লিশ! লিশ্।

[চেনে বাঁধা কালু-ভুলু লাফালাফি করার sound effect]

কুমার।। বাবা!

বরাহ।। তুই চুপ কর, খোকা!

কুমার।। না। চুপ করব না। কী হয়েছে বল?

ডাক্তার।। মা-মানবী আমাকে অপমান করেছে!

মানবী।। ঐ লোকটা—

বরাহ।। ও কথা উচ্চারণ করলে তোমাকে খুন করব আমি!

কুমার।। ঐ লোকটা?

বরাহ।। মানবী!

মানবী।। ডাক্তার নয়!

বরাহ।। মৃত্যু ছাড়া তোমার নিষ্কৃতি নেই।

মানবী।। ও হচ্ছে দালালেশ্বর! কসাইদের দালাল। বলিবড়দাকে—[দু হাতে মুখ ঢাকে]

কুমার।। বাবা?

বরাহ।। তুই চুপ কর!

কুমার।। [মাটিতে পদাঘাত করে] না! এভাবে সারাজীবন আমাকে চুপ করিয়ে রাখতে পারবে না।

বরাহ।। খোকা!!

কুমার।। তুমি ... তুমি বড়দাকে কসাইখানায় বেচে দিচ্ছ?

বরাহ।। হ্যাঁ দিচ্ছি! আলবাৎ দিচ্ছি! বেশ করছি, দিচ্ছি! বুড়ো বলদকে কতদিন বসিয়ে বসিয়ে খাওয়াব?

কুমার।। [ডাক্তারকে] বেরিয়ে যান! বেরিয়ে যান্ বল্‌ছি।

ডাক্তার।। যাচ্ছি, যাচ্ছি! কী ফ্যা-ফ্যাসাদ রে-বাবা! শালার পু-পুলিপিঠেই আমাকে—

বরাহ।। [ডাক্তারের হাত চেপে ধরে] না! আপনাকে তাড়াবার অধিকার এখানে কারও নেই। আমি এ রাজ্যের মালিক!

মানবী।। মালিক!

বরাহ।। আলবৎ! খোকা, বাধা দিলে ভাল হবে না!

কুমার।। কী করতে পার তুমি?

বরাহ।। কালু-ভুলুকে লেলিয়ে দেব কিন্তু!

কুমার।। আমার পিছনে?

বরাহ।। আমার কাছে সেন্টিমেন্টের কোন দাম নেই!

কুমার।। তাই বলে, শেষ পর্যন্ত আমার পিছনে? তুমি?

বরাহ।। রাজ্যের মঙ্গলই আমার একমাত্র লক্ষ্য! বাপ-মা-ভাই-ছেলে আমি কিছুই মানি না! পার্টিই আমার সর্বস্ব!

কুমার।। [বন্দুক তুলে] বেশ। দেখা যাক! দাও লেলিয়ে।

বরাহ।। তুই কি আমার কাছেও চাল মারবি? ও-বন্দুক দিয়ে তুই আমাকেও ভয় দেখাবি?

কুমার।। হ্যাঁ, দেখাব। তোমাকে আমি শেষবারের মত সাবধান করে দিচ্ছি!

বরাহ।। হা-হা-হা! নাটক করছিস্। [চেন খুলে দিয়ে] লিশ! লিশ!! [কালু-ভুলু আক্রমণ করার আগেই কুমার ফায়ার করে। কালুর ঠ্যাঙে গুলি লেগেছে। সে কেঁউকেঁউ করে একটা চক্কর মেরে ছুটে পালায়। ভুলুও তার পিছন পিছন পালায়। ডাক্তার বেগতিক দেখে সরে পড়ে]

বরাহ।। খোকা! তুই ... তুই...

কুমার।। কে তোমার খোকা? অনেক সর্বনাশ তুমি করেছ এ-দেশের। আর নয়। যাও! তুমি চলে যাও এ-রাজ্য ছেড়ে। তোমাকে আমি নির্বাসন দিলাম।

বরাহ।। খোকা! আমি ... আমি না তোর বাপ?

কুমার।। আমার কাছে সেন্টিমেন্টের কোন দাম নেই। রাজ্যের মঙ্গলই আমার একমাত্র লক্ষ্য। পার্টিই আমার সর্বস্ব!

বরাহ।। তাই বলে আমাকে! ... আমাকে তুই তাড়িয়ে দিবি?

কুমার।। বাপ-মা-ভাই-ছেলে আমি কিছু মানি না। পার্টির মঙ্গলই আমার একমাত্র লক্ষ্য। আমি বুঝেছি তিমিঙ্গিল এ রাজ্যের শত্রু!

বরাহ।। [অসহায়ভাবে] আমি কোথায় যাব?

কুমার।। খুঁজে দেখ, তিমিরত্ন কোথায় গেছে।

বরাহ।। মানবী। তুমি অন্তত কিছু বল!

মানবী।। আমি কী বলব!

বরাহ।। ও তো আমাকে অন্তত পেনশন দিতে পারে? বলিবর্দার মতো?

মানবী।। এ তোমাদের ব্যাপার। কুমার যদি বুড়ো শুয়োরকে বসিয়ে খাওয়াতে রাজি না হয় তাহলে আমি কী করতে পারি? এ নীতি তো তুমিই আমদানি করেছিলে বরাহেশ্বর।

কুমার।। ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে যাবার আগেই তোমার চলে যাওয়া উচিত, তিমিঙ্গিল!

বরাহ।। খোকা! আমি মিনতি করছি!

কুমার।। বুঝেছি! প্রথামাফিক তুমি 'এক.দুই..তিন' শুনতে চাও!

বরাহ।। এক-দুই-তিন?

কুমার।। [বন্দুকটা তুলে নিয়ে] হ্যাঁ আমি তিন গুন্‌ব। এক.দুই..

বরাহ।। যাচ্ছি! যাচ্ছি! তবে দেখে নিস্, এতে কখনও ভাল হবে না! [প্রস্থান]

মানবী।। এতদিনে আমার স্বপ্ন সফল হল!

চতুর্থ দৃশ্য

[একই দৃশ্য। কুমার একা স্টেজে আছে। পূর্বদৃশ্যে বরাহেশ্বর যে বেশে ছিল তার পরিধানে সেই পোশাক; উপারন্তু তার মুখে পাইপ। সে একটা টুলের উপর দাঁড়িয়ে প্রেক্ষাগৃহের পিছন দিকে ফিরে রঙতুলি দিয়ে পশ্চাদপটের সাইনবোর্ডে শেষ পংক্তিতে "ক্ষেত্রবিশেষে" কথাটা যোগ করছিল। শেষ লাইনটা বর্তমানে দাঁড়িয়েছে : "**ক্ষেত্রবিশেষে** ভেদাভেদ জ্ঞান রাখা চলবে না।" এ-ছাড়া আরও একটি পরিবর্তন লক্ষণীয় : "বরাহনাথ অ্যাভিনুর" নাম বদলে হয়েছে 'কুমার মার্গ'।

[মানবীর প্রবেশ।]

মানবী।। একি কুমার! ওখানে কী করছ? [কুমার চম্‌কে ওঠে। তার লেখা শেষ হয়ে গেছে। সে নিচে নেমে আসে]

কুমার।। ইয়ে ... লেখাগুলো অস্পষ্ট হয়ে গেছে। তাই কালি বুলিয়ে দিচ্ছিলাম।

মানবী।। কুমার, তোমাকে আমি জন্মাতে দেখেছি। তুমি আমার কাছেও চাল মারবে?

কুমার।। দেখ মানবী!

মানবী।। মানবী! তুমি না আমাকে চিরদিন 'দিদিমণি' ডেকে এসেছ?

কুমার।। তা এসেছি। তবে এখন আমি ... বুঝতেই তো পার। সব কিছুতেই একটু ভারিক্কি চাল আনতে হবে তো!

মানবী।। তাই তো দেখছি। বাপির মত চুরুটটাও ধরেছ দেখছি।

কুমার।। পাইপ টানতে আমার একটুও ভাল লাগে না, তোমার কাছে স্বীকার করতে আর লজ্জা কী। ... কিন্তু পাইপে ... বুঝলে না? বেশ একটা ভারিক্কি মেজাজ হয়।

মানবী।। বুঝেছি! তা এতক্ষণ ধরে "ক্ষেত্রবিশেষে" কথাটা লিখছিলে কেন?

কুমার।। আমি লিখছিলাম? বাঃ! ওটা তো বরাবরই লেখা ছিল।

মানবী।। আমার কাছে স্বীকার করতে আর লজ্জা কী?

কুমার।। [একটু থেমে] না, তোমার কাছে স্বীকার করব। তুমি বুদ্ধিমতী, কথাটা বুঝবে। দেখ, 'ভেদাভেদ জ্ঞান' একেবারে না-থাকাটা কোন কাজের নয়। এই মানুষদের কথাই ধর, ওরা তো হাজার হাজার বছর আগে স্বাধীন হয়েছে, সভ্য হয়েছে? তবু ওরা শ্রেণীগত বিভেদটা জিইয়ে রেখেছে। কেন? কারণ জন্মগতভাবে সব মানুষ যে সমান নয় এটা ওরা বুঝেছে। সকলে সমান হতে পারে না। হয়নি ; হবে না। তাদের বিদ্যা বুদ্ধি ক্ষমতায় পার্থক্য থাকবেই। সেটা মেনে নিয়েই মনুষ্যসমাজ এগিয়ে চলেছে। আমাদেরও সেইভাবে চলতে হবে!

মানবী।। তাই যদি অন্তর থেকে বিশ্বাস কর, তবে লুকিয়ে লুকিয়ে ওটা লিখছিলে কেন?

কুমার।। একই কারণে। যেহেতু নামানুষ-স্থানের সবাই বিদ্যা-বুদ্ধিতে সমান নয়! তুমি বুদ্ধিমতী, তাই চট করে বুঝে ফেললে। এরা অধিকাংশই মূর্খ। তাই ওদের স্বার্থেই 'ক্ষেত্রবিশেষে' লুকোচুরিটুকু করতে হচ্ছে। না হলে নিজের বিবেকের কাছে আমি পরিষ্কার।

মানবী।। এখানেই বোধহয় তোমার সঙ্গে তোমার পূর্ববর্তীদের পার্থক্য। তারা সবাই ছিল জ্ঞানপাপী, আর তুমি হচ্ছ Bad faith-এর শিকার!

কুমার।। বাঙলায় বল মানবী। তুমি তো জান আমি ইংরেজি বুঝি না!

মানবী।। বলছিলাম শূকরনাথ আর বরাহেশ্বর শুধু দেশের লোককেই ঠকিয়েছিল। আর তুমি ঠকাচ্ছ তোমার নিজের বিবেককে!

কুমার।। তুমি অস্বীকার করতে পার অন্যান্য জীবজন্তুর তুলনায় এই আমরা, শুয়োরেরা, বেশী বুদ্ধিমান নই?

মানবী।। তা আর কেমন করে অস্বীকার করি? বলিবর্দাকে হাটিয়ে তোমরাই তো পর পর গদিতে বসলে!

কুমার।। ব্যঙ্গোক্তি থাক মানবী! কিন্তু এ-কথা কি ঠিক নয় যে, এ রাজ্যের শাসনদণ্ড চিরকাল আমাদেরই বইতে হবে? এ কাজ ঐ সব ছাগল-গরু-ভেড়া-গাধার-দ্বারা হবে না?

মানবী।। না-মানুষ স্থানের অধিবাসীদের প্রতি খুব শ্রদ্ধা তো তোমার! তাই কী?

কুমার।। তাই শুয়োরদের ক্ষেত্রে একটা শ্রেণীগত বৈশিষ্ট্য রাখতে হয়েছে। লক্ষ্য করে দেখ, শুধু এই আমরাই পোশাক ব্যবহার করি। "ক্ষেত্রবিশেষে" এ ভেদাভেদজ্ঞানটা অনস্বীকার্য!

মানবী।। হয়গ্রীব, অনড়ান আর কুক্কুটস্বামীও একটা করে জ্যাকেট পড়ে।

কুমার।। সেটা আমার আগের আমলে হয়েছে!

মানবী।। তা বটে! ফলে এ বিষয়ে তোমার বিবেক পরিষ্কার!

কুমার।। আমি ভেবে দেখলাম। বুঝলে মানবী, এই না-মানুষস্থান একেবারে নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ছিল। একটিমাত্র বন্দুকের ভরসায় এভাবে চারিদিকে শত্রুর মোকাবিলা করা যায় না। বলির্বদার স্বপ্নটা তো আর সার্থক হল না।

মানবী।। বড়দার কোন স্বপ্নের কথা বলছ?

কুমার।। সারা পৃথিবীর জানোয়ার তো আর আমাদের আদর্শে বিপ্লব করল না।

মানবী।। বিপ্লবোত্তর সুশাসনের যে নমুনা তোমরা রাখলে তাতে কে আর

উৎসাহিত হবে বল?

কুমার।। তাই ভেবে দেখলাম, মনুষ্যজাতির সঙ্গে সন্ধি করে ফেলাই ভাল। এখন পারস্পরিক সহযোগিতায় দুপক্ষেরই সুবিধা হচ্ছে। আমরা দুধ-ডিম-পশম সরবরাহ করছি, আর ওরা আমাদের দিচ্ছে নানান আধুনিক যন্ত্রপাতি।

মানবী।। শুধু দুধ-ডিম আর পশম বলেই থামলে কেন? ঐ সঙ্গে বল ভেড়া-পাঁঠা আর মুরগীর মাংসও!

কুমার।। দেখ, মানবী—

মানবী।। কথাটা আমার শেষ হয়নি কুমার। আমার বাবার আমলে হ্যাম আর পোর্ক চালান যেত। সেটা কিন্তু তুমি প্রবর্তন করনি। সেখানেও একটা শ্রেণীগত পার্থক্য বজায় রাখার প্রয়োজন হয়েছে! তাই নয়?

কুমার।। [একটু থেমে] হয়েছে! শোন, বুঝিয়ে বলি। তুমি বুদ্ধিমতী, বুঝবে। ... তোমার মনে আছে, বহুদিন আগে এই রাজ্যের গেটের সামনে লাল-ত্রিকোণ মার্কা একটা বিজ্ঞপ্তি টাঙানো হয়েছিল?

মানবী।। তার সঙ্গে এর কী সম্পর্ক?

কুমার।। সম্পর্ক আছে। শোনই না! মানুষ জন্ম-নিয়ন্ত্রণ করে খাদ্যের সমস্যাটা সমাধান করতে চাইল। তার ফল কী হল? শিক্ষিত, বুদ্ধিমান, উন্নতশ্রেণীর মানুষ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পরিবারকে নিয়ন্ত্রণ করল ; অথচ মূর্খ, অজ্ঞান সাধারণ মেহনতী-মানুষেরা তা করল না। তার ফলে খাদ্য সমস্যা মিটুক আর না মিটুক দেখা দিল অন্য একটি সমস্যা। সমাজে বিদ্বান বুদ্ধিমান লোকের অনুপাত গেল কমে। আমি সে-ভুল এ-দেশে করব না। আমি এমনভাবে মৃত্যু-নিয়ন্ত্রণ করব না যাতে সমাজে বিদ্বান-বুদ্ধিমান শুয়োরদের অনুপাত কমে যায়!

মানবী।। বাঃ বাঃ! সুন্দর যুক্তি! অতএব তোমার বিবেক পরিষ্কার, নয়?

কুমার।। হ্যাঁ, পরিষ্কার!

মানবী।। তুমিই আমার শেষ ভরসা ছিলে কুমার!

কুমার।। তোমার এই প্যান্‌প্যানানি আমার সহ্য হয় না! কী বলতে চাইছ তুমি?

মানবী।। বলতে চাইছি এবার কি শুয়োরদের বিরুদ্ধে অন্যান্য জানোয়ারদের স্বাধীনতার লড়াই শুরু হবে?

কুমার।। মানবী! আমি তোমাকে সাবধান করে দিতে বাধ্য হচ্ছি! তুমি যদি এভাবে এ-রাজ্যে বিপ্লবাত্মক কথাবার্তা বলে বেড়াও তাহলে আমি তোমার

বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতেও কুণ্ঠিত হব না!

মানবী।। জানি! বাপের শিক্ষায় বাবা-মা-ভাই-ছেলে তুমি কিছুই মান না! পার্টিই তোমার ধ্যান ... জ্ঞান! তা আমাকে আর কী ভয় দেখাচ্ছ? বন্দুক ছোঁড়া তো আমার কাছেই শিখেছ, ভুলে গেছ সে কথা?

কুমার।। না, ভুলিনি। তবু সব জিনিসেরই তো একটা সীমা আছে?

মানবী।। তোমার লোভ আর ক্ষমতালিপ্সারও?

কুমার।। আচ্ছা, আমাকে তুমি ভয় পাও না কেন, বল তো?

মানবী।। ও মা! তোমাকে আবার ভয় পেতে যাব কেন? তোমাকে যে এতটুকু বেলা থেকে কোলে করে মানুষ করেছি।

কুমার।। মানুষ করেছ?

মানবী।। ওটা একটা কথার কথা। না-মানুষই করতে চেয়েছিলাম। সত্যিকারের না-মানুষ। তুমি মিথ্যেকারের মানুষ হয়ে উঠলে। সে কি আমার দোষ?

কুমার।। দোষের কথা হচ্ছে না। প্রশ্নটা হচ্ছে, তুমি আমাকে ভয় পাও না কেন? সবাই তো ভয় পায়। আমি এখন গোটা দেশের ... ইয়ে .. মানে—

মানবী।। রাজা! কথাটা বলতে অত সঙ্কোচ কিসের?

কুমার।। না, রাজা নই—রাষ্ট্রনেতা!

মানবী।। ওমা। চক্ষুলজ্জার বালাই এখনও কিছুটা আছে তাহলে?

কুমার।। দেখ মানবী! ঠেশ দিয়ে কথা বল না। আমি তো এ স্বপ্ন কোনদিন দেখিনি। তুমিই তো এ লোভ প্রথম দেখিয়েছিলে আমাকে। অস্বীকার করতে পার?

মানবী।। আমি তোমাকে বলেছিলাম : বাপ্‌কে তাড়িয়ে সিংহাসনে বসতে?

কুমার।। হ্যাঁ বলেছিলে। ঠিক ও-ভাষায় হয়তো বলনি—কিন্তু এ-দেশের কর্ণধার হবার স্বপ্ন তুমিই প্রথম জাগিয়ে তুলেছিলে আমার মনে। ভুলে গেছ সে কথা?

মানবী।। না ভুলিনি। তখন আমি জানতাম না তুমি এমন pig-headed idiot!

কুমার।। বাঙলায় বল!

মানবী।। ওর আর বাঙলা হয় না! [কুমার নিজেকে অপমানিত মনে করে] তোমার বোধগম্য ভাষাতে বরং আর একটা কথা বলি। আমি এখানে থাকব না। আজই আমি চলে যাচ্ছি। তোমাকে আজ আমি ঘৃণা করি! তুমি মর! মরে এদের রেহাই দাও!

কুমার।। তুমি কি মনে কর ইচ্ছে করলেই তুমি এ-রাজ্য ছেড়ে চলে যেতে পার?

মানবী।। পারি না?

কুমার।। না! তুমি বিদ্রোহের বাণী প্রচার করেছ! এমন অবস্থায় তোমাকে যেতে দিতে পারি না আমি!

মানবী।। আমি কি তাহলে তোমার প্রাসাদে বন্দী?

কুমার।। না, তুমি আমার মাননীয়া অতিথি। আজ আরও একজন অতিথি আসছেন। তুমি ইচ্ছে করলে স্বচ্ছন্দে তাঁর সঙ্গে বাস করতে পার!... কী? কথা বলছ না যে? আজ এখানে আদমী আসবে!

মানবী।। আদমী! সে এখানে কেন?

কুমার।। মনুষ্যজাতির দূত হিসাবে সে এখানে আসছে। ঐ যে সে এসে পড়েছে। এখন যত ইচ্ছে ওর সঙ্গে ইংরেজিতে ফর্‌ফর্‌ করে গল্প করতে পার। বন্ধুকে চা-পানে আপ্যায়িত কর। আমি যাই।

মানবী।। তুমি চলে যাচ্ছ কেন?

কুমার।। তোমাদের একান্ত সাক্ষাতে বাধা হয়ে দাঁড়াতে চাই না বলে। [প্রস্থান]

[আদমীর প্রবেশ। তার সর্বাঙ্গে টাইট পোশাক। অর্থাৎ জন্তুদের সাজ। শুধু কোমরে একটা তোয়ালে জড়ানো]

মানবী।। এ কী? তুমি এ কী করেছ?

[আদমী অত্যন্ত সঙ্কুচিত]

আদমী।। When in Rome be a Roman!

মানবী।। রোমে তো আমিও আছি—তাই বলে অমন অদ্ভুত পোশাক তো আমাকে পরতে হয়নি!

আদমি।। আমি মনে-প্রাণে এদের সগোত্র হতে চাই!

মানবী।। ঐ ভাবে? কুমার যেমন পাইপ মুখে দিয়ে মানুষ হতে চায়?

আদমী।। তুমি দেখে নিও—আমি দু-দিনেই না-মানুষ হয়ে যাব!

মানবী।। কেন গো? কে বলেছে তোমাকে না-মানুষ হতে?

আদমী।। তুমি! তুমি যে এ-দেশ ছেড়ে যেতে রাজি নও!

মানবী।। তাই বুঝি? তা তুমি এখানে এলে কেমন করে?

আদমী।। আমি এখানে Ambassador হয়ে এসেছি।

মানবী।। Ambassador নয়, রাজদূত। শোন, কুমার এক্কেবারেই ইংরেজি জানে না। ওর কাছে বেশী বিদ্যে জাহির কর না। যা বলবে স্রেফ বাঙলায় বোলো। বুঝলে?

আদমী।। Thanks for the tips!

মানবী।। না। 'সাবধান করে দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ।' বাঙলা, স্রেফ বাঙলা।

আদমী।। I follow! Bengali, Bengali, nothing but Bengali. [দুজনের প্রস্থান]

[অপর দিক থেকে হয়গ্রীব, অবতার ও রাসভনাথের প্রবেশ]

অবতার।। এখনই সভা বসবে। প্রগ্রেস রিপোর্টগুলো সব compile করা হয়নি এখনও। তোমরা ঠিক ঠিক বলতে পারবে তো?

রাসভনাথ।। কী যে বলেন স্যার! আপনার report আবার কবে আগে থেকে compile হয়? আমরাই তো বরাবর স্টেজে ম্যানেজ করে দিই।

অবতার।। না বাপু! সে আগের আমল এখন নেই। এখন প্রতিটি পার্সেন্টেজ থার্ড প্লেস অফ ডেসিমেল পর্যন্ত বলতে হয়। খুব নিখুঁত হিসাব দিতে হবে। কই তোমার ফাইল কই?

রাসভনাথ।। কিছু দরকার নেই স্যার! সব ফিগার আমার ঠোঁটস্থ!

অবতার।। তোমাকেই আমার ভয়। তুমি আনকোরা নতুন। বল দেখি, তোমার ডিপার্টমেন্টে কাজ-কর্ম কতদূর কী হয়েছে!

রাসভনাথ।। বলব?

অবতার।। বল। মনে কর সভাতেই বলছ। বেশ বাগিয়ে বক্তৃতার সুরে বল। মানে একটা রিহার্সাল হয়ে যাক!

রাসভনাথ।। [বক্তৃতা দেবার ঢঙে, অভিবাদন করে] Your Excellency, Birds, and Gentleanimals! আমাকে এ রাজ্যের শিক্ষা অধিকর্তা করার পর থেকে সমস্ত শিক্ষা বিভাগে চূড়ান্ত উন্নতি হয়েছে। যাকে বলে ন-ভূতো ন ভবিষ্যতি!

হয়গ্রীব।। বল কী?

রাসভনাথ।। আজ্ঞে! প্রথমত, এ বছর প্রাইমারী পর্যায়ে সমস্ত স্কুলে হান্ড্রেড পার্সেন্ট ছাত্র-ছাত্রী পাশ করেছে!

অবতার।। তাই নাকি! বাঃ বাঃ!

রাসভনাথ।। আজ্ঞে! দ্বিতীয়ত, সেকেন্ডারী পর্যায়ে অর্থাৎ হায়ার সেকেন্ডারী পরীক্ষায় বর্তমান বৎসরে ... হ্যাঁ, হান্ড্রেড পারসেন্ট পাশ করেছে!

হয়গ্রীব।। সে কী!

অবতার।। এটা বলে কী?

রাসভনাথ।। আজ্ঞে! তারপর ধরুন গ্র্যাজুয়েটশিপ পরীক্ষা যাঁরা দিয়েছিলেন এই ধরুন, বি.এ, বি-এসসি, বি.এল ...

হয়গ্রীব।। আলাদা আলাদা করে পার্সেন্টেজ বল, থার্ড প্লেস অব্ ডেসিমেল পর্যন্ত!

রাসভ।। [হাত তুলে ওকে থামিয়ে] বি. কম, এম. বি., বি. ই, বি. টেক, বি. ফার্ম. ...

হয়গ্রীব।। সবাই কি মানে ... ঐ ইয়ে?

রাসভ।। আজ্ঞে!

অবতার।। সব হান্ড্রেড পার্সেন্ট?

রাসভ।। আজ্ঞে। শুধু তাই নয়—সবাই ফার্স্ট ক্লাস অনার্স পেয়েছেন, মানে যারা পাস কোর্সে পরীক্ষা দিয়েছিলেন তারা বাদে!

[অবতার হঠাৎ মাটিতে বসে পড়ে]

হয়গ্রীব।। স-র্ব-না-শ! দেশ যে একেবারে বেকারে ভরে যাবে।

রাসভ।। ন্যাচারালি। সে দায়িত্ব এ অধম বান্দার নয়। ডক্টর রাসভনাথ জাস্ট শিক্ষা-অধিকর্তা। তিনি হান্ড্রেড পয়েন্ট জিরো-জিরো-জিরো পার্সেন্ট সাকসেসফুল। চাকরি তো দেবেন আপনারা!

হয়গ্রীব।। আমরা?

রাসভ।। নয়? আপনি ডাইরেক্টর অব এমপ্লয়মেন্ট, অবতারদা চেয়ার্যানিম্যাল অব দ্য প্ল্যানিং কমিশন। আপনারাই তো চাকরি দেনেবালা!

হয়গ্রীব।। সেরেছে! তা রাতারাতি কী এমন এডুকেশন সিস্টেম চালু করেছো?

রাসভ।। সিম্পল। আমার সাতটি শ্যালক। আই মীন, আমার বেটার হাফের ব্রাদার। তারা সাতজনে সাতটা কোচিং ইনস্টিটুট খুলেছে। আমারই টাকায়। মানে বেনামে। ওদের সাতজনই জ্যোতিষসম্রাট! প্রতিটি পরীক্ষার আগের রাত্রে লাস্ট-মোমেন্ট-সাজেস্ন যা ছাড়ে দেখলে ট্যারা হয়ে যাবেন!

অবতার।। সেও কি হান্ড্রেড পার্সেন্ট?

রাসভ।। আজ্ঞে না। হান্ড্রেড পার্সন্ট হলে তো সবাই বলত কোশ্চেন ফাঁস হয়ে গেছে! তা হতে দেব কেন? নাইন্টি নাইন পয়েন্ট নাইন...নাইন...নাইন পার্সেন্ট।

হয়গ্রীব।। এখনো তো রেজাল্ট অফিশিয়ালি আউট হয়নি। কিছু গোবেচারা জাতীয় অ্যানিম্যালকে ধরে ফেল করিয়ে দেওয়া যায় না?

অবতার।। [উঠে দাঁড়ায়] বাবা রাসভনাথ!

রাসভ।। ডক্টর রাসভনাথ, ইফ্ য়ু প্লীজ!

অবতার।। হ্যাঁ, বাবা ডক্টর রাসভনাথ! তুমি বাপু এবছর একটা general disgrace নম্বর দিয়ে কিছু কিছু ছাত্র-ছাত্রীকে গাড্ডু খাইয়ে দাও! তা হতে পারে না?

রাসভ।। [একটু ভেবে নিয়ে] একেবারে যে অসম্ভব তা বলব না। তবে কি জানেন, তার আগে আপনাদের একটা কাজ করতে হবে—

অবতার।। বল কী কাজ। আমি সব কিছুতেই রাজি!

রাসভনাথ।। শিক্ষা, অধিকর্তার পদ থেকে প্রোমোশন দিয়ে আমাকে অশ্বাবাস-প্রদেশের গভর্নর করে দিতে হবে!

অবতার।। যা ব্বাবা! কেন?

রাসভনাথ।। রেজাল্ট অফিসিয়ালি ঘোষিত না হলেও ছাত্রছাত্রীরা তা জেনে গেছে। এখন general disgrace নম্বর দেওয়া মানেই নানান বখেড়া। ছাত্র-ধর্মঘট-বন্‌ধ্‌-আর ঘেরাও! হে-হে! আমি তো আর গাধা নেই?

অবতার।। তা বটে! দিব্যি বিচক্ষণ হয়ে উঠেছ দেখছি! [রমেষের প্রবেশ]

রমেষ।। এই যে, আপনারা সবাই এসে গেছেন। সভা কখন বসবে?

হয়গ্রীব।। একটু পরেই। তারপর, কেমন আছ, রমেষ-ভাই?

রমেষ।। আর দাদা, আমাদের থাকা আর না থাকা! ছাগল-ভেড়ার জীবন মানে তো পদ্মপত্রে পানি! কবে যে কসাইখানা থেকে তলপ আসবে!

অবতার।। হুম্‌, জানি। তোমাদের আজকাল একটু অসুবিধা হচ্ছে বটে। অথচ ফরেন এক্সচেঞ্জের কথা চিন্তা করে ঐ মাংস-রপ্তানিটা বন্ধও করা যাচ্ছে না।

রমেষ।। মুশ্‌কিল কী জানেন? স্বাধীনতার আগে হ্যাম-পোর্কও তো যথেষ্ট সাপ্লাই হত। এখন সেসব বন্ধ। চাপটা তাই ভেড়াদের উপর বেশি পড়েছে।

অবতার।। বুঝি ভাই বুঝি! কিন্তু কী করবে বল?

রমেষ।। সেদিন আমার ভাইপোটাকে ধরে নিয়ে গেল। তার মায়ের সে কী কান্না!

অবতার।। ভাদ্দরবউয়ের সঙ্গে কথা বল তো? তাকে বোঝাও এও ঐ স্বাধীনতারই মূল্য!

রমেষ।। আপনিই তো মালিকের ডান হাত। দিন না স্যার, একটা ব্যবস্থা করে। আপনাকে না হয় কিছু পান খেতে দিচ্ছি! জাতভাইয়ের কান্না আর চোখে দেখা যায় না!

অবতার।। [হয়গ্রীব ও রাসভকে] এক মিনিট [রমেষকে ফুটলাইটের দিকে টেনে এনে জনান্তিকে] সবার সামনে পান খাওয়ার কথা বলছ কেন? আমি কি তোমার মতো ছাগল-ভেড়া? আমি পান খাই?

রমেষ।। না .. মানে .. ইয়ে .. পান 'এথি', 'ইয়ে'...

অবতার।। বুঝেছি শোন, গ্র্যাম-ফেড মাটনের চাহিদাটাই বেশি! বল তো তোমাদের পরিবারে ছোলা সরবরাহটা বন্ধ করে দিই। ওটা না হয় ব্ল্যাকে ঝেড়ে দেব। সে তোমাকে ভাবতে হবে না!

রমেষ।। ছোলার র‍্যাসন বন্ধ করে দেবেন? তাহলে খাব কী?

অবতার।। তোমারই ভালোর জন্য বলছিলাম। বেশ, খাও, খুব ছোলা খাও আর কোঁৎকা হও! দুদিনেই তোমার উপর নজর পড়ুক! এমনিই তো খোদার খাসি হয়ে উঠেছ! আমার আর কী?

রমেষ।। না, না, আপনি রাগ করবেন না স্যার। আচ্ছা বেশ, ছোলাটা না হয় বন্ধই করে দিন। দুদিন উপোস করেই দেখি। কিন্তু তাতেই কি রেহাই পাব?

অবতার।। সে ব্যবস্থাও করতে পারি ... তবে কী জান? এসব বাপু শুধু হাতে হয় না! আমার নিজের জন্য বল্‌ছি না। তুমি তো জানই আমি পান খাই না! তবে ঐ-সব কেরানি যারা তোমাদের Selection list বানায় তাদের খুশি করে দিতে হবে একটু।

রমেষ।। সে তো বটেই। কী দেব বলুন?

হয়গ্রীব।। [রাসভনাথকে গোঁত্তা মেরে] শালা দাঁও মারছে!

রাসভনাথ।। সে আর বুঝিনি আমি?

অবতার।। [রমেষকে] কী আর দেবে? তুমি আমার আপনার লোক। ঠিক আছে, কুইন্টাল-খানেক পশম দিও না হয়। ওদের একটা একটা কোট বানিয়ে দেব। তোমাদের পরিবারের কারও নাম যাবে না তাহলে।

রমেষ।। [দুটি হাত জোড় করে] দাদা! কেনা হয়ে রইলাম! কালই পাঠিয়ে দেব!

[বলিবর্দের প্রবেশ। লাঠি হাতে। আরও বৃদ্ধ হয়ে গেছে]

হয়গ্রীব।। এই যে বড়দা, আজকাল কেমন আছেন?

বলিবর্দ।। বয়স বাড়ছে, দুর্বল হয়ে পড়ছি। না হলে, ভালই। তোমরা কেমন আছ সকলে?

হয়গ্রীব।। ভাল।

অবতার।। বেশ ভাল।

বলিবর্দ।। রমেষ ভায়া চুপচাপ যে?

রমেষ।। আজ্ঞে না, আমরাও দিব্যি আছি।

বলিবর্দ।। শুনলাম কুমার নাকি মানুষদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে?

অবতার।। আজ্ঞে হ্যাঁ। আগেকার আমল আর নেই। এখন ফোর্থ ওয়ার্ল্ডে আমাদের খুব প্রতিষ্ঠা। কুমার বাহাদুর তাঁর রাজসভায় মানুষদূতকেও থাকতে দেবেন এখন থেকে।

বলিবর্দ।। কুমার বুঝি আজকাল 'বাহাদুর' হয়েছে? তা ভাল। তা চুক্তিটা কী জাতীয়?

অবতার।। এই বিনিময় প্রথা আর কি। আমরা দুধ দিচ্ছি, পশম দিচ্ছি, ওরা তার বদলে—

বলিবর্দ।। শুধু দুধ আর পশম? ডিম আর মাংস নয়? [সকলে নীরব]
কী রমেষ ভায়া, তুমি কিছু খবর রাখ?

রমেষ।। [অবতারের দিকে একনজর দেখে নিয়ে] আপনি আর এসব কথার মধ্যে কেন থাকছেন বুড়োদা? বললাম তো, আমরা, মানে মেষেরা, ভালই আছি!

রাসভনাথ।। [অন্য সকলের উদ্দেশ্যে] এক মিনিট। বড়দা শুনুন। [বলিবর্দকে ফুটলাইটের দিকে টেনে এনে জনান্তিকে] ইয়ে — আপনার সেই স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসটা কতদূর?

বলিবর্দ।। কেন বল তো?

রাসভনাথ।। না ... মানে ... ইয়ে—আপনি তো ওটা নিজের পয়সায় ছাপাতে পারবেন না। যদি বলেন আপনাকে একটা সরকারী অনুদান পাইয়ে দিই।

বলিবর্দ।। তুমি?

রাসভনাথ।। [খপ করে প্রণাম করে] আপনাকে প্রণাম করা হয়নি। আমি শিক্ষা অধিকর্তা হয়েছি।

বলিবর্দ।। [চশমাটা কপালে তুলে ওকে ভাল করে দেখেন। গায়ে হাত বুলিয়ে] তুমি, মানে সেই রাসভনাথ তো?

রাসভনাথ।। আজ্ঞে। আদি নিবাস সেই ধোপাপাড়া। চিনতে পারছেন না?

বলিবর্দ।। কী জানি! সেই তুমি শিক্ষা-অধিকর্তা হয়েছ?

রাসভনাথ।। [পুনরায় প্রণাম করে] আজ্ঞে! গেল বছর ডক্‌টরেটও পেয়েছি যে!

বলিবর্দ।। অ! [ঢোক গিলে চুপ করে যান]

রাসভনাথ।। পাণ্ডুলিপিটা যদি একবার আমাকে দেখান।

বলিবর্দ।। তুমি আমাকে বই ছাপাতে সাহায্য করতে চাও! তোমার এত বিদ্যানুরাগ! শেষে ভালমন্দ কিছু একটা হয়ে যাবে না তো?

রাসভনাথ।। কী যে বলেন বড়দা!

অবতার।। [হয়গ্রীবকে গোঁত্তা মেরে] শালা দাঁও মারছে!

হয়গ্রীব।। সে আর বুঝিনি আমি?

রাসভনাথ।। [বলিবর্দকে] আপনি তো জানেনই ...ঘুষ আমি খাই না। কিন্তু যারা ঐ কেসগুলো deal করে তারা তো সবাই — কী বলে ভাল — ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির নয় ... বুঝতেই তো পারছেন ... হেঁ হেঁ!

বলিবর্দ।। হ্যাঁ। এতক্ষণে বুঝতে পারছি! তা তোমাকে আর কষ্ট করতে হবেনা বাবা রাসভনাথ! ও বই আমি ছাপাব না।

রাসভনাথ।। কেন? কেন?

বলিবর্দ।। তোমাদের কুমার বাহাদুরের হুকুম এ-দেশে বই ছাপাবার আগে প্রথমে censor করতে হবে।

রাসভনাথ।। তা তো হবেই। তা দেব। আমি দেখে দেব। সেজন্য যদি আপনার বিবেকে বাধে তাহলে আমাকে না হয় কিছু কমিশন ধরে দেবেন।

বলিবর্দ।। থাক বাপু। ও বই আমি ছাপাচ্ছি না।

রাসভনাথ।। এটা আপনার রাগের কথা হল না বড়দা?

অবতার।। [হয়গ্রীবকে জনান্তিকে] দেখ্ দেখ্, ডক্টর সাহেবের মুখটা লম্বা হয়ে গেছে। কেস্ বোধহয় কেঁচে গেছে!

হয়গ্রীব।। সে আর বলতে।

অবতার।। [রাসভনাথকে] আচ্ছা, তুমি চালিয়ে যাও ডাক্তার ; আমরা চলি। [হয়গ্রীব ও অবতারের প্রস্থান]

বলিবর্দ।। না ভাই, রাগ অভিমানের ঊর্ধ্বে উঠেচি আমি।

রাসভনাথ।। তা বইটা যখন ছাপাবেনই না, পড়তে দিন একবার।

বলিবর্দ।। তা নিও ; তুমি তো একজন পণ্ডিত গর্দভ হয়েছ এখন!

রাসভনাথ।। হেঁ হেঁ ... কী যে বলেন!

বলিবর্দ।। কী যে বলেন মানে? তুমি তো ডক্টরেট পেয়েছ বললে—

রাসভনাথ।। আজ্ঞে। পি. এইচ. ডি.। এবার পি. আর. এস.-টার জন্যেও চেষ্টা করছি।

বলিবর্দ।। তোমার থিসিস্ কিসের উপর ছিল?

রাসভনাথ।। অত্যন্ত জটিল একটা বিষয়। আমার গবেষণার বিষয়বস্তু ছিল : 'আমীরী হটাও মন্ত্রের প্রয়োগ এবং তাহার সামাজিক ও অর্থনৈতিক ফলশ্রুতি।'

বলিবর্দ।। খুবই চিত্তাকর্ষক বিষয়। তা কী প্রমাণ করেছ তুমি?

রাসভনাথ।। আপনি কি বুঝবেন? আচ্ছা সহজ ভাষাতেই বলি : আমীরী আর গরীবী হচ্ছে দুটি বিপরীতার্থক শব্দ। একটি পজেটিভ একটি নেগেটিভ শব্দ। ধনাত্মক আর ঋণাত্মক। আবার মজা হচ্ছে এই যে, একে অপরের পরিপূরক! তিমিঙ্গিল গদীতে বসেই হুকুম জারি করলেন—আমীরী হটাও! অর্থাৎ বড়লোক আমরা রাখব না। বড়লোকিয়ানার দিন শেষ। কিন্তু উনি হিসেব করে দেখলেন না আমীর আর গরীব এ দুটি 'ভেরিএব্‌ল্' হচ্ছে inversely proportional! ব্যাপারটা হচ্ছে আমীরী

varies inversely as গরীবী ; অঙ্কশাস্ত্রের ফর্মূলায় আমীরী into গরীবী is equal to 'K'. এখানে 'K'. একটি ধ্রুবক!

বলিবর্দ।। কিছুই বুঝলাম না!

রাসভনাথ।। আমি জানতাম! ব্যাপারটা অত্যন্ত জটিল! আচ্ছা আপনি কোন ল্যাবরেটারীতে 'U'-tube দেখেছেন? এ-দিকে পারা উঠ্‌লে ও-দিকের পারা নেমে যায়?

বলিবর্দ।। না।

রাসভনাথ।। দাঁড়িপাল্লা দেখেছেন?

বলিবর্দ।। হ্যাঁ। তা দেখেছি।

রাসভনাথ।। তাহলেই হবে। মনে করুন আমীরী আর গরীবী হচ্ছে দাঁড়িপাল্লার দুটি পাল্লা। তিমিঙ্গিলের আমলে আমরা আমীরীকে হটাবার চেষ্টা করলাম। ফলশ্রুতি কী হল? তার ফলে বিপরীত মেরুতে হল বিপরীত প্রতিক্রিয়া—আমীরী হটাও করতে গিয়ে আসলে হল গরীবী বাড়াও! দেশে গরীবের সংখ্যা গেল বেড়ে। কিন্তু সেটা তো আমাদের উদ্দেশ্য নয়। তাই কুমার বাহাদুর গদিতে এসে হুকুম জারী করলেন—আমীরী হটাও নয় : এবার আমাদের মন্ত্র গরীবী হটাও! মন্ত্রটা শুনতে বেশ গালভারি! কিন্তু ঐ মন্ত্র প্রয়োগ করবার দায়িত্ব তিনি কার উপর দিলেন? সেই চিরকালের অবতার এ্যান্ড কোম্পানির উপর। যিনি যখন গদিতে বসে নূতন নীতি আমদানী করেন তখনই অবতার এ্যান্ড কোম্পানি এসে তা প্রয়োগ করে, আর নিজের কোলে ঝোল টানে। এবারও তাই হচ্ছে। লক্ষ্য করে দেখুন, গরীবী হটাও করতে গিয়ে ওঁরা আসলে করছেন আমীরী বাড়াও! একটা কমলেই অন্যটা বাড়বে! ঐ দাঁড়িপাল্লার মত আর কি। আমীরী হটাও তো গরীবী বাড়াও ; ঔর গরীবী হটাও তো আমীরী বাড়াও!

বলিবর্দ।। দাঁড়াও, দাঁড়াও! আমার আবার সব গুলিয়ে গেল!

রাসভনাথ।। যাবেই। আমার গোটা থিসিসের শেষ দিকের পাতা কাটা নেই। মানে, পরীক্ষকেরাও সাহস করে পড়ে দেখেননি।

বলিবর্দ।। তাহলে শেষ পর্যন্ত কী দাঁড়াল?

রাসভনাথ।। একটু পরে রাজসভায় আসবেন। স্বচক্ষে দেখে যাবেন!

বলিবর্দ।। কী?

রাসভনাথ।। ধ্রুবক! ঐ শুনুন ঘোষণা!

[নেপথ্যে নাকাড়ার শব্দ]

$$\text{গরীবী} \propto \text{আমীরী}$$

$$\text{বা, গরীবী} = K.\frac{1}{\text{আমীরী}}$$

$$\text{বা, গরীবী} \times \text{আমীরী} = K$$

[ঘোষণা শুরু হতেই মঞ্চ অন্ধকার]

ঢকাঢক্ ঢকাঢক্ ঢকাঢক হ।
যে যেখানে আছ শুন শুনহ।।
আমীর-গরীব সবে নিচু কর মা-থা।
আসিছেন নামানুষ স্থানের ত্রা-তা।।
পথ ছাড় সকলে জন্তু ও পক্ষী।
ব্যাঘ্র ও বলদে এক ঘাটে লক্ষ্মী।।
সাবধান পথচারী নিকট ও দূর।
শ্রীল্ শতশ্রীযুক্ত রাজা বাহাদুর।।

[আলো জ্বলে। একই দৃশ্যপট। জন্তু-জানোয়ারেরা দুই সারিতে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে। রাজকীয় আড়ম্বরে কুমার প্রবেশ করে। নিজ আসনের সামনে দাঁড়িয়ে দুদিকে বাও করে। জানোয়ারদের মধ্যে কেবলমাত্র রমেষ ও বলিবর্দ অনুপস্থিত। কুমারের পোশাক প্রথম দৃশ্যে দৃষ্ট ইনসানের অবিকল নকল]

কুমার।। হে আমার প্রিয় দেশবাসী! আবার আমরা আমাদের স্বাধীনতা উৎসবের দিনে সমবেত হয়েছি। তোমরা যে অনলস-নিষ্ঠায় কপালের ঘাম, বুকের

রক্ত, টেংরির মাংস, গায়ের লোম, পেটের ডিম এবং বাঁটের দুধ দিয়ে এই না-মানুষস্থানের স্বাধীনতা সুরক্ষিত করছ এ জন্য প্রতিটি দেশবাসীর তরফে আমি আমার কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি!

সকলে।। শূয়ারকা বাচ্চা কুমার বাহাদুর ... যুগ যুগ জিও! যুগ যুগ জিও!

কুমার।। [পুনরায় অভিবাদন করে] হে আমার প্রিয় প্রজাবৃন্দ! তোমরা জান, এ রাজ্যের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য আমাদের কী অপরিসীম শ্রমস্বীকার করতে হয়। এ রাজ্যের চতুর্দিকে আর একটিও পশুরাজ্য নেই। সবই মানুষদের রাজত্ব। তাই আমরা সর্বদাই সশঙ্ক হয়ে ছিলাম। তোমরা শুনলে সুখী হবে যে, মনুষ্যজাতির সঙ্গে আমাদের দীর্ঘদিনের বৈরিতার অবসান হয়েছে। মানুষ আর না-মানুষ আজ আর শত্রু নয়। তারা পরস্পরের বন্ধু!

[অবতার জোরে জোরে হাততালি দেয়। ডানদিকে রাসভনাথ ও বাঁয়ে হয়গ্রীবকে গোঁত্তা মারে। তারাও হাততালি দেয়]

সকলে।। মানুষ না-মানুষ ভাই ভাই। ... মানুষ না-মানুষ ভাই ভাই।

[একজন উঠে গিয়ে "সবার উপরে মানুষ শত্রু" লাইনটা কেটে দেয়]

কুমার।। [হাত তুলে ওদের শান্ত হতে বলে] আজ এই সভায় মনুষ্যজাতির প্রতিভূ এসে যোগ দেবেন। আমাদের স্বীকৃতি দিতে ওরা বাধ্য হয়েছে। এ জয় আমার নয় ... এ জয় আপনাদের!

সকলে।। যুগ যুগ জিও... যুগ যুগ জিও!

কুমার।। তার মানে এ নয় বন্ধুগণ, যে আমরা আমাদের স্বাধীনতা রক্ষার দায়িত্বে কোন ঢিলে দেব! আমরা কোন ঝুঁকি নিতে পারি না! আমাদের আত্মরক্ষা বিভাগ, সৈন্য বিভাগ যেমন চলছে তেমনিই চলবে! বলুন আপনারা, স্বাধীনতা রক্ষার ব্যাপারে আমরা কি কোন শিথিলতা দেখাতে পারি?

সকলে।। কখনই নয়! কখনই নয়।

কুমার।। আমি জানতাম। জন্তুগণের রায়ই আমি মাথা পেতে নেব। মনুষ্যজাতির সঙ্গে সন্ধি হয়েছে, ভাল কথা। তাই বলে আমাদের ব্যবস্থাপনায় কোন শিথিলতা হবে না। আপনারা পূর্বের মতই কপালের ঘাম, বুকের রক্ত, টেংড়ির মাংস, গায়ের লোম, পেটের ডিম ও বাঁটের দুধ অকাতরে দান করে এ স্বাধীনতা আরও সুরক্ষিত করে তুলুন! বলুন আমার সঙ্গে আমীরী গরীবী—

সকলে।। দোনোই হটাও! [তিনবার স্লোগান দেওয়ার পর]

কুমার।। অবতার। মনুষ্যজাতির প্রতিনিধি বাইরে অপেক্ষা করছেন। তুমি তাঁকে

সসম্মানে নিয়ে এস [প্রেক্ষাগৃহের দিকে তাকিয়ে অভিবাদন করে] আপনাদের অনুমতি নিয়ে, আপনাদের অনুমতি নিয়ে [গদীতে বসে। সকলে বসে।]

[অবতার ইতিমধ্যে আদমীকে নিয়ে এসেছে। আদমী তার পরিচয়পত্র আনুষ্ঠানিকভাবে দাখিল করে অভিবাদন করে]

আপনার উপস্থিতিতে আমাদের রাজসভা আজ ধন্য হল। কিন্তু হে মনুষ্য জাতির প্রতিভূ, আপনি মানুষের উপযুক্ত পোশাক না পরে, এই আমাদের মত এমন ... ইয়ে হয়ে এসেছেন কেন?

আদমী।। [বাও করে] When in Rome be a Roman!

[কুমার তার দক্ষিণ কর্ণমূল রাসভনাথের দিকে বাড়িয়ে দেয়]

রাসভনাথ।। Your Excellency! উনি বলছেন : চামড়ার উপর রোমরাজি আছে তাতেই আমি রোমাঞ্চিত!

কুমার।। আপনি পণ্ডিতের মতো কথা বলেছেন। সমগ্র পশুজাত রোম নিয়ে রোমানচিত! আপনি আসন গ্রহণ করুন এবং আমাদের সভার কাজ দেখুন। [আদমী বসে] হে তৃতীয়াবতার! আমাদের কোন্ বিভাগে কী অগ্রগতি হয়ছে বলুন!

অবতার।। হে মহামহিম কুমার বাহাদূর! আমাদের প্রতিটি বিভাগে প্রচুর উন্নতি হয়েছে! বলিবর্দ, শূকরনাথ অথবা আপনার পূজ্যপাদ পিতৃদেবের আমলেও এমন উন্নতি কখনো হয়নি। ধরা যাক শিক্ষা বিভাগ—

রাসভনাথ।। আমি বলি স্যার?

অবতার।। তুমি চুপ কর! [কুমারকে] ডক্টর রাসভনাথকে শিক্ষাবিভাগের দায়িত্ব দেওয়ার পর থেকে অভূতপূর্ব উন্নতি পরিলক্ষিত হচ্ছে। আলোচ্য বৎসরে প্রতিটি পরীক্ষার পাশের হার—

রাসভনাথ। Hundred ...

অবতার।। Shut up! [কুমারকে] আশাতিরিক্ত! সপ্তাহখানেকের ভিতরেই পাশের হার কী হয়েছে জানা যাবে। শিক্ষা অধিকর্তা চিন্তা করেছেন গ্রেস-মার্ক দিয়ে আরও কিছু ছাত্রকে পাশ করানো যায় কিনা— কারণ আমাদের Director of Employment মিস্টার হয়গ্রীব জানাচ্ছেন যে, তাঁর পঞ্চাশ হাজার চাকুরি খালি পড়ে আছে! অন্যান্য বিভাগে—

কুমার।। থাক থাক। প্রতিটি বিভাগের বিস্তারিত বিবরণ নিষ্প্রয়োজন। আপনাদের সকলেরই সময়ের দাম আছে। হে তৃতীয়াবতার, আপনি বরং রিপোর্টগুলি ছাপিয়ে বিলি করার ব্যবস্থা করুন। ভাল কথা, স্বাধীনতা-আন্দোলনের

একটা ইতিহাস লেখার কথা হচ্ছিল। তার কতদূর?

অবতার।। ডক্টর রাসভনাথ শিক্ষা বিভাগকে একেবারে হান্ড্রেট পারসেন্ট উন্নত করেছেন। তাঁর সেখানে আর করণীয় কিছু নেই। আমরা এবার তাঁকে অশ্বাবাসের গভর্নর করে দেব ভাবছি। অবসর সময়ে তিনি ঐ ইতিহাস রচনা করতে পারেন।

কুমার।। তা পারেন। [রাসভনাথকে] ছাপতে দেওয়ার আগে ওটা আমাকে দেখিও!

রাসভনাথ।। আজ্ঞে সে আর বলতে!

আদমী।। Your Excellency! আপনার palaceটা air-condition করার কী হল? যাই বলুন, আপনাদের দেশটা arid and humid. You must have minimum comfort, or you suffer for nothing!

[কুমার রাসভের দিকে কর্ণমূল বাড়িয়ে দেন]

রাসভনাথ।। [জনান্তিকে কুমারকে] উনি বলছেন : আপনার প্যালেসে, মানে প্রাসাদে, কন্‌ডিসন্ এয়ার! অর্থাৎ কন্‌কনে ঠাণ্ডা হাওয়া। দেশটা এ্যারিড, মানে ঠাণ্ডা! You must have —'মিনিমাম কম্পার্টার', অর্থাৎ ছোট মাপের একটি গলাবন্দ আপনার গলায় জড়ানো উচিত। না হলে আপনি for nothing-suffer .. খামোকা কষ্ট পাবেন। এই আর কি! ঐ সর্দি লেগে!

কুমার।। আরে না না। আমি এ দেশের আবহাওয়ায় অভ্যস্ত।

আদমী।। As you please!

রাসভনাথ।। Ass মানে গাধা, you তুমি—

কুমার।। তা গাধা তো তুমি, আমার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে বলল কেন?

রাসভনাথ।। আজ্ঞে আপনাকেই যে বলছে! Ass — you — please ... অর্থাৎ গাধাকে আপনি দয়া করে! দয়া করে কী? একটি মিনিসাইজ কম্পার্টার দান করুন। দান না হলে সেও for nothing suffer ঐ সর্দি লেগে কষ্ট পাবে আর কি!

কুমার।। ও আচ্ছা আচ্ছা। তা না হয় দেব। [আদমীকে] তা আপনাদের যে খানকতক ডানলোপিলো গদি আর ফার্নিচার পাঠাতে বলেছিলাম, তার কী হল?

আদমী।। আসেনি? Strange! I'll remind the Export Commissioner.

রাসভনাথ।। আসেনি? তা তো আসবেই না! আমার এক্সপোর্ট কমিশনটাও তো পাইনি। সেটার কথা হুজুরকে remind করিয়ে দিচ্ছি। মানে মনে করিয়ে দিচ্ছি—।

কুমার।। [আদমীকে ধমকের সুরে] তা মাল পাঠিয়ে তবে তো কমিশন চাইবেন? না

আদমি।। [রাসভকে] কী হল? উনি চটে গেলেন কেন বলুন তো?

রাসভ।। [আদমীকে] আপনি বাঙলায় বলুন। সাদা বাঙলায়। বুঝছেন না? উনি ইঞ্জিরি জানেন না।

আদমী।। So it seems!

[কুমার রাসভের দিকে কান বাড়িয়ে দেন]

রাসভ।। Sow মানে বপন করা।

কুমার।। কী বপন করা?

রাসভ।। আজ্ঞে ইটে সীমস্! মানে, 'ইটের পাঁজায় সীমের বিচি বপন করা।'

কুমার।। [চটে উঠে] তার মানে কী দাঁড়ালো?

রাসভ।। ঐ ইঁটের পাঁজায় কি সীম গাছ হয়? অর্থাৎ বেনাবনে মুক্তো ছড়ানো আর কি! ঐ throwing pearls before your Excellency the swine!

কুমার।। তার বাঙলা কী?

রাসভ।। ওর আর বাঙলা হয় না হুজুর।

কুমার।। তুমি একটা গর্দভ!

রাসভ।। আজ্ঞে, সে তো বটেই!

কুমার।। [সভাকে সম্বোধন করে] আমাদের সভার এখানেই শেষ। এবার আমাদের জাতীয় সঙ্গীতটা ওঁকে শুনিয়ে দাও। [আদমীকে]

আদমী।। আমার একটি বন্ধুও এসেছেন। Your Excellency যদি অনুমতি করেন—

কুমার।। বিলক্ষণ! তাঁকে আসতে বলুন! এতক্ষণ বলতে হয়!

[আদমী উইংসের দিকে তাকিয়ে হাতছানি দেয়। দালালেশ্বরের প্রবেশ। সেও জান্তব পোষাক পরেছে—অর্থাৎ জাঙিয়া পরা]

আদমী।। পরিচয় করিয়ে দিই।

দালালেশ্বর।। তুমি কী গ? আমাকে এরা সব্বাই চেনে! কী বলেন স্যার? চে-চেনেন না?

আদমী।। [জনান্তিকে] স্যার নয়! Your Excellency!,

কুমার।। হ্যাঁ, উনি আমাদের অপরিচিতি নন। এবার গান হোক।

[রমেষের দ্রুত প্রবেশ। সে অনেকের কানে কানে কী যেন বলে বেড়ায়। সভায় মৃদু গুঞ্জন]

রমেষ।। মালিক [সেলাম করে] বড় দুঃসংবাদ আছে একটা!

[কুমার চাবুক আস্ফালন করে। সবাই শান্ত হয়ে যায়। কুমার দ্বিতীয়বার চাবুক আস্ফালন করে। ওরা সার দিয়ে দাঁড়ায়। তৃতীয়বার চাবুকের শব্দ শোনার সঙ্গে সঙ্গে ওরা তালে তালে দুলতে

থাকে। ব্যান্ড-মাস্টারের মত চাবুকটাকে দুহাতে ধরে তাল দিতে দিতে কুমার বলে :]

কুমার।। এক - দুই - তিন - Start!

সমবেত সঙ্গীত

সকলে।। ফসল বাড়াও, ফসল বাড়াও, ফসল বাড়াও ভাই।
খাদ্য না হলে এই দুনিয়ায় কারও নিস্তার নাই।

অবতার।। Grow more food!
Grow more food!!
Grow more more—

সকলে।। — খাবার!
খাবার না হলে তোমরা-আমরা সবাই তো হব সাবাড়।।

অনড়ান।। আমরা জোগাবো milk.
তোমরা তা দিয়ে কিন্‌বে সাটিন-সিল্ক

হাঁস ও মুরগী।। তা-দিয়ে ফোটাব egg!
Export হবে ফরেন-বাজারে Leghorn-এর লেগ্‌!!

অবতার।। Grow more food!
Grow more food!!
Grow more more—

সকলে।। — খাবার!
তোমাদের পেট ভরুক, আমরা ক্রমেই হই না সাবাড়।।

কুমার।। আমি তো রেখেছি দেশকে স্বাধীন, Law-order দেশব্যাপী।

সকলে।। কুমারের জয়, কুমারের জয়, আমরা তাতেই happy!

কুমার।। [অবতারকে] তোমাকে দিয়েছি মস্ত চাকরি,
আর [অনড়ানকে] তোমাকে দিয়েছি ঘণ্টা।

অবতার ও অনড়ান।। } আমাদের তাতে ভরপুর দিল্‌, খুসি হয়ে আছে মন্‌টা।।

কুমার।। আর [আদমীকে] তোমাকে দিয়েচি এ্যাম্‌বাসাডারি [আদমী বাও করে]
[রাসভকে] তোমার জন্য ডিগ্রি!

রাসভ।। রাসভ তাই তো পি. এইচ্‌. ডি. আজ, পি. আর. এস. হব শিগ্রি!

সকলে।। ফসল বাড়াও, ফসল বাড়াও, না হলে উপোস যাই।
সবার উপরে প্রভুই সত্য, তাহার উপরে নাই।।

[সকলে আনত হয়, কুমার দু-হাত তুলে আশীর্বাদ করে]

দালাল।। বাঃ বাঃ! Grand! [সিগ্রেট ধরায়, কুমারকে অফার করে]

কুমার।। ধন্যবাদ। আমি পাইপ খাই। [পাইপ ধরায়]

রমেষ।। হুজুর!

কুমার।। হ্যাঁ, দিচ্ছে দিচ্ছে। মানবী,—মানবী কোথায় গেল? [মানবীর প্রবেশ] এদের খাবার দাও এবার।

রমেষ।। না হুজুর, আমরা খাবারের কথা বলছি না। বলছি : বড়দা, মানে বলি-বড়দা—

কুমার।। তাই তো! বুড়ো হাবড়াটাকে তো দেখছি না!

রমেষ।। সেই কথাটাই তো হুজুরকে নিবেদন করতে চাইছি তখন থেকে—

কুমার।। [চাবুক আপ্‌সিয়ে] তাই বল্ না। তখন থেকে তো শুধু ভনিতাই করছিস!

রমেষ।। বড়দা এদেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছে! চিরদিনের জন্য!

কুমার।। যাক বাঁচা গেল! এতদিনে আপদ বিদায় হল!

মানবী।। [এগিয়ে এসে রমেষকে] বুড়োদাকে বল যাবার আগে যেন আমার সঙ্গে দেখা করে,—কথা আছে।

কুমার।। [সভাকে সম্বোধন করে] এবার তোমরা সব যাও। সভা শেষ হয়ে গেছে।

[জানোয়ারেরা প্রণতি জানিয়ে একে একে বিদায় হয়]

আদমী।। আমরাও চলি, Your Excellency?

কুমার।। [ঘড়ি দেখে] অধঘণ্টা পরেই আসবেন কিন্তু। রাজকীয় ডিনারের নিমন্ত্রণ আছে, সেটা মনে রেখেছেন তো?

দালালেশ্বর।। তা কি আর ভুলি? স্মালক্ষী পু-পুলিপিঠে বানিয়েচেন বুঝি?

কুমার।। না! ভাল ফরেন লিকার আনিয়েছি!

দালাল।। [স্বগত] অ্যাঁ! বিলাইতি! যুগ যুগ জিও! যুগ যুগ জিও।।

[আদমী ও দালালেশ্বরের প্রস্থান। মানবী এসে ফার্নিচার সরায়। খিদমৎগারেরা এসে একটি টেবিল পেতে দেয়। টেবিল-ক্লথ বিছিয়ে দেয়। ফুলদানী, ফুল ও গবলেট। গ্লাসে ফুলকাটা ন্যাপকিন]

কুমার।। মানবী! হুইস্কি সোডা। [মানবী পানপাত্র ও পানীয় রেখে প্রস্থানোদ্যতা] কোথায় যাচ্ছ?

মানবী।। আর কিছু কাজ আছে?

কুমার।। কাজ! তোমার সঙ্গে আমার কি শুধু কাজেরই সম্পর্ক?

[মানবী নিরুত্তর। কুমার মদ্যপান করতে থাকে]

ও ভুলে গিয়েছিলাম, তুমি তো আমাকে শুধু ঘৃণা কর—

মানবী।। কিন্তু কেন করি, তা তুমি শুনতে চাওনি।

কুমার।। কারণটা আমি জানি। আমি লেখাপড়া শিখিনি। তোমার আদমীর মত ফরফর করে ইংরেজি বলতে পারি না—

মানবী।। না কুমার, সেজন্য নয়। একদিন তুমিই বলেছিলে—যে ভুল শূকরনাথ আর বরাহেশ্বর করেছিল তুমি ক্ষমতা পেলে সে ভুল করবে না। মনে পড়ে? সেই তুমি ক্ষমতা পেলে। পেয়ে দেশটাকে তুমি কোথায় নিয়ে চলেছ, তা বুঝতে পার না?

কুমার।। আমি?

মানবী।। নয়?

কুমার।। তোমার ভুল ধারণা, মানবী। তুমি যা চাইছ তা হবার নয়।

মানবী।। কেন হবার নয়?

কুমার।। ঘড়ির কাঁটা উল্টো দিকে ঘোরানো যায় না বলে।

মানবী।। ওসব বাজে অজুহাত। চেষ্টা করলে সব কিছুই করা যায়।

কুমার।। যায়? তুমি পার আমাকে সেই অতীত মুহূর্তে নিয়ে যেতে যখন আমি ঐখানে দাঁড়িয়ে তোমার বাবাকে হেঁকে উঠেছিলাম—খবর্দার!

মানবী।। তার মানে?

কুমার।। তা যদি পারতে তবেই তোমার স্বপ্ন আমি সার্থক করতে পারতাম। ঐখানে ইনসান চিৎ হয়ে পড়ে আছে, এখানে আদমী চাবুক হাতে দাঁড়িয়ে—সবাই ভয়ে পেছিয়ে যাচ্ছে, আর হঠাৎ কিশোর-বয়সী আমি এসে দাঁড়ালাম ঠিক ঐখানে! হেঁকে উঠলাম—খবর্দার! সেই মুহূর্তটাকে ফিরিয়ে আনতে পার?

মানবী।। ঠিক বুঝলাম না।

কুমার।। বুঝলে না? সদ্য স্বাধীন সেদিন আমাদের কী উন্মাদনা, কী উদ্দীপনা! ব্যক্তিগত স্বার্থের কথা কেউ তখন ভাবত না। বুকের রক্ত দিতে সবাই তখন ছিল প্রস্তুত। তারপর ধীরে ধীরে সব বদলে গেল। যাঁরা ক্ষমতায় এলেন তাঁরা দেশের চেয়ে ব্যক্তিগত স্বার্থই বড় করে দেখলেন! তিল তিল করে এ-রাজ্যে শনি প্রবেশ করল। এখন এর রন্ধ্রে রন্ধ্রে বিষ! লালফিতে আর অকর্মণ্যতা ; স্বজনপোষণ আর ঘুষ! কেমন করে একা হাতে এ জগদ্দল পাহাড়কে আমি সরাবো মানবী?

মানবী।। কিন্তু সরাবার কোন চেষ্টাই তো তুমি করছ না। তুমিও তো দিব্যি সেই স্রোতে গা-ভাসিয়েছ!

কুমার।। উপায় কী? স্রোতের মুখে ভেসেই তো থাকতে হবে। না ভাসলে তলিয়ে

যাব—যেমন করে একদিন তলিয়ে গেছে শূকরনাথ আর বরাহেশ্বর। বড়জোর সাঁতরে ডাঙায় উঠতে পারি। কিন্তু ঐ মহাস্থবির বলিবর্দের মতো ডাঙায় উঠে স্থাণুর মত প্রবহমান স্রোতের দিকে তাকিয়ে বসে থাকলেই কি এ রাজ্যের মঙ্গল হবে? আমি কী করতে পারতাম? আমি কী করতে পারি?

মানবী।। আমি বলে দিচ্ছি তুমি কী করতে পার। দেওয়ালের লিখনে ঐ বাড়তি কথাগুলো মুছে দাও। ঐ মদের পাত্রটা ভেঙে ফেল, খুলে ফেল ঐ বিজাতীয় পোশাক। যাদের প্রতি অন্যায় করেছ, শান্ত নতশিরে তাদের কাছে একবার ক্ষমা চেয়ে নাও। তারপরে সাচ্চা না-মানুষের মত মাথা তুলে দাঁড়াও। ডাক দাও আর পাঁচজনকে!

কুমার।। পাঁচজনের কথা থাক। তুমি সাড়া দেবে সে ডাকে?

মানবী।। নিশ্চয়ই।

[উঠে দাঁড়ায়। এক পা এগিয়ে আসে। মানবী হাসে। একটা হাত বাড়িয়ে দেয়। কুমার মাঝপথে থেমে যায়। ফিরে এসে আবার বসে। পাত্রে মদ ঢালে]

কুমার।। বড় দেরী করে কথাটা জানালে দিদিমণি। আজ আর তা সম্ভব নয়।

মানবী।। কেন? কেন সম্ভব নয়?

কুমার।। যে নাগপাশ সর্বাঙ্গে জড়িয়েছি, তা থেকে আমার নিস্তার নেই।

মানবী।। এত ভেঙে পড়ছ কেন কুমার? ভুল তুমি করেছ; কিন্তু বিবেক তো তুমি বিকিয়ে দাওনি!

কুমার।। তাই তো বলছি। বড় দেরী করে কথাটা জানালে! যেদিন তুমি বললে আমাকে শুধুই ঘৃণা কর, যেদিন মৃত্যু কামনা করলে আমার, সেদিন থেকে আমিও বেপরোয়া হয়ে পড়েছি! তারপর যে বিষ আকণ্ঠ পান করেছি তার বিষক্রিয়াকে আজ কেমন করে ঠেকাবো? বিবেকও আমার বিকিয়ে গেছে এতদিনে!

মানবী।। তার মানে আমার স্বপ্ন কোনদিনই সফল হবে না?

কুমার।। তুমি পাবে কিনা জানি না—আমার আকাশ-কুসুম আকাশেই থাকবে।

মানবী।। আমি পাব কি না জান না?

কুমার।। [চিৎকার করে ওঠে] না জানি না! সেটা নির্ভর করছে তোমার উপর। তবে এটুকু বলতে পারি—তা পেতে হলে আমার পাশে এসে দাঁড়িও না! আমার বিপক্ষে তোমাকে দাঁড়াতে হবে! আমার হাত ধরে নয়। আমাকে—

মানবী।। কুমার!

কুমার।। কে তোমার কুমার? সে তো তোমার অভিশাপ মাথায় নিয়ে মরেছে। আমি এ রাজ্যের রাজা। আমার কাছে আবার ও-সব তত্ত্বকথা কেন? ঐ ওরা এসে গেছে। খানা লাগাও মানবী। আরও হুইস্কি নিয়ে এস।

[মানবী চলে যায়। বিপরীত দিক থেকে আদমীর প্রবেশ]

আসুন, আসুন। কই আপনার বন্ধুটি কোথায়?

আদমী।। উনি dress-up করছেন। এখনই এসে পড়বেন।

কুমার।। তারপর? আমাদের দেশটা কেমন লাগছে?

আদমী।। Superb!

কুমার।। এখানেই তাহলে পাকাপাকিভাবে থেকে যাবেন তো?

আদমী।। তাই তো ভাবছি!

কুমার।। সে-ক্ষেত্রে আমার একটা প্রস্তাব আছে। আপনি ছাড়া এ-রাজ্যে আরও একজন মানুষ আছেন। তিনিও বড় একা। আমি মানবীর কথা বলছি। আপনারা দুজনে পরস্পরকে কী চোখে দেখেন তা আমার জানা আছে। এ ক্ষেত্রে একটা শুভলগ্ন দেখে—

আদমী।। [একটু থেমে] দেখুন কুমার বাহাদুর—দুদিন আগে আমাকে এ-কথা দ্বিতীয়বার বলার দরকার হত না। কিন্তু আজ আমার দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ বদলে গেছে। আপনাদের দেশে এসে আমার চোখ খুলে গেছে! কী মুক্ত আপনারা! এখানে বস্ত্র সমস্যা নেই—পিতৃত্বের দায় নেই, দাম্পত্য জীবনের কঠোরতা নেই—

কুমার।। আপনি কি বিবাহিত জীবনটাকেই আর পছন্দ করছেন না?

আদমী।। এখানে এসে যা দেখলাম, তারপর সুস্থ-মস্তিষ্কের কোন মানুষ আর কখনও বে-থা করে? বিয়ে তো একটা বন্ধনই! বি-পূর্বক-বহ ধাতু ঘঙ! সারাজীবন একটি মহিলাকে কাঁধে করে বইতে হবে! সে কথা আজ চিন্তাই করা যায় না! আপনাদের free mixing, free love. ফুলে ফুলে মধু খাওয়া—

কুমার।। বুঝলাম। তা মানবী কী বলে?

আদমী।। ও একটা queer মেয়ে! এতদিন এদেশে থেকেও ও অমানুষ হতে পারেনি। আজও একগাদা জামা-কাপড় গায়ে জড়ায়! এখনও বিয়ের স্বপ্ন দেখে!

কুমার।। আপনার প্রস্তাবটা ওকে বলেছিলেন?

আদমী।। হ্যাঁ! ও তাতে রাজি নয়! ও একটা pig-headed idiot!

কুমার।। ঐ কথাটার মানে কি বলুন তো?

আদমী।। ইয়ে ... মানে ... থাক ও কথা! ঐ যে আমার বন্ধু এসে গেছেন।

[দালালেশ্বরের প্রবেশ]

কুমার।। আসুন, আসুন। বসুন। আপনারা যে আমাদের এ দেশকে স্বীকৃতি দিয়েছেন এতে আপনাদের বুদ্ধিমত্তারই পরিচয় পাওয়া যায়।

আদমী।। আপনিও যথেষ্ট দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন। দেখুন, পারস্পরিক সাহায্যেই মানুষ আর অ-মানুষ বেঁচে থাকতে পারে। আপনাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত কাঁচা মাল হচ্ছে। অথচ finished products—

দালালেশ্বর।। [জনান্তিকে, আদমীকে] তুমি কী গ? বাংলায় বল, রাসভনাথ নেই, উনি কিছুই বুঝবেন না।

আদমী।। মানে, ইয়ে — আর কি ... দুধ থেকে কেক, পশম থেকে জামা এসব বানাতে পারছেন না। দেশরক্ষার জন্য অস্ত্রশস্ত্রও চাই। এসব আমরাই যোগান দিতে পারি।

কুমার।। বটেই তো [উইংস-এর দিকে তাকিয়ে] মানবী, আর একটু সোডা—

দালালেশ্বর।। ঐ বুড়ো বলদটাকে আপনি যেতে দিলেন কেন স্যার, মানে Your Excellency? কাজটা ঠিক হল না। আপনার বাবার সঙ্গে আমার দরদস্তুর ঠিক হয়েই ছিল।

কুমার।। জানি। আপনি সেবার পুলিপিঠের প্রেমে পড়ে ক্যাচ-কট্-কট্ হয়েছিলেন।

[মানবী সোডার বোতল রেখে চলে যায়]

দালালেশ্বর।। আপনার Excellency-র খুব মনে থাকে তো! হে-হে! তা এবার ও-বেটাকে ছে-ছেড়ে দিলেন যে বড়?

কুমার।। রাজনীতি! বুঝেছেন? বুড়োটাকে ছেড়ে না দিলে বিক্ষোভ হত।

আদমী।। তা ঠিক। ওসব ছোটখাটো ব্যাপারে উদারতা দেখানোই ভাল। One shouldn't be pennywise and pound foolish!

[কুমার বজ্রদৃষ্টিতে ওর দিকে তাকায়। দালালেশ্বর আদমীকে কুনুইয়ের একটা গোঁত্তা মারে। আদমী অপ্রস্তুত। হঠাৎ হেসে ওঠে।]

হে হে! বলছিলাম কি, আপনাদের অনেককিছু আমার খুব ভাল লাগে। বিশেষ করে এই বাধাবন্ধনহীন জীবন—নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা—ক্ষণিকবাদী প্রেম ... আর একটু দিই Your Excellency?

[কুমার সম্মতি জানায়। পাত্র আবার ভরে ওঠে]

কুমার।। কী মজা দেখুন! আমরা মানুষ হতে চাইছি, আর আপনারা অমানুষ হতে চান!

আদমী।। নদীর এপার কহে ছাড়িয়া নিঃশ্বাস, ওপারেতে সর্বসুখ আমার বিশ্বাস!

কুমার।। বাঃ-বাঃ-বাঃ। কথাটা বড় জবর বলেছেন! ...আচ্ছা আপনারা তো জানোয়ারের মত জামা-কাপড় খুলে ফেলেছেন, তাহলে আমাকে comforter জড়াতে বলছেন কেন?

আদমী।। [যথেষ্ট নেশা হয়েছে। comforter ব্যাপারটা তার মাথায় ঢোকে না] শুধু ন্যাংটো হয়েই ক্ষান্ত হইনি। এই দেখুন!

[পিছন ফেরে। দেখা যায় বেল্টের সঙ্গে একটা ছোট লেজ আঁটা আছে]

কুমার।। বাহারে বাহা! কিন্তু এতে আমাকে টেক্কা দিতে পারবেন না মশাই। আমিও কোট-প্যান্ট পরেই ক্ষান্ত হইনি! এই দেখুন!

[পিছন ফেরে। দেখা যায় তার লেজ নেই]

দালালেশ্বর।। এ কী স্মশাই! অপারেসন করে ফেলেছেন!

[নেশার ঝোঁকে 'মশাই' সম্বোধনের ত্রুটি কেউ মনে রাখে না।]

কুমার।। [জড়িয়ে জড়িয়ে] আপনারা দেখে নেবেন! এক বছরের ভিতর আমি সব শালা জানোয়ারদের ল্যাজ কেটে ফেলব। ল্যাজের গুমোরেই শালারা মরছে! ল্যাজ না কাটলে অমানুষেরা কোনদিনই আর মানুষ হবে না!

দালালেশ্বর।। [জড়িয়ে জড়িয়ে] ঠিক বলেছেন! আপনারাও এগ্যে আসুন, আমরাও এগ্যে যাই। দেখে নেবেন, আমরাও এক বছরের ভিতর সব শালা মানুষকে ন্যা-ন্যাংটো করে ছাড়ব!

কুমার।। করুন, করুন, তাই করুন! আমি সবরকমে আপনাদের সাহায্য করব।

আদমী।। Just a minute! তাই যদি করেন, তবে ঐ মেয়েটা ...ঐ যে মানবী ... ও কেন ন্যাংটো নয়?

দালালেশ্বর।। ঠি-ঠিক কথা! কেন নয়?

কুমার।। মানবী মেয়েটা ... কী বল্‌বো ... বড় একগুঁয়ে! কিছুতেই আমার কথা শোনে না। বাচ্চাবেলায় ও আমাকে মায়ের মতো ...আমি অবশ্য কোনদিন ওকে মা ডাকিনি। বরাবরই দিদিমণি ডেকেছি ...

[আদমী ও দালালেশ্বর একসঙ্গে হেসে ওঠে]

আপনারা হাসছেন যে?

দালালেশ্বর।। হে-হে, ক্কথা শোনেনা! রাজার কথা দাসী শোনে না! কী মজার কথা!

আদমী।। আপনি তাই বুঝি ওকে অত ভয় পান?

কুমার।। ভয় পাই? আমি? ওকে! কখ্যনো না!

দালালেশ্বর।। তা — তাইলে ও ছুকরি আপনার কথা শোনে না কেন? হ্যাঁ?

কুমার।। আলবৎ শুনবে! চালাকি নাকি! মানবী—এই মানবী! [কেউ সাড়া দেয় না] কোথায় গেল সবাই! মা-ন-বী!

[বলিবর্দের প্রবেশ]

বলিবর্দ।। মানবী আর আসবে না কুমার!

কুমার।। কে? ও! বুড়ো বলদ! কী বাবা? কসাইখানায় যেতে সাধ হয়েছে?

বলিবর্দ।। কুমার! ভেব না ইতিহাস তোমাতে এসেই থেমে থাকবে! তোমার পতনও আসন্ন! ঘরে ঘরে আজ বিদ্রোহের বাণী গুম্‌রে মরেছে! শুন্‌তে পাচ্চ না? শুন্‌তে পাচ্ছ না?

কুমার।। যা ব্বাবা! নেশাটাই ছুটে গেল!

[মানবীর প্রবেশ। সে বলিবর্দের কাছে এগিয়ে আসে]

মানবী।। আমাকে ডাকছিলে বুড়োদা?

বলিবর্দ।। হ্যাঁ দিদি। চল, আমাদের যাবার সময় হয়েছে।

মানবী।। কোথায় যাব আমরা?

বলিবর্দ।। তা তো ঠিক জানি না। ও, জায়গা একটা জুটে যাবেই। এখানে হেরে গেলাম—তাই বলে কি সব ফুরিয়ে গেল? আবার নতুন করে শুরু করতে হবে।

মানবী।। কিন্তু তুমি যে একেবারে বুড়ো হয়ে গেছ দাদা?

বলিবর্দ।। তাতে কী রে? তুই তো হস্‌নি!

মানবী।। তবে চল।

[আদমী ও দালালেশ্বর ইতিমধ্যে নেশার ঘোরে টেবিলে মাথা দিয়ে শুয়ে পড়েছে। কুমার উঠে আসে]

কুমার।। [মানবীকে] মানে? তুমি কোথায় যাচ্ছ?

মানবী।। ঐ তো শুনলে—জায়গা একটা জুটে যাবেই।

কুমার।। না, না, তোমার যাওয়া হবে না। কিছুতেই হবে না। আমি যেতে দেব না। [হাত ধরে]

মানবী।। তুমিই তো বলেছিলে তোমার পাশে নয়, তোমার বিরুদ্ধে আমাকে দাঁড়াতে হবে?

কুমার।। [হাতটা ছেড়ে দিয়ে] বলেছিলাম? ...ও হ্যাঁ, আচ্ছা যাও। আমি বাধা দেব না।

[মানবী প্রস্থানোদ্যতা]

একটা কথা!

মানবী।। বল?

কুমার।। যাওয়ার আগে অন্তত বলে যাও, আমাকে ক্ষমা করে গেলে কি না।

মানবী।। আমি ক্ষমা করার কে? যাদের প্রতি অন্যায় করেছ, পার তো তাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিও।

কুমার।। না! তাদের সঙ্গে আমার আলাদা বোঝাপড়া হবে। সেখানে আমি মাথা নোয়াব না।

বলিবর্দ।। স্বেচ্ছায় নোয়াবে না তা জানি! আমরা তোমাকে বাধ্য করব।

কুমার।। তুমি চুপ কর বৃদ্ধ! আমি আমার দিদিমণির সঙ্গে কথা বলছি। [মানবীকে] তুমি শুধু তোমার কথা বলে যাও! যাবার বেলায় আমাকে কি তোমার কিছুই বলার নেই?

মানবী।। [বলিবর্দকে] বুড়াদা, যাবার আগে এদের কী কিছু বলার আছে?

বলিবর্দ।। না দিদি! এদের আর কিছু বলে লাভ নেই। যে দেশে যাচ্ছি সেখানে গিয়েই বলতে হবে পুরানো সুরে সেই নতুন কথাটা।

মানবী।। পুরানো সুরে নতুন কথা? কী কথা?

বলিবর্দ।। [সুরে] সামিল হও গো দুনিয়ার যত জন্তু ও জানোয়ার হে।
রুধিবে যে পথ নির্মম হাতে বধিব যে প্রাণ তার হে।।

কুমার।। দিদিমণি! দেখ ... আমি চেষ্টা করছি, কিন্তু পারছি না! ও গান আমি আর গাইতে পারছি না। ... ও গান আমি ভুলে গেছি।

মানবী।। অত্যাচারের হবে অবসান, উদিবে নূতন সূর্য

কুমার।। চলে যাও! তোমরা চলে যাও! ও-গান আমি সহ্য করতে পারছি না!

বলিবর্দ।। "চতুষ্পদ ও পক্ষীরা মিলে বাজাও হে রণতূর্য!"

কুমার।। [বন্দুকটা তুলে নিয়ে] গান থামাও! না হলে কিন্তু গুলি চালাব আমি!

[কুমার বলিবর্দকে লক্ষ্য করে। মানবী ছুটে এসে বলিবর্দের মুখে হাত চাপা দেয়। বলিবর্দ জোর করে হাত সরিয়ে নেয়।]

মানবী।। না-না-না!

[তখনই শোনা যায় নেপথ্য এক. দুই.. তিন! এক. দুই.. তিন।]

নেপথ্য সঙ্গীত।। "লাঙ্গুল যাহার লাঙল তাহার এই কথা জেনে সার হে।
এক হও ভাই দুনিয়ার যত জন্তু ও জানোয়ার!!"

[কুমার বিহ্বল হয়ে পড়েছে। কাকে গুলি করবে বুঝে উঠতে পারছে না]

চতুর্দিক থেকেই গানের সঙ্গে ভেসে ভেসে আসছে নেপথ্য থেকে এক. দুই.. তিন...

নেপথ্য সঙ্গীত।। "কাণ্ডারী বল : দুষ্‌মন্‌ কে বা? মৃত্যু কাহার চাই?
বলিবর্দ ও মানবী।। "রুধিবে যে পথ যাত্রাপথের কভু তার ক্ষমা নাই।"

[গান গাইতে গাইতে উভয়ের প্রস্থান]

[আদমী ও দালালেশ্বর অনেক আগেই নেশার ঘোরে লুটিয়ে পড়েছে। কুমার রাইফেলটা ফেলে দিয়ে দু-হাতে নিজের কান চাপা দেয়। নেপথ্য থেকে তখনও ভেসে আসছে গানের রেশ : "কভু তার ক্ষমা নাই"! "কভু তার ক্ষমা নাই"! ধীরে ধীরে যবনিকা নেমে আসবে। স্পটলাইট কুমারের উপর। সে মঞ্চের কেন্দ্রবিন্দুতে দু-হাতে কান ঢেকে দাঁড়িয়ে আছে।]

নেপথ্য থেকে তখনো ভেসে আসছে : এক. দুই.. তিন...

॥ তামাম ন-শুধ্‌ ॥

নারায়ণ সান্যাল
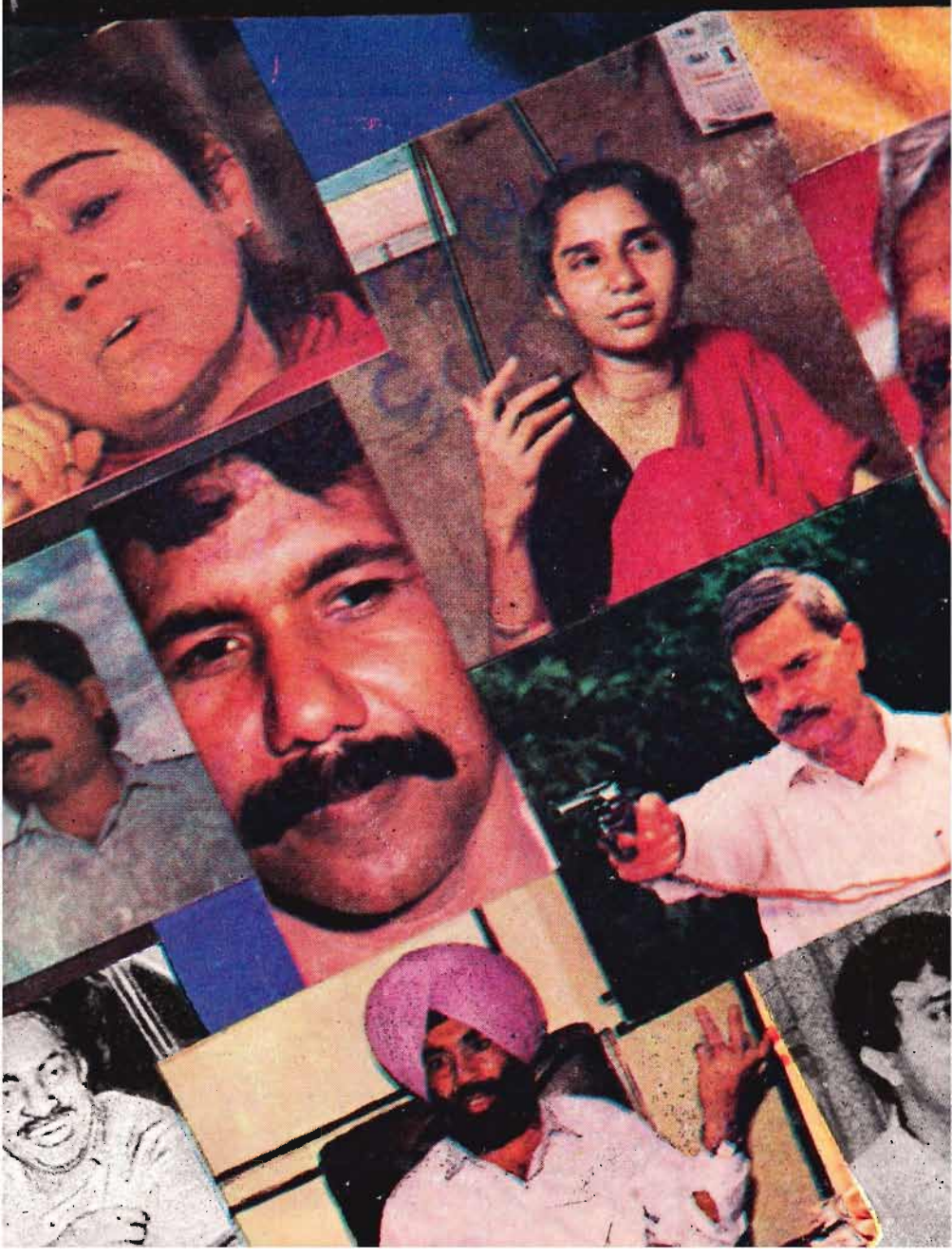
এক.. দুই.. তিন...